বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা:

সূচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যত

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান

মাতা	:	সুফিয়া ফজল (মরহুমা, ০২ জানুয়ারী ২০০৮)
পিতা	:	ফজলুর রহমান (মরহুম, ২৬ আগস্ট ২০০৩)
জন্ম	:	২৫ জানুয়ারী ১৯৭২
জন্মস্থান	:	নারায়ণপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
স্ত্রী	:	কানিজ মাহমুদা {বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়} একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত
কন্যা	:	তামান্না মাহজাবিন মৌমিতা (১৯৯৭)
		তাহিয়া মাহজাবিন (২০০৫)

রাজনীতি বিজ্ঞানের মনোযোগী গবেষক ড. তারেক ছাত্রকাল থেকেই লেখালেখিসহ নানামাত্রিক সামাজিক উদ্যোগসমূহের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮২ সাল থেকে কুমিল্লার সাপ্তাহিক আমোদ ও দৈনিক রূপসী বাংলার মাধ্যমে তার লেখালেখির যাত্রা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সরকার ও রাজনীতি বিভাগে পড়ার সময়ে তিনি ঢাকার কয়েকটি দৈনিকে সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। সাপ্তাহিক বিক্রমে তিনি সক্রিয়ভাবে সাংবাদিকতা উপভোগ করেন।

১৯৯৩-র নভেম্বরে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম ফ্ল্যাপে দেখুন

www.pathagar.com

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি এ বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক। ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে জনপ্রিয় লেখালেখির সূত্রে **তারেক ফজল** নামেই তিনি বেশী পরিচিত। রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তিনি চলমান ও সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়াদিতে পাঠককে কাঙ্খিত ধারণা সরবরাহে আগ্রহী থাকেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের মাঝে তিনিই প্রথম জনপ্রিয় নিবন্ধ ও গবেষণা প্রবন্ধের উপস্থাপক।

তার 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ৭৩: শিক্ষকদের ভাবনা' (১৯৯০) ও 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ : পরিমার্জন প্রস্তাবনা' (১৯৯৪) শীর্ষক সাক্ষাৎকারভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী দু'টি গ্রন্থ মনোযোগী শিক্ষিতজনের প্রশংসা পেয়েছে। দ্বিতীয় শিরোনামটি প্রকাশ করেছিলো একাডেমিক পাবলিশার্স। তিনি বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন।

১৯৯৮-র মার্চে শ্রীলঙ্কায় ও অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি দু'টি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সে যোগদান করেন।

বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত একটি শিক্ষা সফরের অভিজ্ঞতা যোগ করে তিনি রচনা-সম্পাদনা করেন একটি ভ্রমণ স্মারক গ্রন্থ *বাংলার রূপ* (১৯৯৮)।

লেখকের ডক্টরাল থিসিসের কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত রূপ 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ: ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)' শীর্ষক গ্রন্থটি (একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ (২০০৮) প্রত্যেকের জন্য একটি অবশ্য সংগ্রহযোগ্য প্রকাশনার স্বীকৃতি পেয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে ধারণা পাবার জন্য ড. তারেকের গ্রন্থ 'ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা' (ঢাকা: কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ২০০৮) প্রথম ও একমাত্র প্রকাশনা হিসেবে পাঠক-গবেষকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

কানিজ মাহমুদা
প্রকাশক

প্রচ্ছদ ॥ আরিফুর রহমান
www.pathagar.com

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা:
সূচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যত

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান

কেটিথ্রি পাবলিশার্স

www.pathagar.com

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: সূচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যত

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান

প্রকাশকাল : ৩০ জানুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক : কানিজ মাহমুদা, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ২১১ পূর্ব দোলাইরপাড়, ঢাকা ১২৩৬। ফোন: ০১১৯৯-৩৮০৮২২, ০১৫৫২-৩৬৩০৭২

পরিবেশক : প্রতিভা প্রকাশন
৪০৩/এ নয়াটোলা, মধুবাগ, ঢাকা ১২১৭
ফোন: ০১৯১২-৬০১৪৯৪, ০১৭১০-৩২০৮৬১

স্বত্ব © : তারেক ফজল

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান, কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা
ফোন: ০১৮১৯-১৮১৪৯২

অঙ্গসজ্জা : মো: মখলেছুর রহমান, একটিভ কম্পিউটার সেন্টার, বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী। ফোন: ০১৭১৬-৮৮৪০৫৬, ০১৫৫৬-৩০৮৫০১, ০১৯১৪-৩২৭০০৬

মুদ্রণ : চৌকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা
ফোন: ০১৯১১-৪৪১৩৫৯

মূল্য: ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

BANGLADESHE TOTYABODHAYAK SORKAR BEBOSTHA: SUCHANA, BIKASH EBONG BHOBISYAT (Caretaker Government System in Bangladesh: Initiation, Progression and Future, in *Bangla*) by Dr. Tareque Muhammad Taufiqur Rahman, Published by Kaniz Mahmuda on behalf of KT3 Publishers, Dhaka, Bangladesh in January 30, 2009, © Tareque Fazal, Price: Tk. 250, $25.

ISBN: 984 300 002409-3

www.pathagar.com

কানিজ —

আমার জীবনে তুমি সেরা ও অতুলনীয় এক নেয়ামত স্রষ্টার পক্ষ থেকে। পরিকল্পিত উদ্যোগ ছাড়া তোমাকে তিনি আমার করেছেন 'উন্মুক্ত তালিকার সম্ভাব্য অনেক বিকল্প' ছাড়িয়ে।

স্রষ্টা আমাকে জ্ঞানের—দর্শনের কিঞ্চিৎ আলো দিয়েছেন। বস্তুগত এ জীবনে সৌন্দর্যের অভাব ছিলো আর সৌন্দর্যজ্ঞানের (এস্থেটিক্স) অভাব ছিলো প্রকট। তোমার সূত্রে এ দু'টোই স্রষ্টা আমার জীবনে দিয়েছেন কানায় কানায়।

ইহজগতে সংসার নামের ধারনা বিষয়ে যে মহাকাব্য নির্মিত হয়েছে, আমার জীবনে তার অস্তিত্ব শোভিত হয়েছে তোমারই বিরল অকৃত্রিম সীমাহীন ক্লান্তিহীন শ্রম, নিষ্ঠা ও ভালোবাসায়।

জ্ঞান পিপাসা, দেশ—জাতির কল্যান ভাবনা আর আদর্শ চিন্তার ঘোরে আমার এ বস্তুগত জীবন যাপন ছিলো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শ্রীহীন, অগোছালো আর অপরিকল্পিত। তুমিই সেখানে এনেছো একটি মোটামুটি চলনসই বেশ ও শৃঙ্খলা, যতোটা আমি ধারন করতে ও খাপ খাওয়াতে পেরেছি তোমার অব্যাহত নজরদারির সূত্রে।

আমি তৃপ্ত ও আনন্দিত, কাকতালীয় হলেও, তোমার জন্মদিনে (৩০ জানুয়ারি)
এ বই নিবেদন করতে পেরে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০১)-এর প্রধান উপদেষ্টা

বিচারপতি লতিফুর রহমানের পর্যালোচনা মূল্যায়নঃ

'গ্রন্থটি রাজনীতি বিজ্ঞানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক নতুন প্রপঞ্চের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা'

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমানের লেখা 'বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: সূচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে এটি দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

বর্তমান গ্রন্থটিতে লেখক সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি মেনে বাংলাদেশী মডেলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সূচনা ও বিকাশ পর্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলাদেশে সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, এর আনুষ্ঠানিক সূচনা এবং এর বিকাশধারা এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৩টি নির্বাচন (১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮) তত্ত্বাবধান করেছে সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ১৯৯১ সালের নির্বাচনকালে দায়িত্ব পালনকারী সরকারটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি বা ঘোষণাবিহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তিনটি সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধানের অভিজ্ঞতার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আর অব্যাহত রাখতে চাইবেন কি-না সেটি কিছুটা প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষের কাছে রাজনীতিক বা জনপ্রতিনিধিদের সাময়িক অপ্রাধান্যের ('লেস সুপ্রিমেসী') বিষয়টি আপত্তিযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রাধান্যের (পলিটিক্যাল সুপ্রিমেসী) নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়।

১৯৯৪ সালের মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ঘটনাবলী ছিলো সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণার অনুপ্রেরণা। তারপর আন্দোলনের মুখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা, ৩টি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও

www.pathagar.com

বিদ্যমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু বিধানে সংস্কারের দাবির ঘটনা পরম্পরা বর্তমান গ্রন্থে নির্মোহ উপস্থাপনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো পাঠক অভিযুক্ত মাগুরা-২ উপনির্বাচন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে স্বীকৃত তথ্য-উপাত্তভিত্তিক একটি বিশ্লেষণও পাবেন এ গ্রন্থে।

বর্তমান গ্রন্থটির পূর্বে ড. তারেকের আরো ক'টি গবেষণাকর্মের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজঃ ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)' শিরোনামের গ্রন্থটি এক কথায় বিস্ময়কর চমৎকার সৃষ্টি। রাষ্ট্রীয় ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নীতিনির্ধারণে আলিমসমাজের প্রভাব বিষয়ে মুসলিম দেশসমূহের (তথা বিশ্বের) প্রেক্ষাপটে প্রথম গবেষণাকর্ম এটি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত এ গবেষণাকর্মের আরো দু'একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি পরবর্তীতে কথা বলার আশা করছি। 'ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা' শিরোনামে ড. তারেকের আরেকটি পথিকৃৎ গ্রন্থ আমাকে বিশেষভাবেই আকৃষ্ট এবং তুষ্ট করেছে। সত্যি বটে, প্রায় ৩০ বৎসর থেকে কার্যকর ইরানের নতুন ধারার এবং ব্যাপক অভিনবত্বপূর্ণ সরকার ব্যবস্থাটি বিষয়ে আমরা অন্ধকার অথবা অস্পষ্টতাতেই ছিলাম। বিশ্ববাসীকে এ বিষয়ে ধারণা দেয়ার জন্য প্রাথমিক ও প্রধান দায় ছিলো যে ইরানবাসীর, তাদেরও আগে এ বিষয়ে কলম ধরে ড. তারেক যথার্থই প্রশংসাভাজন হয়েছেন ও ব্যতিক্রমী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছাত্র জীবনে এবং শিক্ষকতার প্রথম বৎসরে ১৯৭৩ সালের স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিষয়ে প্রণীত ড. তারেকের দু'টি ভলিউম {'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩: শিক্ষকদের ভাবনা', (১৯৯০) ও 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩: পরিমার্জন প্রস্তাবনা', (১৯৯৪)} এখন পর্যন্ত অদ্বিতীয় প্রকাশনা। এভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, একমাত্র এবং অগ্রপথিক অভিধাযোগ্য গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে ড. তারেক ইতোমধ্যেই নিষ্ঠাবান পাঠক-গবেষকদের আস্থা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থটির পরিশিষ্টে দেয়া ড. তারেকের কয়েকটি জনপ্রিয় লেখা থেকে সমকালীন দ্বন্দ্ব, জটিল ও জ্বলন্ত রাজনৈতিক বিষয়াদিতে তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ ও নির্দেশনার প্রমাণ পাওয়া যাবে। চলমান ও বিতর্কিত রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারণী বিষয়াদিতে ড. তারেক বিভিন্ন সময়ে সম্ভাব্য সেরা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যা বাংলাদেশী জাতিকে সমূহ ক্ষতি ও হয়রানি থেকে রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু বাংলাদেশী রাজনীতির একগুঁয়ে পক্ষসমূহ সে সব বিষয়ে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. তারেকের দু'টি নিবন্ধকে

www.pathagar.com

{দৈনিক ইত্তেফাক, 'কালো মেঘে ঢাকা বাংলাদেশের দায়িত্বহীন রাজনীতি' (০৯.০১.২০০৭) ও 'একগুঁয়ে রাজনীতির সংকট' (০৩.০২.২০০৭)} আমি তার রাজনীতি বিজ্ঞানীসুলভ পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির পরিচায়ক হিসেবে বিবেচনা করি।

বাংলাদেশী মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাটি যে খাঁটি অর্থে মার্কিন 'রাষ্ট্রপতিক মডেলের' বিপরীতে 'প্রধানমন্ত্রিক' (প্রাইম মিনিস্টারিয়াল ফর্ম অব গভর্নমেন্ট) ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, এ কথা, দাবি অনুযায়ী, ড. তারেকই প্রথম অনুধাবন করেছেন এবং দৈনিকের পাতায় প্রকাশ করেছেন। আর রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যে 'কেউ' এবং কোনো 'দায়িত্বপালন' (পারফর্মেন্স) নিরপেক্ষ হতে বা থাকতে পারে না, ড. তারেকই তা সবার আগে নির্দিষ্ট উচ্চারণে নাগরিক সমাজকে জানিয়েছেন। তার নির্মোহ, কিন্তু সাহসী, এ সব বিশ্লেষণ পাঠকদের অনুধাবন শক্তিকে নিশ্চিতভাবে শাণিত করেছে। এটুকু বয়সে ড. তারেকের এ সার্বিক অর্জনে বৃহত্তর রাজনীতি বিজ্ঞান পরিবার অহংকার বোধ করতে পারে। আমি তার কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করি।

আমার বিশ্বাস, বর্তমান গ্রন্থটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের রাজনীতি বিজ্ঞানের নতুন প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

বিচারপতি লতিফুর রহমান

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর

ড. এম আতাউর রহমানের পর্যালোচনা মূল্যায়নঃ

'গ্রন্থটি রাজনীতি বিজ্ঞানের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন'

স্নেহভাজন ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান রচিত 'বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: সূচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা এবং সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে এ গ্রন্থে এ সরকার ব্যবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ের মধ্যে দু'টি এর আগে প্রবন্ধ আকারে একাধিক সেমিনারে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। আমি স্মরণ করতে পারছি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সাথে যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে ১৯৯৪ সালের জুন মাসে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। ঐ সেমিনারের প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কেবল এ গ্রন্থের লেখকের প্রবন্ধটিই ('বাংলাদেশে সংসদীয় আচরণ: তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ') সে সময়ের সুতীব্র চলমান রাজনৈতিক বিতর্কিত প্রসঙ্গ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলো। কোনো রাজনৈতিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে সবার আগে দিক নির্দেশনা উপস্থাপন রাজনীতি বিজ্ঞানীদের মেধা ও সক্ষমতার পরিচায়ক। অনেকে অনুধাবনে সক্ষম না হলেও ড. তারেক সেই ১৯৯৪ সালেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে তার সৃষ্টিশীলতা ও প্রতিশ্রুতিশীলতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক প্রচারণার ডামাডোলে সে সময় মাগুরা-২ উপনির্বাচনের যথার্থ বাস্তবতা অনেকেই অনুধাবনে সক্ষম হননি। কিন্তু ড. তারেক সেই নবীন বয়সেই দেশের সেরা রাজনীতি বিজ্ঞানীদের আসরে মাগুরা-২ উপনির্বাচন বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছিলেন: 'সুতরাং এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলার সুযোগ আছে, বিদ্যমান রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থাকে মান্য করলে এবং নিয়মতান্ত্রিকতায় আস্থা থাকলে মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলকে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের 'প্রাথমিক বিন্দু' নির্ধারণ করা চলে না'।

এখন বিস্তারিত ও স্বীকৃত তথ্য-উপাত্তের ও সেগুলোর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ড. তারেক তার ১৯৯৪ সালের পর্যবেক্ষণকে যথার্থ হিসেবে উপস্থাপন করছেন। এটি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকলো। এর সঙ্গে যুক্ত হলো তৎকালীন সিইসি বিচারপতি রউফের বক্তব্য। ভবিষ্যতে এ থেকে নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' সাংবিধানিক বিধানাবলী সবার আগে বিশ্লেষণ ও একাধিক সেমিনারে সেরা বিশেষজ্ঞদের সামনে উপস্থাপন করে এবং ত্রয়োদশ সংশোধনীর গঠনশৈলীতে বিভিন্ন অসঙ্গতি ও ত্রুটি চিহ্নিত করে ড. তারেক তার পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ইতোমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার বিষয়ে রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে দাবি এসেছে। সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের নিয়োগের কথা এসেছে। সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি সব সময়ই বিরল ঘটনা। তাই প্রস্তাবিত এ বিধানও নতুন জটিলতাই সৃষ্টি করতে পারে। এমনি বাস্তবতায় ড. তারেক বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তির কথাই হয়তো কল্পনা করছেন এবং এ বইটির শেষ অধ্যায়ে এমন কল্পনার অস্তিত্ব দেখা যায়। নবম জাতীয় সংসদ এবং এ মেয়াদের শাসকদের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অস্তিত্ব। একটি ন্যায্য, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য প্রসঙ্গগুলোর একটি তালিকা দিয়েছেন এ লেখক। এর ভিত্তিতে আইনগত ও প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে হয়তো নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটি অরাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ফুরাবে।

ড. তারেকের জনপ্রিয় লেখালেখির সাথে আমি পরিচিত। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক নিয়ে তার কয়েকটি নিবন্ধ এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে। এ লেখাগুলো ভবিষ্যতের পাঠকদের জানান দেবে, ড. তারেক সমকালীন ও জ্বলন্ত রাজনৈতিক বিষয়াদিতে কতো সাহস ও প্রজ্ঞার সাথে তার বক্তব্য ও নির্দেশনা উপস্থাপনে সক্ষম ছিলেন। সব মিলিয়ে বর্তমান গ্রন্থটি রাজনীতি বিজ্ঞানের সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে আমি মনে করি। নবীন রাজনীতি বিজ্ঞানী ড. তারেককে এ সুবাদে অনেক শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানাই।

ড. এম আতাউর রহমান

www.pathagar.com

লেখকের কথা

রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সঙ্গতকারণেই সমাজ-রাজনীতির জটিল বিষয়াদি আমি বোঝার চেষ্টা করি এবং সে সব জটিলতা ও বিতর্কের সম্ভাব্য কাঙ্ক্ষিত সমাধান খুঁজে থাকি। সমাধান খুঁজে পেলে নাগরিক সমাজকে জানিয়ে রাখার একটি চেষ্টা থাকে আমার। এ পর্যায়ে দৈনিকসমূহ আমার প্রাথমিক মাধ্যম। বিভিন্ন দৈনিকের পাতায় আমি চলমান ও কথিত জ্বলন্ত রাজনৈতিক সমস্যা ও জটিলতার সম্ভাব্য সমাধান ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। রাজনীতি অনুধাবনের অংশ হিসেবে আমি বলেছি বাংলাদেশী মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাটির খাঁটি নাম হওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা (প্রাইম মিনিস্টারিয়াল ফর্ম অব গভর্নমেন্ট)। এটি মার্কিন রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা-কর্তৃত্বের সাথে তুলনীয়। বরং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থার বিবেচনায় বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রির ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাইতেও বেশী এবং বল্গাহীন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রির বিপুল ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দেখে পরবর্তীতে অনেকেই আমার উপস্থাপিত ধারণার সাথে যোগ দিয়েছেন।

রাজনীতিতে 'নিরপেক্ষতা' প্রপঞ্চের বহুল এবং অর্থহীন ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাদেশে এ নিরপেক্ষতার ধারণাটি সঙ্কট সৃষ্টির মতো পর্যায়ে বিদ্যমান। আমি নির্দিষ্টভাবে, সবার আগে, জানাবার চেষ্টা করেছি, রাজনীতিতে তথা রাজনৈতিক বিষয়াদিতে নিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই, অর্থ নেই এবং সুযোগও নেই। রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা একটি বাজে কথা (নন্‌সেন্স টক্)। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে 'নিরপেক্ষ' শব্দটি বিদ্যমান। এ শব্দটি সংবিধান থেকে বাদ দেয়া অনিবার্য কর্তব্য। এ নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে আমি লিখেছি এবং বলেছি, রাজনৈতিক বিষয়াদিতে নিরপেক্ষতা অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কিন্তু কাঙ্ক্ষিত হলো ন্যায্যতা। এ ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায় বিদ্যমান ও ঘোষিত নীতিমালা-বিধানাবলীর যথার্থ চর্চা ও প্রয়োগের মাধ্যমে।

ইংরেজী সিভিল সোসাইটি শব্দগুচ্ছের বাংলা 'সুশীল সমাজ' শিক্ষিত ও সচেতন মানুষদের মাঝে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছে। মূল ইংরেজী শব্দগুচ্ছটি প্রকৃতপক্ষে একটি 'অসামরিক সমাজের' দিকে ইঙ্গিত করতে চায়। আমি এ শব্দগুচ্ছের বাংলা রূপ হিসেবে, সম্ভবত সবার আগে, 'নাগরিক সমাজ' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেছি জনপ্রিয় বিভিন্ন লেখায়।

২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারী তারিখে তৎকালীন মহাজোটের সব প্রার্থী তাদের জমাদানকৃত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক গুরুতর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। এমনি এক অনিশ্চিত, অস্থির ও বিভ্রান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সঙ্কটের একটি সাংবিধানিক সমাধানের পন্থা আমি উপস্থাপন করেছিলাম আমার একটি জনপ্রিয় নিবন্ধে (*কালো মেঘে ঢাকা বাংলাদেশের দায়িত্বহীন রাজনীতি*, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ০৯ জানুয়ারী ২০০৭)। দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ঢাকা থেকে ফোনে আমার সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক সমাধান

www.pathagar.com

বিষয়ে কথা বলেছিলেন এবং বাহ্যত তুষ্ট হয়ে নিবন্ধটি প্রকাশের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সমাধান বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি বাংলাদেশী রাজনীতির তৎকালীন সিদ্ধান্তকারী পক্ষগুলোর ছিলো না। এবং দু'দিনের ব্যবধানে ১১ জানুয়ারী রাতে বাংলাদেশ দীর্ঘ দু'বছরের জন্য অসাংবিধানিক ব্যবস্থার আওতায় চলে যায়, যা এ দেশের বহুমাত্রিক ক্ষতি সাধন করে।

রাজনীতি বিষয়ে লেখালেখির দায়ে সক্রিয় সব রাজনৈতিক পক্ষেরই অপ্রীতিভাজন হতে হয়। ন্যায্য ও নির্মোহ বিশ্লেষণ প্রায়শই ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রার্থী পক্ষগুলোর জন্য সুখকর হয় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তেমন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে গ্রাহ্য না করেই কলম ধরেছি এবং কম-বেশী অব্যাহত রেখেছি।

সদ্য বিগত জরুরী অবস্থার (জানুয়ারী ১১, ২০০৭ - ডিসেম্বর ১৭, ২০০৮) শুরুর দিকটায় ন্যায্য ও জরুরী বিষয়াদিতে কথা বলা ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল বিবেচিত হয়েছিলো। দুই শীর্ষ নেত্রীর নির্বাসনের বিরোধিতায় আমি সে সময় কঠোর ভাষায় লিখেছি। কাকতালীয়ভাবে তা সফল হয়েছে (*হাসিনা-খালেদার নির্বাসন কাঙ্ক্ষিত নয়*, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০০৭), এদিনই সরকার দু'নেত্রীর নির্বাসন পরিকল্পনা থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়। এমন আরো কিছু লেখা বিভিন্ন দৈনিকের সম্পাদকীয় বিভাগের শুভার্থী ব্যক্তিবর্গ ছাপেননি। বলেছেন, ক্ষমতাবানদের অনিবার্য জিঘাংসা সইবার মতো বস্তুগত সামর্থ/যোগ্যতা আমার হয়নি।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও এর সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ক বিতর্ক চলাকালে গবেষণামনস্ক সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান 'সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক (ঢাকা: সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫) শিরোনামে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেটি সঙ্গতকারণেই সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতির আলোকে প্রস্তুত না হলেও প্রচুর তথ্য-উপাত্তে সমৃদ্ধ ছিলো এবং সে প্রকাশনাটি আমাকে এ বিষয়ে মনোযোগী হতে যথেষ্ট সাহায্য ও উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে দেশে-বিদেশে বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি এ বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ও পণ্ডিত গবেষক ড. নিজাম আহমেদ NON-PARTY CARETAKER GOVERNMENT IN BANGLADESH: EXPERIENCE AND PROSPECT (Dhaka: The University Press Limited, 2004) শিরোনামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সেটি সম্ভবত এ বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

১৯৯০ সাল থেকে ২০০৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্তকার সময়কালকে আমি এ গ্রন্থে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। এ বইটি রাজনীতির মনোযোগী পাঠক ও গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দু'টি প্রবন্ধ আকারে পৃথক সেমিনারে আইনশাস্ত্র ও রাজনীতি বিজ্ঞানের পণ্ডিতদের দ্বারা আলোচিত হয়েছে এবং অন্য সবার আগে লেখার স্বীকৃতি পেয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়ে পাঠক প্রথমবারের মতো আলোচিত ও অভিযুক্ত মাগুরা-২ উপনির্বাচন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত পাবেন এবং এর ভিত্তিতে সে নির্বাচন বিষয়ে স্বাধীনভাবে অভিমত গঠনের সুযোগ পাবেন। বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিকাশ প্রক্রিয়া বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। এ ব্যবস্থাটির পরবর্তী অগ্রগতি/পরিণতি বিষয়ে এ পর্যায়ে একটি অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটির পরিশিষ্টে সংযুক্ত আমার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জনপ্রিয় নিবন্ধ (চারটি অপ্রকাশিত লেখাসহ) আলোচ্য সময়কালকে ও এ বিষয়ে আমার চিন্তা ও বক্তব্য অনুধাবনে সাহায্য করবে আশা করি।

সাংবিধানিক দ্বিতীয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (২০০১) প্রধান (প্রধান উপদেষ্টা) ও সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান রাজনীতি বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এম আতাউর রহমান আমার এ কাজটির পর্যালোচনা মূল্যায়ন লিখে আমাকে গভীরভাবে ঋণী করেছেন এবং সীমাহীন অনুপ্রাণিত করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগীয় প্রধান (প্রধান বিচারপতি) ও নির্বাহী বিভাগীয় প্রধানের (প্রধান উপদেষ্টা) পদ অলঙ্কৃত করে বিচারপতি লতিফ সাফল্য ও কৃতিত্বের শিখর স্পর্শ করেছেন। আর প্রফেসর আতাউর রহমান মেধা ও পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের অনেক বয়সী শিক্ষকের আগে প্রফেসর হয়েছেন এবং প্রফেশনাল সিনিয়রিটির যোগ্যতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনীতি বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পণ্ডিত ও প্রফেসর আতাউর রহমানের শিক্ষক প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ আমাকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে ('বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩: শিক্ষকদের ভাবনা, ঢাকা: ১৯৯০, পৃ. ৬০) এটিকেই 'মেধার আভিজাত্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ড. আতাউর রহমান অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেও একাডেমিক লীডারশিপের ক্ষেত্রে এ মেধার আভিজাত্যের প্রমাণ রেখেছেন। আমি তাঁদের শান্তিময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ আলোচিত মাগুরা-২ উপনির্বাচন বিষয়ে তাঁর প্রায় দেড় দশকের নীরবতা ভেঙ্গে আমার অনুরোধে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এটি পরবর্তী গবেষকদের বিশ্লেষণকে বাস্তব উপযোগী করতে সাহায্য করবে। বিচারপতি আব্দুর রউফকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির তথ্য-উপাত্ত-বিশ্লেষণে ত্রুটি-বিভ্রান্তি পেলে আমাকে জানাবার জন্য সদয় পাঠককে অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তেমন শুদ্ধির প্রসঙ্গটি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হবে।

তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ জানুয়ারী ২০০৯

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়:	মাগুরা-২ উপনির্বাচন জটিলতায় সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সূচনা: একটি পর্যালোচনা	১-২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়:	বাংলাদেশে সংসদীয় আচরণ: তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ	২৮-৪৫
তৃতীয় অধ্যায়:	সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ	৪৬-৬৮
চতুর্থ অধ্যায়:	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিকাশ এবং অতঃপর বিলুপ্তি?	৬৯-৮৪
	গ্রন্থপঞ্জি	৮৫
	পরিশিষ্টসমূহ	৮৬-১৫৪

পরিশিষ্ট তালিকা

পরিশিষ্ট-১:	*সিএসি বার্তা* নামের একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এর সাক্ষাৎকার	৮৬
পরিশিষ্ট-২:	জাতীয় সংসদের ৯২ মাগুরা- ২ নির্বাচনী এলাকার শুন্য আসনের ফলাফল বিষয়ে আওয়ামী লীগের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে ২৭ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে প্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের আদেশ	৯০
	পরিশিষ্ট-২ক: মাগুরা-২ উপনির্বাচনের বৈধতা বিষয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পত্রের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের বিবরণী	৯২
পরিশিষ্ট-৩:	ভোটকেন্দ্র পর্যায়ের প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক পেশকৃত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলাফলের একত্রিভূত বিবরণী	৯৪
পরিশিষ্ট-৪:	তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের কয়েকটি জনপ্রিয় নিবন্ধ	৯৮
পরিশিষ্ট-৫:	লেখকের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক সেমিনারের মিডিয়া রিপোর্ট	১৫১

www.pathagar.com

সারণি তালিকা

সারণি-১: ভোটকেন্দ্র পর্যায়ের প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক পেশকৃত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলাফলের একত্রিভূত বিবরণী ৯৪

সারণি-২: ২১ মার্চ ১৯৯৪ তারিখের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত মাগুরা-২ আসন নির্বাচনে অভিযুক্ত ভোটকেন্দ্রের বিবরণী ৯

সারণি-৩: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ভোটকেন্দ্রের বিবরণী ১০

সারণি-৪: আওয়ামী লীগ কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ১২টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী ১০

সারণি-৫: বিএনপি কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ৩টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী ১১

সারণি-৬: জামায়াত কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ৫টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী ১১

সারণি-৭: সারণি- ৭ক: আওয়ামী লীগ কর্তৃক অভিযুক্ত ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩টি ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন জেলা নির্বাচন অফিসার রিপোর্ট দেন। অবশিষ্ট ৯টি ভোটকেন্দ্র ও ভোটের বিবরণী ১১

সারণি-৭খ: উপরোক্ত ৯টি ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর/ প্রতীকের প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী ১২

সারণি-৮: দৃশ্যত অস্বাভাবিক ভোটহারের ৭টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী ১২

সারণি-৯: আওয়ামী লীগের অভিযোগ না করা ও ইসির বিবেচনায় অস্বাভাবিক ভোটহারের ৪টি কেন্দ্রের বিবরণী ১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মাগুরা-২ উপনির্বাচন জটিলতায় সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সূচনা: একটি পর্যালোচনা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনী এলাকা ৯২ মাগুরা-২ (মাগুরা জেলার তৎকালীন সদর থানার ৪টি ইউনিয়ন, শালিখা থানা ও মোহাম্মদপুর থানা এলাকা নিয়ে গঠিত) আসনটি নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট আসাদুজ্জামানের ইন্তেকালের কারণে শূন্য হয়। এ শূন্য আসনের উপনির্বাচন ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৫ জন প্রার্থী ছিলেন। এতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীর মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নির্বাচন কমিশন এ আসনের ফলাফল ঘোষণা করলেও আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত) নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে সে ফল প্রত্যাখ্যান করে এবং এ তিনটি দল যৌথভাবে সাধারণ নির্বাচনকালে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক আয়োজনের দাবি করে। এ দাবি আদায়ের জন্য পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় আসনে থাকা এ তিনটি দলের সংসদ সদস্যগণ সংসদের অধিবেশন বর্জন শুরু করেন। ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ও এর সরকার দাবিকৃত 'সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা' অব্যাহতভাবে অস্বীকার করার প্রেক্ষাপটে আরেকটি রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। সংসদের অধিবেশনে ৯০ কর্মদিবস স্পীকারের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকার দায়ে অধিকাংশ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয়। এরপর ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে বিরোধী দলীয় সব সদস্য এক সাথে পদত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের পক্ষে সংসদের বিপুল সংখ্যক শূন্য আসনে উপনির্বাচন করা যেমন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি সম্মিলিত বিরোধী দলের দাবির অনুকূলে 'সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হয়ে যায়। কারণ সংবিধান সংশোধন করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মোট সদস্যের দু'-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য ক্ষমতাসীন দলের ছিলো না এবং এ সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের পক্ষে সংবিধান সংশোধন করে বিরোধী দলের দাবি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। এমনি বাস্তবতায় মেয়াদের শেষ পর্যায়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট অনুরোধ জানান। বেগম খালেদা জিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দল অংশ নিতে প্রস্তুত ছিলো না। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ তিন প্রধান

www.pathagar.com

বিরোধী দল অংশ নেয়নি এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারিকে 'গণকার্ফিউ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এ দিন ভোটকেন্দ্রে যেতে ভোটারদের নিষেধ করেন এবং জানিয়ে দেন, ভোট দিতে গিয়ে কেউ সদস্যায় পড়লে আওয়ামী লীগ দায়ী থাকবে না। শেখ হাসিনার এহেন সুনির্দিষ্ট হুমকির মুখে অল্প সংখ্যক, শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ, ভোটারই কেবল ভোট দিতে গিয়েছিলেন। প্রধান তিন বিরোধী দল নির্বাচন বয়কট করায় সঙ্গতকারণেই বিএনপি ষষ্ঠ সংসদে দু'-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই (২১ মার্চে শুরু) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা বা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কয়েকদিনের আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৯৯৬ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত শেষ রাতে (ভোর ৬টা, ২৬ মার্চ) 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিল পাশ হয়। ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট এ বিলে স্বাক্ষর দেন এবং ৩০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগের প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এভাবেই বাংলাদেশে সাংবিধানিক আয়োজনের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশে সাংবিধানিক আয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঘটনাটি বাহ্যত দায়ী, সেই মাগুরা-২ উপনির্বাচন বিষয়ে খাঁটি অর্থে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তসহ কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়নি। এ অধ্যায়ে মাগুরা-২ উপনির্বাচন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্ভব সব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হবে এবং এ নির্বাচন নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বাস্তবতা যাচাই করা হবে। বর্তমান গ্রন্থের অন্য দু'টি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহের (তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, সংসদীয় সরকার প্রভৃতি) তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করায় পুনরুক্তির বিবেচনায় এখানে তা থেকে বিরত থাকা হলো।

মাগুরা-২ উপনির্বাচন: প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত

মাগুরা-২ নির্বাচনী এলাকার ধারণা আগেই দেয়া হয়েছে। এ নির্বাচনী এলাকায় মোট ১০২টি ভোটকেন্দ্র ছিলো। এর মধ্যে মোহাম্মদপুর (স্থানীয় উচ্চারণে 'মহম্মদপুর' বলা ও লেখা হয়) থানায় ৪৪টি কেন্দ্র, শালিখা থানায় ৩৯টি কেন্দ্র ও মাগুরা সদর থানায় ৪টি ইউনিয়নে ১৯টি ভোটকেন্দ্র ছিলো। ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চের এ নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে পাঁচ জন প্রার্থী ছিলেন। আওয়ামী লীগের পক্ষে শফিকুজ্জামান (বাচ্চু নামে অধিক পরিচিত), জাতীয় পার্টির পক্ষে এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, জামায়াতের পক্ষে অধ্যাপক গোলাম আকবর হোসেন, ইসলামী

www.pathagar.com

ঐক্যজোটের পক্ষে মাওলানা মাহবুবুর রহমান ও বিএনপি-র পক্ষে কাজী সলিমুল হক (কাজী কামাল নামে অধিক পরিচিত) প্রার্থী হয়েছিলেন। ১০২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৩টি কেন্দ্রের নির্বাচন সহিংসতা ও বিশৃংখলার দায়ে স্থগিত করা হয়। অবশিষ্ট ৯৯টি ভোটকেন্দ্রের মোট ভোট সংখ্যা, প্রদত্ত ভোট সংখ্যা ও সব প্রার্থীর প্রাপ্ত পৃথক ভোট সংখ্যাসহ ভোটকেন্দ্রসমূহের তালিকা একটি সারণিতে (সারণি-১) দেখানো হলো। এ ৯৯টি ভোটকেন্দ্রের মোট ভোট সংখ্যা ২০০৭৫১ এবং প্রদত্ত (কাস্ট) মোট ভোট সংখ্যা ১৪৫৪৩৯, যা মোট ভোটের প্রায় ৭২.৫%। এর মধ্যে বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমুল হক ধানের শীষ মার্কায় পান ৭৩২৪৮ ভোট এবং শফিকুজ্জামান নৌকা প্রতীকে পান ৩৯৬২৫ ভোট। এ ছাড়া লাঙ্গল প্রতীকে এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী ২০৭৯৪ ভোট, অধ্যাপক গোলাম আকবর হোসেন দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ৭৭৩২ ভোট ও মাওলানা মাহবুবুর রহমান মিনার প্রতীকে ৩১২২ ভোট পান। বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট ৯১৮টি ভোট বাতিল ঘোষিত হয়। পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে মোহাম্মদপুর থানা এলাকা থেকে প্রার্থী ছিলেন ৪জন এবং শালিখা থানা এলাকার প্রার্থী ছিলেন ১জন এবং তিনি হলেন বিএনপির প্রার্থী কাজী সলিমুল হক। এ নির্বাচনটির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের এলাকা বা থানা বিষয়ক এ তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বলে বিবেচনা করা হয়। নির্বাচন চলাকালে সহিংসতার দায়ে ৫৮১৩ ভোটের ৩টি কেন্দ্রের নির্বাচন ইসি স্থগিত করে।

এ নির্বাচনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী শফিকুজ্জামানের পক্ষে আওয়ামী লীগ ১৭ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে নির্বাচন কমিশনে ক্ষমতাসীন বিএনপির বিরুদ্ধে ৬ দফা অভিযোগ দায়ের করে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা অভিযোগের মধ্যে ছিলো স্থানীয় আনসার-ভিডিপি সদস্যদের বিএনপির পক্ষে প্রচার চালাতে ও ভোট দিতে নির্দেশ দেয়া, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থানার ওসিদের বদলি ও নতুনদের নিয়োগ দেয়া, ধানের শীষের পক্ষে কাজ না করলে ৩জন ইউপি চেয়ারম্যানকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করার হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন এবং প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রী-এমপিদের নির্বাচনী প্রচারে উন্নয়ন অঙ্গীকার প্রদান। আওয়ামী লীগ দাবি করে, ক্ষমতাসীন দলের সব নেতৃবৃন্দ ও তাদের প্রার্থী সরকারী পদ-পদবীর সুবিধা ব্যবহার করে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেছেন[১]। মাগুরা-২ উপনির্বাচন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দু'দফা (৭ ও ১৭ মার্চ) নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন এবং ১৮ মার্চের প্রচারকালে তিনি 'উন্নয়নের জন্য বিএনপি প্রার্থীকে

---

১ *The Daily Star*, ঢাকা, ১৮ মার্চ ১৯৯৪।

www.pathagar.com

ভোট প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন'[২]। প্রধানমন্ত্রির নির্বাচনী প্রচারকালে এবং পৃথকভাবে এ নির্বাচনী এলাকায় বেশ ক'জন মন্ত্রীও নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ সাংবাদিকদের এ বিষয়টি উল্লেখ করে দাবি করেন, ঢাকায় সরকারী দায়িত্ব ফেলে রেখে ও অবহেলা করে মন্ত্রিরা গত এক সপ্তাহ যাবৎ ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে সরকার দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন।[৩]

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ ১৯ মার্চ মাগুরায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রার্থীবৃন্দ, স্থানীয় কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সাথে একটি সভা করেন। এতে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ অভিযোগ করেন, মাগুরা জেলার উপকমিশনার (ডিসি) বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি প্রচারে যুক্ত রয়েছেন, জেলার পুলিশ সুপারকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর বদলি করা হয়েছে, বিএনপির সশস্ত্র মাস্তানেরা আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ধানের শীষে ভোট প্রদানের হুমকি দিচ্ছে। বিএনপির এমপি মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ক্রুদ্ধস্বরে এ অভিযোগের বিরোধিতা করেন। এক পর্যায়ে দু'জনই তাদের জামার 'হাতা গুটাতে' থাকেন। সিইসি তাদের শান্ত করেন।[৪] সিইসি অনির্ধারিতভাবে মাগুরা থেকে ১৯ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। নির্বাচন কমিশন(ইসি)-র ঘোষণায় এর আগে জানানো হয়েছিলো, ২০ মার্চ মাগুরায় অবস্থান করে সিইসি নিজে নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবেন। সিইসিকে ঢাকায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বিনয়ের সাথে অনুরোধ করেন এবং এক পর্যায়ে কিছু ব্যক্তি সিইসির গাড়ীও ঘেরাও করে রাখে। কিন্তু সিইসি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং ঢাকায় ফিরে আসেন। মাগুরা অবস্থানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে সিইসি সাংবাদিকদের বলেন, ইসির তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে যথাসময়ে তিনি সবকিছু ব্যাখ্যা করবেন। মাগুরার ডিসি নির্মল সরকার ১৯ মার্চ রাতে সাংবাদিকদের জানান, মাগুরা সার্কিট হাউজের ৬টি কক্ষের সবগুলো ইসির সচিবালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। কিন্তু ১৮ মার্চ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ১টি কক্ষ (১ নম্বর কক্ষ) দখল করে নেন। জেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *দ্য ডেইলী স্টার* প্রতিনিধিকে জানান, সার্কিট হাউজের কক্ষটি ব্যবহারের জন্য শেখ হাসিনা কারো অনুমতি নেননি। শেখ হাসিনা ১৯ মার্চ দুপুর ১টায় সার্কিট

---

২ *প্রাগুক্ত*, ১৯ মার্চ ১৯৯৪।

৩ *প্রাগুক্ত*, ১৮ মার্চ ১৯৯৪।

৪ *প্রাগুক্ত*, ২০ মার্চ ১৯৯৪।

www.pathagar.com

হাউজ ত্যাগ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ও প্রার্থীদের সাথে বৈঠককালে সিইসি ১৯টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে ১টি করে সর্বদলীয় নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ছাড়া অন্য দলগুলো এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো এবং সহযোগিতা করতে চেয়েছিলো। অতীতে এমন সর্বদলীয় নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠন করা হয়নি এবং তিন প্রধান বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত) মিলে একটি গ্যাং তৈরী করবে যাতে বিএনপি সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে - এ সব কারণে বিএনপি সিইসির সর্বদলীয় নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হয়নি বলে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া মাগুরায় সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, পূর্ব অনুমতি ছাড়া ইসি সচিবালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত মাগুরা সার্কিট হাউজের কক্ষ শেখ হাসিন দখল করায় সিইসি মাগুরা ত্যাগ করে থাকতে পারেন।[৫]

২০ মার্চ তারিখে সিইসি আগের দিন তার মাগুরা ত্যাগের পূর্বে কোনো সাংবাদিকের সাথে কথা বলার সংবাদ অস্বীকার করেন। *দ্য ডেইলী স্টার* প্রতিনিধির অনুরোধে ২০ মার্চ রাতে সিইসি বলেন, *মাগুরা উপনির্বাচনে অনিয়মের আশঙ্কা করে তার মাগুরা ত্যাগের* সংবাদটি ভিত্তিহীন। বার্তা সংস্থা ইউএনবি পরিবেশিত সংবাদটি কিছু দৈনিকে ২০ মার্চ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, সর্বদলীয় নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠনের সিইসির প্রস্তাব বিএনপি প্রত্যাখান করায় তিনি সাংবাদিক ও নেতৃবৃন্দের সামনে (সুষ্ঠু নির্বাচন বিষয়ে) সংশয় প্রকাশ করেন। সিইসি বলেন, আমি সেদিন সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু পরে পরিকল্পনাটি বাতিল করি। কেনো এ পরিকল্পনা বাতিল করেছিলেন তা জানাতে অস্বীকার করেন সিইসি এবং 'এ পর্যায়ে' মাগুরা থেকে ঢাকায় ফিরে আসার অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত বিষয়ে জানানো ঠিক হবে না দাবি করে সিইসি বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো মন্তব্য করতে পারেন না।[৬]

নির্বাচনী অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ

আলোচ্য মাগুরা-২ উপনির্বাচনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, কিছু প্রশাসনিক অনিয়ম ও ভোট কারচুপির অভিযোগ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী (বিজয়ী প্রার্থীসহ) ও দলসমূহ এবং বিভিন্ন দৈনিকের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয়। নির্বাচনের অব্যবহিত পরে অন্যতম শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শফিকুজ্জামান ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচন

---

৫ *প্রাগুক্ত*।

৬ *প্রাগুক্ত*, ২১ মার্চ ১৯৯৪।

www.pathagar.com

কমিশনে অভিযোগও দায়ের করা হয়। বিলম্বিত একটি অভিযোগ শুনানীর পূর্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশন (ইলেকশন কমিশন-ইসি) থেকে প্রত্যাহার করে। বিভিন্ন প্রার্থী, দল ও দৈনিকের সূত্রে উপস্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ বিষয়ে তৎকালীন ইসি-র পক্ষ থেকে জবাব এবং ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত হয়েছিলো। বর্তমান অধ্যায়ে ইসির সে সব ব্যাখ্যা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ-১: সিইসির মন্তব্য

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (চীফ ইলেকশন কমিশনার-সিইসি) বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফকে উদ্ধৃত করে ২০ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে ঢাকার কয়েকটি দৈনিকে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়: সিইসি বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ মাগুরা সার্কিট হাউজে বলেছেন 'Under the prevailing situation, it appears to me that a free and fare election cannot be expected. This situation seems to be unpleasant. I do not want any untoward incident to occur in my presence and I do not want to take any responsibility of it'.[৭]

আওয়ামী লীগ প্রার্থী মি. শফিকুজ্জামানের পক্ষে তার আইনজীবী ব্যারিস্টার কে এস নবী ২৭ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে ইসিকে দেয়া এক পত্রে কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত সিইসির এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে দাবি করেন, সিইসি এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেননি। ২৯ মার্চে দেয়া এক বক্তব্যে/আদেশে সিইসি দাবি করেন, মাগুরা সার্কিট হাউজে মাগুরা উপনির্বাচন বিষয়ে এমন কোনো বক্তব্য তিনি দেননি এবং মাগুরা সার্কিট হাউজে অবস্থানকালে কোনো সাংবাদিকের সাথে এমনকি কোনো কথাই বলেননি। সিইসিকে উদ্ধৃত করে বক্তব্যের বিষয়ে ২০ মার্চ তারিখে ঢাকায় কিছু সাংবাদিক দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ সে উদ্ধৃতিটির জোরালো অস্বীকার করেন, যা ২১ মার্চের দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়।[৮]

কিছু দৈনিকে সিইসিকে উদ্ধৃত করে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই সিইসি সে বক্তব্যটি 'জোরালোভাবে অস্বীকার' করেছেন বলে দাবি করেছেন এবং সে অস্বীকৃতির কথা পরদিনের দৈনিকসমূহে প্রকাশিতও হয়েছিলো। সিইসি-র নামে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি প্রচারকারী সংবাদ সংস্থাটি সিইসির-এ অস্বীকৃতিকে যেহেতু অসত্য বা ভিত্তিহীন হিসেবে কোনো প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছিলো, সেহেতু দু'টো বিষয়

---

৭ পরিশিষ্ট-২ক।

৮ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা পায়: ১. সিইসি বিচারপতি রউফ সংশ্লিষ্ট উক্তিটি করেননি এবং ২. সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থাটি মিথ্যাচার করেছিলো, যা এক ধরনের আক্রমণাত্মক তথ্য সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ মিথ্যাচার এবং তথ্য সন্ত্রাসের জন্য সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মীগণ এবং তাদের কর্তৃপক্ষ লজ্জিত হয়েছিলেন কি-না এবং পাঠক-জনতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন কি-না, জানা যায়নি। এ অসত্য ও ভিত্তিহীন সংবাদটির সূত্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধী পক্ষ সরকারের এবং ইসিসহ সিইসির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থে সংবাদটিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছে এবং এ পর্যবেক্ষণের একটি যথার্থ নমুনা হলো মাগুরা-২ উপনির্বাচনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মি. শফিকুজ্জামানের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আনুষ্ঠানিক অভিযোগটি। সংশ্লিষ্ট উক্তিটি বিষয়ে ২১ মার্চের বিভিন্ন দৈনিকে সিইসি বিচারপতি রউফের জোরালো অস্বীকৃতি প্রকাশের পরও সে অসত্য ও ভিত্তিহীন উক্তিটি ২১ মার্চের পরে সিইসির নামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর দু'টি কারণ থাকতে পারে: ১. অভিযোগকারী মি. শফিকুজ্জামান অথবা তার আইনজীবীদের (তথা শুভার্থীদের) নজরে সিইসির নামে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি এলেও সিইসির পরদিনের *অস্বীকৃতির* সংবাদটি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিলো, ও ২. সংশ্লিষ্ট অস্বীকৃতির সংবাদটি মি. শফিকুজ্জামান (এবং সংশ্লিষ্টরা) জানা সত্ত্বেও সেটিকে অবহেলা করেই সংশ্লিষ্ট পত্রটিতে সিইসির সংশ্লিষ্ট উক্তিটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছিলো। সংশ্লিষ্ট দু'টি বিকল্প অবস্থার কোনোটিই গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত নয়। প্রথম বিকল্পটি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী-অভিযোগকারীদের অমনোযোগের কথা জানায় আর দ্বিতীয় বিকল্পটি সংশ্লিষ্ট(দে)র ইচ্ছাকৃত অসততার পরিচায়ক। এ পর্যায়ে একটি পর্যবেক্ষণ এমন: সিইসির নামে অসত্য ও ভিত্তিহীন একটি বক্তব্য প্রচার মাগুরা-২ উপনির্বাচন এবং এর ফলাফলকে বিতর্কিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো, পরিণামে যা 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' আন্দোলনকে জোরদার করেছিলো।

প্রসঙ্গ-২: ভোট কারচুপি বিষয়ক পরিসংখ্যান

নির্বাচন কমিশন সূত্রে আলোচিত মাগুরা-২ উপনির্বাচনসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সুসংবদ্ধ-সুগ্রন্থিত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনটিতে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোট কারচুপি ও অনিয়ম বিষয়ে বিভিন্ন দৈনিকে দাবিকৃত সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রসমূহে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যাসহ মোট ভোট ও প্রদত্ত ভোটের উপাত্ত (সারণি-২), বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগকৃত কেন্দ্রসমূহের উপাত্ত (সারণি-৩), আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত কর্তৃক অভিযোগকৃত কেন্দ্রসমূহের পৃথক উপাত্ত (যথাক্রমে সারণি-৪, ৫ ও ৬), নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের মূল্যায়নে অভিযুক্ত কেন্দ্রসমূহের উপাত্ত (সারণি-৭ক ও ৭খ) এবং অস্বাভাবিক হারে প্রদত্ত ভোটকেন্দ্রসমূহের উপাত্ত (সারণি-৮)।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিষয়ে এখানে কয়েকটি মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে:

ক. ইসি প্রণীত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগকৃত ১৮টি ভোটকেন্দ্রের তালিকায় (সারণি-৩) বিএনপি ও জামায়াতের অভিযোগকৃত একটি কেন্দ্রের (কেন্দ্র নম্বর ২০, রাজপাট উচ্চ বিদ্যালয়) উল্লেখ (দেখুন সারণি-৪ ও ৫) নেই। এটি ইসির একটি ত্রুটি (ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত) হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীরা, যথাক্রমে, ৮১৫, ৬০৯ ও ৩০৭ ভোট পেয়েছিলেন। এ কেন্দ্র বিষয়ে জামায়াত অভিযোগ উত্থাপন করলেও কেন্দ্রটিতে দলটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (সর্বোচ্চ, ৩৬ নম্বর বনগ্রাম কেন্দ্রে, ৩৪৯ ভোট) ৩০৭ ভোট পেয়েছিলো। এ কেন্দ্রটি বিষয়ে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেনি।

খ. আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া উপস্থাপিত তালিকায় (পরিশিষ্ট-২, সংশ্লিষ্ট পত্রের বিবরণে পরিলক্ষিত) 'নওখোলা' নামের একটি অভিযুক্ত ভোটকেন্দ্রের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইসির প্রস্তুতকৃত সারণিতে 'নওখোলা' নামের কোনো কেন্দ্রের উল্লেখ (সারণি-৪) ও বিবরণ নেই। 'নওখোলা' নামের কোনো ভোটকেন্দ্রের নাম সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ১০২টি ভোটকেন্দ্রের তালিকাতেও (সারণি-১) দেখা যায়নি।

গ. আওয়ামী লীগের অভিযোগকৃত ১২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৩টি কেন্দ্রে (৬১ কৃষ্ণপুর, ৬৫ শতখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬৬ শতখালী দারুল উলুম মাদ্রাসা) সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলে ইসির বেশ ক'জন কর্মকর্তার রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯টি কেন্দ্রে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি বলে (তা যেভাবে, যে কারণে এবং যে মাত্রায়ই হোক) স্বীকার করা (সারণি-৭ক) হয়েছে। সুষ্ঠু ভোট না হওয়া ইসি স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট ৯টি ভোটকেন্দ্রের মোট ভোট ও প্রদত্ত ভোট সংখ্যা, যথাক্রমে, ২০১৭৮ ও ১৫৪২০)।

ঘ. ইসি স্বীকৃত ও আওয়ামী লীগের অভিযোগকৃত ৯টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫৮ নম্বর ভাটোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র বিষয়ে বিএনপিও অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো। এ কেন্দ্রটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রাপ্ত ভোট, যথাক্রমে, ৫৯৮ ও ৮৩৭ এবং এ কেন্দ্রের মোট ও প্রদত্ত ভোট সংখ্যা, যথাক্রমে, ২২২৯ ও ১৭৪৬।

www.pathagar.com

সারণি-২: ২১ মার্চ ১৯৯৪ তারিখের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত মাগুরা-২ আসন নির্বাচনে অভিযুক্ত ভোটকেন্দ্রের বিবরণী

	ভোটকেন্দ্রের নাম্বার ও নাম	মোট ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	আওয়ামী লীগ	বি.এন.পি
৩৯	নহাটা উচ্চ বিদ্যালয়	২,৩০৩	১,৫৬৬	৩৮৬	১,০৬৪
১৯	রাহাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৯৬৭	১,৯৯৫	৫৯৮	১,২৩৭
২০	রাজপাট উচ্চ বিদ্যালয়	২,৭০৮	১,৯০২	৮১৫	৬০৯
৪৬	ধনেশ্বরগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৮২	১,৫১২	৬২৬	৭৬৮
৪৮	থৈপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,০৭৫	১,০০০	৭৩	৯০৩
৫৫	নাঘোষা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পুরুষ)	১,৮০৬	১,৪২৩	২৩১	৯৫৭
৫৬	নাঘোষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়(মহিলা)	১,৭৬১	১,৩৫৮	১৭১	১,০২৪
৬৫	শতখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৯৬	১,২১০	২৫৮	৫৬৭
৬৬	শতখালী দারুল উলুম মদ্রাসা	১,৫১৬	৯৮০	২০১	৫০৩
৭৭	বুনাগাতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৪৭৬	২,০০৩	৪০০	১,৪৫১
৪৭	মশাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৬১৭	২,২৪৭	১৩৩	১,৯৫৬
৫৭	তালঘড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৩৯৪	১,৭৫৩	৬১১	৭৩৫
৫০	সিংড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,২১৫	২,০৪৯	১৬৭	১,৮৩৩
৫৯	আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,১৫৪	১,৫১০	৫৬৭	৮০৯
৪৯	আমিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৭৫	১,৬৫৪	৭৪	১,৫১৫
৬১	কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৪৫২	১,২০২	২৪২	৮৭১
৪১	পানিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮১২	২,৫০৯	২৮	২,৩৭৬
৪৪	মবারকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,১২৯	১,৭৫৮	২৯	১,৭৪০
৩	চুড়ারগাতি উচ্চ বিদ্যালয়	১,৫৭৮	১,৩৬৮	৫৩৬	১৪৭
৪	চুড়ারগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৪৯৬	৯৩১	৪৮২	১৩৭
৭৮	গংগারামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,৮৬১	১,৭৩৭	২৮১	১,৪১৫
৫২	ছান্দড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৫২৯	১,৯২৬	২৭২	১,৪২২
৫১	চতুরবাড়ীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫০৩	১,২০৪	১৩৯	৭৮২
৫৮	ভাটোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,২২৯	১,৭৪৬	৫৯৮	৮৩৭
৭২	হাজরাহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৫৩৪	২,২৫৯	১৯	২,১৮০
	২৫টি কেন্দ্র	৫১,৬৬৮	৪০,৫৪০	৭,৯৩৭	২৭,৮৩৮

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

ঙ. আওয়ামী লীগের অভিযোগকৃত ও ইসি স্বীকৃত ৯টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে জামায়াতের অভিযোগকৃত দু'টি কেন্দ্র রয়েছে (১৯ রাহাতপুর ও ৪১ পানিঘাটা) এবং এ দু'টি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের প্রাপ্ত ভোট, যথাক্রমে (রাহাতপুর) ৫৯৮, ১২৩৭, ৬৬ ও (পানিঘাটা) ২৮, ২৩৭৬, ২৯।

চ. ইসির বিবেচনায় মোট ৭টি কেন্দ্রে (সারণি-৮) প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা অস্বাভাবিক। এ ৭টি 'অস্বাভাবিক ভোট পড়া' কেন্দ্রের তালিকায় আওয়ামী লীগের অভিযোগকৃত ৩টি কেন্দ্র রয়েছে (কেন্দ্র নম্বর ৪১, ৪৮, ৪৯ এবং নাম পানিঘাটা, থৈপাড়া ও আমিয়ান) এবং অন্য ৪টি কেন্দ্র বিষয়ে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেনি।

www.pathagar.com

সারণি-৩: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ভোটকেন্দ্রের বিবরণী

	ভোটকেন্দ্রের নাম্বার ও নাম	মোট ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	আওয়ামী লীগ	বি.এন.পি
	১	২	৩	৪	৫
৩৯	নহাটা উচ্চ বিদ্যালয়	২,৩০৩	১,৫৬৬	৩৮৬	১,০৬৪
১৯	রাহাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৯৬৭	১,৯৯৫	৫৯৮	১,২৩৭
৪৬	ধনেশ্বরগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৮২	১,৫১২	৬২৬	৭৬৮
৪৮	খৈপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৭৫	১,০০০	৭৩	৯০৩
৬৫	শতখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৯৬	১,২১০	২৫৮	৫৬৭
৬৬	শতখালী দরুল উলুম মাদ্রাসা	১,৫১৬	৯৮০	২০১	৫০৩
৭৭	বুনাগাতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৪৭৬	২,০০৩	৪০০	১,৪৫১
৪৭	মশাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৬১৭	২,২৪৭	১৩৩	১,৯৫৬
৫৭	তালঘড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৩৯৪	১,৭৫৩	৬১১	৭৩৫
৫০	সিংড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,২১৫	২,০৪৯	১৬৭	১,৮৩৩
৪৯	আমিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৭৫	১,৬৫৪	৭৪	১,৫১৫
৬১	কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৪৫২	১,২০২	২৪২	৮৭১
৪১	পানিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮১২	২,৫০৯	২৮	২,৩৭৬
৪৪	মবারকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,১২৯	১,৭৯৮	২৯	১,৭৪০
৭৮	গংগারামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,৮৬১	১,৭৩৭	২৮১	১,৪১৫
৫২	ছান্দড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৫২৯	১,৯২৬	২৭২	১,৪২২
৫৮	ভাটোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,২২৯	১,৭৪৬	৫৯৮	৮৩৭
৭২	হাজরাহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৫৩৪	২,২৫৯	১৯	২,১৮০
	১৮টি কেন্দ্র	৩৮,৬৬২	৩১,১৪৬	৪,৯৯৬	২৩,৩৭৩

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

সারণি-৪: আওয়ামী লীগ কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ১২টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী

ভোট কেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা
৫২. ছান্দড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৫২৯	১,৯২৬
৬১. কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৪৫২	১,২০২
৫৭. তালখড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৩৯৪	১,৭৫৩
৫৮. ভাটোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,২২৯	১,৭৪৬
৪৮. খৈপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,০৭৫	১,০০০
৬৫. শতখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৯৬	১,২১০
৬৬. শতখালী দারুল উলুম মাদ্রাসা	১,৫১৬	৯৮০
৪৬. ধনেশ্বরগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৮২	১,৫১২
৫০. সিংড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,২১৫	২,০৪৯
৪৯. আমিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৭৫	১,৬৫৪
৪১. পানিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮১২	২,৫০৯
১৯. রাহাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৯৬৭	১,৯৯৫
মোট ১২টি কেন্দ্র	২৪,৭৪২	১৯,৫৩৬

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

www.pathagar.com

সারণি-৫: বিএনপি কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ৩টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী

ভোট কেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩
৭৭. বুনাগাতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৪৭৬	২,০০৩
৫৮ ভাটোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,২২৯	১,৭৪৬
২০ রাজপাট উচ্চ বিদ্যালয়	২,৭০৮	১,৯০২
মোট ৩ টি কেন্দ্র	৭,৪১৩	৫,৬৫১

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

সারণি-৬: জামায়াত কর্তৃক মাগুরা-২ আসন উপনির্বাচনে অভিযুক্ত ৫টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী

ভোট কেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩
১৯.রাহাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৯৬৭	১,৯৯৫
২০. রাজপাট উচ্চ বিদ্যালয়	২,৭০৮	১,৯০২
৪৪. মবারকপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২,১২৯	১,৭৯৮
৩৯. নহাটা উচ্চ বিদ্যালয়	২,৩০৩	১,৫৬৬
৪১. পানিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮১২	২,৫০৯
মোট ৫টি কেন্দ্র	১২,৯১৯	৯,৭৭০

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

সারণি-৭ক: আওয়ামী লীগ কর্তৃক অভিযুক্ত ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩টি ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন জেলা নির্বাচন অফিসার রিপোর্ট দেন। অবশিষ্ট ৯টি ভোটকেন্দ্র ও ভোটের বিবরণী

ভোট কেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩
১৯. রাহাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৯৬৭	১,৯৯৫
৪১. পানিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮১২	২,৫০৯
৪৬. ধনেশ্বরগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৮২	১,৫১২
৪৮. খৈপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,০৭৫	১,০০০
৪৯. আমিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৭৫	১,৬৫৪
৫০. সিংড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,২১৫	২,০৪৯
৫২. ছান্দড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৫২৯	১,৯২৬
৫৭. তালখড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৩৯৪	১,৭৫৩
৫৮ ভাটোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,২২৯	১,৭৪৬
মোট ৯টি কেন্দ্র	২০,১৭৮	১৫,৪২০

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

www.pathagar.com

সারণি-৭:খ উপরোক্ত ৯টি ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর/ প্রতীকের প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী

ভোট কেন্দ্রের নম্বর ও নাম	লাংগল	ধানের শীষ	দাঁড়িপাল্লা	মিনার	নৌকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯. রাহাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০	১,২৩৭	৬৬	০৯	৫৯৮
৪১. পানিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩	২,৩৭৬	২৯	১৪	২৮
৪৬. ধনেশ্বরগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫	৭৬৮	৪৯	১০	১৩৩
৪৮. খৈপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	০২	৯০৩	০০	০০	৭৩
৪৯. আমিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪	১,৫১৫	৩৬	০৬	৭৪
৫০. সিংড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৮	১,৮৩৩	৩৩	০৮	১৬৭
৫২. ছান্দড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৮	১,৪২২	৬০	৮৫	২৭২
৫৭. তালখড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৭৩৫	৩৬	৫৯	৬১১
৫৮ ভাটোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৮৩৭	৪৩	৫১	৫৯৮
মোট ৯টি কেন্দ্র	৭৬৩	১১,৬২৬	৩৫২	২৪২	২,৫৫৪

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

সারণি-৮: দৃশ্যত: অস্বাভাবিক ভোটেরহারের ৭টি ভোটকেন্দ্রের বিবরণী

ভোট কেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩
৪৯. আমিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৭৫	১,৬৫৪
৪১. পানিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮১২	২,৫০৯
৪৪. মবারকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,১২৯	১,৭৯৮
৭২. হাজরাহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৫৩৪	২,২৫৯
৪৮. খৈপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,০৭৫	১,০০০
৮২. বামনখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,২২৫	১,১০৯
৮৩. খাটোর রামানন্দকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,১৭৩	২,০৯৫
মোট ৭টি কেন্দ্র	১৩,৯২৩	১২,৪২৪

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

সারণি-৯: আওয়ামী লীগের অভিযোগ না করা ও ইসির বিবেচনায় অস্বাভাবিক ভোটহারের ৪টি কেন্দ্রের বিবরণী

ক্র. নং	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	নৌকা	ধানের শীষ	দাঁড়িপাল্লা
১.	৪৪ মবারকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১২৯	১৭৯৮	২৯	১৭৪০	৬
২.	৭২ হাজরাহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩৪	২২৫৯	১৯৮	২১৮০	১
৩.	৮২ বামনখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২৫	১১০৯	০	১১০৯	০
৪.	৮৩ খাটোর রামানন্দকাঠি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৭৩	২০৯৫	১	২০৮১	০
	মোট ৪টি কেন্দ্র	৮০৬১	৭২৬১	২২৮	৭১১০	৭

সূত্র: ইসির উপাত্তে গবেষকের তৈরী

সংশ্লিষ্ট ৪টি কেন্দ্রের (সারণি-৯) মোট ভোট ও প্রদত্ত ভোট সংখ্যা, যথাক্রমে ৮,০৬১ ও ৭,২৬১ এবং আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট, যথাক্রমে, ২২৮, ৭১১০ ও ৭। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ ও

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান যে, ০ এবং ১ ভোট পাবার পরও আওয়ামী লীগ ৮২ ও ৮৩ নম্বর ভোটকেন্দ্র বিষয়ে অভিযোগ তোলেনি। দলটি অন্য দু'টি কেন্দ্রে পেয়েছে, যথাক্রমে, ২৯ ও ১৯৮ ভোট।

ছ. মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলাফল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত যথাক্রমে ১২, ৩ ও ৫টি বা মোট ২০টি ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন বিষয়ে অভিযোগ করেছিলো। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ১২টি কেন্দ্রের সাথে বিএনপির ১টি (ভাটোয়াইল) ও জামায়াতের ২টি (রাহাতপুর ও পানিঘাটা) অভিযুক্ত কেন্দ্র রয়েছে। আবার জামায়াতের অভিযুক্ত ৫টি কেন্দ্রের ১টি বিষয়ে বিএনপিও অভিযোগ তুলেছে। তাতে ৩টি দলের মোট অভিযুক্ত কেন্দ্র হবার কথা ১৬টি। ইসির প্রস্তুত করা তালিকায় (সারণি-৩) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযুক্ত কেন্দ্রের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৮ এবং ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে, বিএনপি ও জামায়াতের যৌথভাবে অভিযুক্ত কেন্দ্র ২০ নম্বর রাজপাট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের উল্লেখ ইসির তালিকায় নেই। রাজপাট কেন্দ্র যোগ করলে অভিযুক্ত কেন্দ্রের সংখ্যা, ইসির হিসেব অনুযায়ী, হয় ১৯টি। কিন্তু হবার কথা ১৬টি {আওয়ামী লীগের ১২ + বিএনপির ২ (আওয়ামী লীগের সাথে ভাটোয়াইল কেন্দ্র যৌথ হওয়ায়) + জামায়াতের ২ (বিএনপির সাথে রাজপাট কেন্দ্র ও আওয়ামী লীগের সাথে রাহাতপুর ও পানিঘাটা কেন্দ্র যৌথ হওয়ায়)}। এ পর্যায়ে প্রচুর মনোযোগ দিয়ে পাওয়া গেলো, ইসির দাবিকৃত ১৮টি কেন্দ্রের (যা ১৯টি হবার কথা, রাজপাট কেন্দ্র যুক্ত হলে) মধ্যে ৪৭ নম্বর মশাখালী, ৭২ নম্বর হাজরাহাটি ও ৭৮ নম্বর গঙ্গারামপুর কেন্দ্রের নির্বাচন বিষয়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত (যথাক্রমে সারণি-৪, ৫ ও ৬ দ্র.) অভিযোগ করেনি। তাহলে এ তিনটি কেন্দ্রকে ইসি কেনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছে? একটি সম্ভাব্য জবাব হতে পারে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী জাতীয় পার্টি (লাঙ্গল) ও ইসলামী ঐক্যজোট (মিনার) প্রার্থীদের পক্ষ থেকে এ ৩টি কেন্দ্র বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকতে পারে। এ তথ্য অবশ্য ইসি জানায়নি এবং এটিকেই ঘটনা বা বাস্তবতা স্বীকার করা হলে রাজনৈতিক দলসমূহের অভিযুক্ত কেন্দ্র তালিকা প্রণয়নে ইসি ভুল করেছে বলে দাবি করা যাবে।

জ. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ (বা প্রার্থীগণ) মাগুরা-২ উপনির্বাচনে মোট ১৬টি ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম বা ভোট কারচুপি হয়েছে বলে দাবি করলেও ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে মোট ২৫টি কেন্দ্রে (সারণি-২) অনিয়ম বা ভোট কারচুপির অভিযোগ করা হয়েছিলো। এ ২৫টি কেন্দ্রের মোট ভোট, প্রদত্ত ভোট, আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোট ও বিএনপির প্রাপ্ত ভোট, যথাক্রমে, ৫১৬৬৮, ৪০৫৪০, ৭৯৩৭ ও ২৭৮৩৮।

www.pathagar.com

নির্বাচনের ফলাফল: বিভিন্ন সমীকরণ

নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী লীগের একজন পোলিং এজেন্ট আজিজ খানকে পুলিশ ধর্ষণ ও লুণ্ঠন মামলার পলাতক আসামী হিসেবে গ্রেফতার করে। আওয়ামী লীগ দাবি করে, রাজাপুর গ্রামে দুই আওয়ামী লীগ কর্মীর বাড়ি বিএনপি কর্মীরা জ্বালিয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ কর্মীরা নির্বাচনের দিন বিকেল ৪টায় 'ঢাকা রোড'-এ ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ও বেশ কিছু যানবাহন ভাংচুর করে। বিক্ষুব্ধ লোকেরা কৃষিমন্ত্রী জেনারেল অব. মজিদুল হকের গাড়িতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।

জাতীয় পার্টির প্রার্থী এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে আওয়ামী লীগ নেতা সাজেদা চৌধুরী ও তোফায়েল আহমেদকে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার মাধ্যমে সংখ্যালঘু ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য অভিযুক্ত করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা সুধাংশু শেখর হালদার *দ্য ডেইলী স্টার* প্রতিনিধিকে নির্বাচনের দিন বিকেল ৩টায় জানান, তিনি ২০টি ভোটকেন্দ্র ঘুরে সেগুলোতে সহিংসতাপূর্ণ বিশৃংখলা দেখেননি। তবে তিনি কিছু কেন্দ্রে সূক্ষ্ম কারচুপি প্রচেষ্টার সন্দেহ করেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ-এর ৫ সদস্যের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ১৩টি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে এবং বিবৃতিতে জানায়, ৯টি কেন্দ্রের ভোট পড়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেশী ছিলো, ৩টিতে গড়পরতা এবং ১টিতে মাঝারি মাত্রার ভোট পড়েছে। এ সংস্থার মতে, দায়িত্ব পালনে পুলিশ খুবই তৎপর ছিলো এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্টসমূহ যথেষ্ট সক্রিয় ছিলো।[৯]

এর আগে ১৯ মার্চ প্রকাশিত রিপোর্টে *দ্য ডেইলী স্টার* জানায়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে। সংসদের এ আসনটিতে বরাবরই আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও এ নির্বাচনে দু'টি বিষয় ফলাফলে ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারে: ১. ৫জন প্রার্থীর মধ্যে চারজনই মোহাম্মদপুর থানার অধিবাসী এবং এ আসনের অন্তর্ভুক্ত শালিখা থানা থেকে কেউ এ পদে দীর্ঘদিন নির্বাচিত হননি। এবার কেবল বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমুল হক ওরুফে শিল্পপতি কাজী কামাল শালিখা থানার অধিবাসী। শালিখা থানার ভোটারদের জন্য এটি বিশেষভাবে বিবেচ্য একটি বিষয় হতে পারে। ২. জাতীয় পার্টির প্রার্থী এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী এরশাদ শাসনামলে এ আসন থেকে ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী

The Daily Star, ঢাকা, ২১ মার্চ ১৯৯৪।

www.pathagar.com

হয়েছিলেন এবং মন্ত্রিত্বও পেয়েছিলেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ায় বরাবর আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পাওয়া হিন্দু ভোটারদের আনুকূল্য এবার দলটি পুরোপুরি না-ও পেতে পারে, যা প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপির বিজয়ে অবদান রাখতে পারে।[১০]

২০ মার্চ তারিখে নির্বাচনে ভোট প্রদান শেষ হবার অব্যবহিত পরেই বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে।

দ্য ডেইলী স্টারের ২০ মার্চ সংখ্যায় একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিলো: **হাসিনা কনফিডেন্ট অব রিটেইনিং সীট**। কিন্তু ২০ মার্চের ভোট প্রদান শেষ হবার আড়াই ঘন্টা পর সন্ধ্যা ৬.৩০টায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর শহরের বাড়ীতে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ প্রেস ব্রীফিংয়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও সহিংসতার অভিযোগে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে এবং আমরা এটি প্রত্যাখ্যান করছি। এটি এখন প্রমাণিত, এ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন হতে পারে না এবং আমরা একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন চাই। তিনি বলেন, ১৯৫৪ থেকে এ আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনী এলাকার ১৯টি ইউনিয়নের মধ্যে বিএনপি কর্মীরা ১৩টি দখল করেছে এবং নির্বাচনে কারচুপি করেছে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে মাগুরা ত্যাগ করে নীল নকশার বাস্তবায়নে বিএনপিকে সাহায্য করার জন্য সিইসিকে অভিযুক্ত করেন। তিনি ডিসি এবং এসপিকে তাদের সরকারী পদমর্যাদা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত করেন এবং বলেন, দায়িত্ব পালনে ৪৫টি মোবাইল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের কোনোটিকেই দায়িত্ব পালনের জন্য যানবাহন দেয়া হয়নি।

দ্রুততার সাথে আহুত সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা রিপোর্টারদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি। সংবাদ সংস্থা *ইউএনবি*-র সূত্রে *দ্য ডেইলী স্টার* জানায়, শেখ হাসিনা বলেন, ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী এজেন্টগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকেননি।[১১]

জাতীয় পার্টি নেতা কাজী জাফর আহমেদ ২০ মার্চ রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে মাগুরা-২ আসনে নতুন নির্বাচন দাবি করে ভোট ডাকাতির দায়ে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন এবং বলেন, ভোট ডাকাতি করে বিএনপি গণতন্ত্র হত্যা করেছে।

---

[১০] প্রাগুক্ত, ১৯ মার্চ ১৯৯৪।

[১১] প্রাগুক্ত, ২১ মার্চ ১৯৯৪।

www.pathagar.com

জামায়াত নেতৃবৃন্দ মাগুরা-২ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে পুনঃনির্বাচন দাবি করেন এবং বলেন, মাগুরা-২ উপনির্বাচনে বিএনপির ব্যাপক কারচুপি আরো একবার প্রমাণ করেছে কেয়ার টেকার সরকার ছাড়া দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না।

মাগুরা-২ উপনির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি ২৩ মার্চ দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল আহবান করে ও জামায়াতসহ সবগুলো দল সারাদেশে বিভোক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১২]

দৈনিক পত্রিকাসূত্রে প্রাপ্ত চিত্রে মাগুরা-২ উপনির্বাচনের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও এর ফলাফল বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

কৃষিমন্ত্রী জেনারেল (অব.) মজিদুল হক জানান, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ১৯ মার্চ শনিবার সন্ধ্যে ৬.৩০টা পর্যন্ত মাগুরা সার্কিট হাউজে অবস্থান করেন এবং তা আক্ষরিক অর্থেই ছিলো কক্ষ দখল। তিনি জানান, শনিবার সকাল থেকেই মাগুরা সার্কিট হাউজ ইসি সচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবার কথা থাকায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুক্রবার রাত ১০টায় সার্কিট হাউজ ত্যাগ করেন এবং অন্য মন্ত্রীরাও শুক্রবার রাত বা শনিবার ভোরে সার্কিট হাউজের কক্ষ খালি করে দেন। তিনি বলেন, শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০টা পর্যন্ত সার্কিট হাউজে আওয়ামী লীগ নেত্রীর জোরপূর্বক অবস্থানই সিইসির অসন্তোষের কারণ ছিলো, যে জন্য তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে মাগুরা ত্যাগ করেন।[১৩]

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সুধাংশু শেখর হালদার বিকেল ৩টা নাগাদ নিজে ২০টি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের কথা জানিয়ে সে সব স্থানে 'সহিংসতাপূর্ণ বিশৃংখলা' দেখেননি বলে স্বীকার করেন। তিনি অবশ্য 'প্রমাণ অযোগ্য' সূক্ষ্ম কারচুপির আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। এ আওয়ামী লীগেরই আরেক কেন্দ্রীয় নেতা, উক্ত দলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, শাহ এএমএস কিবরিয়া, নির্বাচনের দিন ভোটদান শেষ হবার ১ ঘন্টা পর, বিকেল ৫টায় ইসিতে একটি অভিযোগপত্র জমা দেন। তাতে তিনি ১২টি ভোটকেন্দ্র বিএনপি কর্তৃক দখল ও পূর্বরাতে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না হবার হুমকি প্রদানের কথা জানান এবং এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ[১৪] জানান। আর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভোটদান

---

১২ *প্রাগুক্ত*, ২০ ও ২১ মার্চ ১৯৯৪।

১৩ *প্রাগুক্ত*, ২১ মার্চ ১৯৯৪।

১৪ পরিশিষ্ট-২

www.pathagar.com

শেষ হবার আড়াই ঘন্টা পর, সন্ধ্যা ৬.৩০টায়, যখন ভোট গণনা চলছিলো, মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন, নতুন নির্বাচন দাবি করেন এবং জানান, ভোট কারচুপির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকেননি। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নেরও উত্তর দেননি।

দ্য ডেইলী স্টার নামের ইংরেজী দৈনিকটি কখনোই নির্দিষ্টভাবে আওয়ামী লীগের প্রতি বৈরী হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। এ দৈনিকটির রিপোর্টে জানানো হয়, মাগুরা-২ উপনির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে জানানো হয় ৪টি ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক গোলযোগ হয়েছে, যার ৩টিতে ভোটগ্রহণ স্থগিত করেছিলো ইসির নিয়োজিত কর্মকর্তরা। *মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ* নামের সংগঠনটি আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবেই পরিচিত। এটি ১৩টি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে জানায় ৯টি কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য বেশি ভোট পড়েছে, ৩টি কেন্দ্রে গড়পরতা এবং ১টি কেন্দ্রে মাঝারি মাত্রার ভোট পড়েছে। আর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সুধাংশু শেখর হালদার নিজে ২৩টি ভোটকেন্দ্রের যে অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন, এক কথায় সেটিকে ইতিবাচক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন আয়োজনের সত্যয়ন বলা যায়। এ বিবেচনায় মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলাফলকে সরাসরি প্রত্যাখ্যানের সুযোগ কম।

ইসির সিদ্ধান্ত (পরিশিষ্ট-২ ও ২ক) থেকে ৩টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে:

এক. আওয়ামী লীগ যে ক'টি ভোটকেন্দ্র (সারণি-৪) বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে আপত্তি জানিয়েছে, সেগুলোর সব ভোট আওয়ামী লীগ প্রার্থীর অনুকূলে প্রদান করলেও (৩৯৬২৫+১৯৫৩৬=৫৯১৬১) বিএনপি প্রার্থী অনেক ভোট বেশি পান।

দুই. বিএনপি প্রার্থীর নিজ থানা শালিখার ৩৯টি ভোটকেন্দ্রের কোনো ভোট আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীর কারো পক্ষেই যোগ করা না হলেও বিএনপি প্রার্থী অনেক বেশি ভোটে এগিয়ে থাকেন। তাই বিএনপি প্রার্থীর যথাযথই বিজয়ী হওয়া বিষয়ে সন্দেহ করার সুযোগ কম।

তিন. মাগুরা-২ উপনির্বাচনের নির্বাচন কার্যক্রম এবং এর বৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য সংবিধান স্বীকৃত যে পন্থা (অনুচ্ছেদ ১২৫খ) বিদ্যমান, আওয়ামী লীগ তা অনুসরণ করেনি। জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে অনিয়ম হলে তা যথাযথভাবে ইসিকে জানাবার বিধান রয়েছে এবং নির্বাচনের বৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলেও ইসিকেই তা জানাতে হবে। এ সব বিধান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের জানা না থাকার কোনো কারণ নেই এবং সুযোগও নেই। দলটি বাহ্যত

www.pathagar.com

ইচ্ছাকৃভাবেই যথাযথভাবে ইসির সাথে যোগাযোগ রক্ষার বদলে সরকারের কাছে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল ও নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছে এবং এ দাবি আদায়ের জন্য হরতালের মতো ক্ষতিকারক কর্মসূচীও পালন করেছে। নতুন নির্বাচন চেয়ে সরকারের নিকট দাবি উত্থাপনে দায়ে অবশ্য অন্য দু'দল জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতও সমানভাবে দায়ী। নির্বাচনের বৈধতা বিষয়ে দায়েরকৃত একটি বিলম্বিত আবেদন অবশ্য আওয়ামী লীগ শুনানীর পূর্বে প্রত্যাহারও (পরিশিষ্ট-২ক) করেছিলো। তাই সামাগ্রিকভাবে মাগুরা-২ উপনির্বাচন আয়োজন ও এর ফলাফল বিষয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকেনি।

মাগুরা-২ উপনির্বাচনে রাজনৈতিক দলের আচরণ

এ পর্যায়ে মাগুরা-২ উপনির্বাচনকেন্দ্রিক ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের আচরণ পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এ নির্বাচনের সময়ে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি নির্বাচনী প্রচারণা পর্বে আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ করেছিলো বলে দাবি করা যায়। মাগুরা-২ উপনির্বাচনের সময় বিএনপি দলীয় বেশ ক'জন মন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দু'দফায় (মার্চ ৭ ও ১৭) তার দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রির পদমর্যাদা ও সুবিধা কাজে লাগিয়েছেন এবং এ কাজ আরো কয়েকজন মন্ত্রিও করেছেন। মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রির প্রটোকল নিয়ে প্রচারণায় অংশ নেয়াটি নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ছিলো।

এ নির্বাচনী প্রচারণাকালে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রিগণ এ নির্বাচনী এলাকার নানামাত্রিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এটিও নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল সরকারী-প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রয়োগ করেছে বলে আওয়ামী লীগ লিখিতভাবেই ইসিকে জানিয়েছিলো। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর এসপি ও ওসিদের বদলি করা হয়েছে, আনসার-ভিডিপি সদস্যদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে অনানুষ্ঠানিক চাপ দেয়া হয়েছে এবং ৩ জন ইউপি চেয়ারম্যানকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অনানুষ্ঠানিক চাপ দেয়া হয়েছিলো বলে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছিলো। এ অবস্থাটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূল ছিলো না এবং সব প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগের পরিপন্থী ছিলো।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ পাওয়া গেছে:

এক. দলটি জাতীয় পার্টির প্রার্থী এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী বিষয়ে ভোটারদের, বিশেষ করে হিন্দু ভোটারদের, বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য শুনিয়েছে। একটি দৈনিকে এ বিষয়ে রিপোর্ট বেরিয়েছিলো।[১৫]

দুই. আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ মাগুরা সার্কিট হাউজের ১ নম্বর কক্ষটি ১৯ মার্চ, শনিবার, দখল করে রাখেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ কক্ষটিসহ সার্কিট হাউজের সবগুলো কক্ষ ১৯ ও ২০ মার্চ ইসির সচিবালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। সার্কিট হাউজ সংরক্ষণের এ তথ্য অবগত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার সহকর্মী মন্ত্রিগণ মাগুরা সার্কিট হাউজের কক্ষসমূহ শুক্রবার রাত ও শনিবার ভোরে ফাঁকা করে দেন। অন্যদিকে জেলা প্রশাসনের সাথেও কোনো কথা না বলে বা অনুমতি না নিয়ে শেখ হাসিনা সার্কিট হাউজের ১ নম্বর কক্ষে অবস্থান নেয়ায় সেটিকে 'কক্ষ দখল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ইসি ঘোষিত সচিবালয়ের কক্ষে অনুমতিবিহীন শেখ হাসিনার অবস্থানের কারণেই অসন্তুষ্ট হয়ে সিইসি মাগুরায় নির্বাচন দেখা-শুনার জন্য ১৯ মার্চ শনিবার উপস্থিত হলেও তিনি একই দিন বিকেলে ঢাকায় ফিরে যান। শেখ হাসিনার এ আচরণটি নির্দিষ্টভাবেই অশোভন ছিলো।

মাগুরা-২ উপনির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি: যোগসূত্র ও যৌক্তিকতা

মাগুরা-২ উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষের আড়াই ঘন্টার মাথায় আওয়াম লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনটির ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন। ভোটদান শেষের আড়াই ঘন্টার মাথায় ভোট গণনা শেষ হবার কোনো সুযোগ ছিলো না। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী সে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দাবি করেছিলেন। অন্যদিকে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন, মাগুরা-২ উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহৃত সরকারী ও প্রশাসনিক সুবিধা তাদের দাবিকৃত নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। শেখ হাসিনার উপস্থাপনা থেকে মনে হতে পারে, নির্বাচনটির সম্ভাব্য ফলাফল তারা আগেই জানতেন এবং এ জন্যই তারা ফলাফলের অপেক্ষা না কইে নির্বাচনটি প্রত্যাখ্যান করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মাগুরা-২ উপনির্বাচন

---

১৫ *The Daily Star*, ঢাকা, ২১ মার্চ ১৯৯৪।

www.pathagar.com

আয়োজনের দাবিটি কোনোভাবেই অনুশীলনযোগ্য বা বাস্তবায়নযোগ্য ছিলো না। ১৯৯০ সালে তৎকালীন শাসক এইচ এম এরশাদের কাছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগসহ প্রায় সব বিরোধী দল একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুলেছিলো। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সে দাবি পূরণও হয়েছিলো। এরপর প্রায় সব দলের সম্মতিতে বাংলাদেশে৭ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী সম্পন্ন হয়েছিলো। সে সময় জামায়াতসহ ব্যক্তি পর্যায়ে কেউ কেউ নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানও দ্বাদশ সংশোধনীর অংশ করার দাবি তুলেছিলো। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সে দাবি গ্রহণ করেনি। কার্যত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের প্রেক্ষাপটেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির সাথে যোগ দেয়। ইসির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রিপোর্টের সূত্রে সিইসি মাগুরা-২ উপনির্বাচনকে আইনানুগভাবে গ্রহণযোগ্য ও বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এ নির্বাচনে কিছু ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের হারকে অস্বাভাবিকভাবে বেশি হিসেবে ইসি স্বীকার করলেও সে বিষয়ে আইনানুগভাবে নিজ উদ্যোগে ইসির কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার ছিলো না বলে সিইসি জানিয়েছেন। তিনি এ পর্যায়ে তার কয়েকটি ইউপি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার (পরিশিষ্ট-১ ও ২) কথাও উল্লেখ করেন যেখানে কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে অস্বাভাবিক উচ্চ হারে ভোটদানকে (৯৭%-৯৯%) প্রশ্নাতীত ভোট কারচুপি বিবেচনা করে তিনি ভোটের ফলাফল বাতিল করে নতুন ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ তার সে সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে জানিয়েছিলো, কোনো নির্বাচনের ফলাফল যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হলে সে ফলাফল বিষয়ে শুনানী গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার থাকে কেবল ইসি দ্বারা গঠিত নির্বাচনী আদালতের। যথাযথ প্রক্রিয়ায় যেহেতু আওয়ামী লীগ নির্বাচনী আবেদনের (ইলেকশন পিটিশন) মাধ্যমে সে নির্বাচন বিষয়ে প্রশ্ন বা আপত্তি ইসির নিকট উত্থাপন করেনি এবং ভোটকেন্দ্রসমূহ ও নির্বাচনী এলাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ (তথা প্রিজাইডিং অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার) যেহেতু যথানিয়মে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে বলে রিপোর্ট করেছে, প্রাথমিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করে ভোটের একত্রীভূত ফলাফলের বিবরণী ইসিতে প্রেরণ করেছে, তাই সিইসি তথা ইসির পক্ষে সে ফলাফল বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রশ্ন তোলার ও তা বাতিল করার অথবা স্থগিত করার অধিকার ছিলো না। যথানিয়মে আবেদন করে এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন কোনো প্রার্থী বা সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে উত্থাপন করা হলেই কেবল এ জন্য ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতো ও শুণানী গ্রহণ করে উপযুক্ত রায় দেয়া যেতো।

ইসির পক্ষ থেকে ভোটগ্রহণকৃত ৯৯টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর আপত্তিকৃত ৩টি কেন্দ্রসহ মোট ৭টি ভোটকেন্দ্রের ভোটদানের হারকে অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে চিহ্নিত (সারণি-৮) করা হয়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে চিহ্নিত অথবা দাবি করা না হলেও ইসি আরো ৪টি ভোটকেন্দ্রের ভোটদানের হারকে অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ উচ্চহারের ভোটদানকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রশ্ন করার (বা বাতিল/স্থগিত করার) আইনগত অধিকার ইসির ছিলো না। ইসিকে সঙ্গতকারণেই আনুষ্ঠানিক (ফর্মাল, প্রুভেবল) বিষয়াদিকে বিবেচনায় নিতে হয়েছে। কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়মের কথা স্বীকার করলেও (সারণি-৭ক, ৭খ) ইসির পক্ষে সে সব কেন্দ্রের বিষয়ে নিজ দায়িত্বে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ছিলো না।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকার ভোট ৫ প্রার্থীর সবার মাঝে কম-বেশি বিভক্ত হওয়া ও শালিখা থানার একমাত্র প্রার্থীর বিষয়ে সে থানার ভোটারদের প্রাথমিকভাবে স্বাভাবিক আনুকূল্য প্রদর্শনের বিষয়টি ছাড়াও জাতীয় পার্টির এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরীর মতো একজন সম্ভাবনাময় প্রার্থীর উপস্থিতির কারণে আওয়ামী লীগের ভোটের পূর্ববর্তী হিসাবে ব্যত্যয় এবং ভিন্নতা সৃষ্টি হবার বিষয়টি কম-বেশি বোধগম্য বটে। এবং এ বাস্তবতায় ক্ষমতাসীন দলীয় প্রার্থীর বিজয়ের বিষয়টি, যে ব্যবধানেই হোক, অকল্পনীয় এবং অস্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু এ নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন দলের নানামাত্রিক আচরণবিধি লঙ্ঘন ও সরকারী-প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণের প্রমাণযোগ্য ঘটনাবলীর কারণে মাগুরা-২ উপনির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে বিজয়ী হয়েও তারা বিজয়টি তাদের জন্য সুখকর ও স্বস্তিদায়ক করতে পারেনি। এখানেই বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলগুলোর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো প্রকট হয় এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে সমাজ-রাষ্ট্রের অন্য শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিপরীতে তাদের মর্যাদা ও প্রাধান্যের জন্য ন্যাক্কারজনকভাবে হানিকর 'সাধারণ নির্বাচনকালীন অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার' যুক্তিটি দৃঢ়তা অর্জন করে।

সমাপনী পর্যবেক্ষণ

মাগুরা-২ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি (মার্চ ১৯৯৪ - মার্চ ১৯৯৬) অস্থির ছিলো এবং অবশেষে প্রশ্নযোগ্য ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবার পর রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সে অচলাবস্থার অবসান হয়। ক্ষমতাসীন দল বিএনপি মাগুরা-২ উপনির্বাচনে চিহ্নিত অসংযমী আচরণ প্রদর্শনী না করলে এবং তা সত্ত্বেও সে নির্বাচনে বিজয়ী হলে বিরোধী দলগুলো একই ধরনের আন্দোলন ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করতো কি-না, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। বিরোধী দলগুলোর এবং নির্দিষ্টভাবে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের আচরণে বিভিন্ন মাত্রার অসংযম ও অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলটির কিছু নির্দিষ্ট অসংযমী কার্যক্রম সব বিরোধী দলকে কথিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে জোটবদ্ধ হতে সাহায্য ও প্ররোচিত করে এবং দীর্ঘ দু'বৎসরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষতির মূল্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়।

ইসির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী মাগুরা-২ উপনির্বাচন আইনানুগভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলো এবং এ বিষয়ে ইসির অন্যবিধ স্বতঃপ্রণোদিত ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার ছিলো না।

আওয়ামী লীগ ও অন্য দু'টি বিরোধী দল নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ নির্বাচন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি অথবা করতে চায়নি অথবা তেমন প্রশ্ন উত্থাপন রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুকূল মনে করেনি। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল তথা ৫ প্রার্থীর প্রায় সবারই কম-বেশী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন অথবা অমান্য করার দায় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান দু'দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এগিয়ে ছিলো।

ইসির অস্থায়ী সচিবালয় ঘোষণা করে সংরক্ষিত মাগুরা সার্কিট হাউজের কক্ষসমূহ ফাঁকা/ভ্যাকেট করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসাযোগ্য দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলীয় সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরিকল্পনার বাইরে (আনশিডিউলড) সিইসির মাগুরা ত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে আসার কারণ হিসেবে পরদিনের নির্বাচনে অনিয়ম-কারচুপির আশঙ্কা ব্যক্ত করার সংবাদটি খোদ সিইসি অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে বিএনপি-র দু'মন্ত্রির (আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ও জেনারেল অব. মজিদুল হক) দাবিকৃত বিষয়ে (সার্কিট হাউজের কক্ষে শেখ হাসিনার অনুমতিবিহীন অবস্থানের কারণে অসন্তুষ্ট-বিব্রত হয়ে সিইসির ঢাকায় ফিরে আসা) সিইসির বক্তব্য জানা যায়নি। তাই এ কারণটি সন্দেহের আওতায় থেকে গেছে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বও সম্ভাব্য দোষী হিসেবে বিদ্যমান থাকছেন, যতক্ষণ না বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ এ বিষয়ে তার বক্তব্য জানাচ্ছেন।

www.pathagar.com

এ নির্বাচনের ফলাফলকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ কম। কারণ সামগ্রিক বাস্তবতা কম-বেশী ক্ষমতাসীন দলীয় প্রার্থীর অনুকূলে ছিলো।

কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের এ নির্বাচনকেন্দ্রিক সামগ্রিক আচরণ নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দাবিকে ন্যায্যতা প্রদান করে। কারণ এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল তার প্রার্থীর পক্ষে সরকারী-প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার সুবিধাকে ব্যবহার করেছিলো, যা বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের পাবার সুযোগ ছিলো না। এটি সব প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ ধারণার পরিপন্থী ছিলো।

শেষ বিচারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-প্রশাসন রাজনৈতিক প্রাধান্যের পরিপন্থী হলেও প্রধান তিন বিরোধী দলের সমর্থিত দাবিটি, নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার-প্রশাসন, অধিকাংশ জনগণের-সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলন হিসেবে গণতান্ত্রিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য ছিলো।

পুনশ্চ

সিইসি কেনো ঢাকায় ফিরে যান?

সিইসি বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ ১৯ মার্চ ১৯৯৪ তারিখ ভোরে যশোর বিমান বন্দর হয়ে সড়কপথে মাগুরায় আসেন। ইসি সূত্রে জানানো হয়েছিলো, নির্বাচন অনুষ্ঠান দেখে পরদিন ২০ মার্চ তিনি ঢাকায় ফিরবেন। কিন্তু তিনি ১৯ মার্চ বিকেলে ঢাকায় ফিরে যান। ২০ মার্চ ঢাকার কয়েকটি দৈনিকে জানানো হয়, পরদিনের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের সম্ভাব্য কারচুপি আশঙ্কা করেই সিইসি অনির্ধারিতভাবে ঢাকায় ফিরে যান বলে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন।

২০ মার্চ তারিখে বিচারপতি রউফ সাংবাদিকদের জানান, তিনি কোনো সাংবাদিকের সাথে মাগুরায় এ বিষয়ে কথাই বলেননি। সিইসির মাগুরায় অবস্থানকালে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিলো: ১. নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯টি ইউনিয়নে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি দলের ১জন করে প্রতিনিধি ও ইসির ১ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি করে 'নির্বাচন মনিটরিং টীম' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সিইসি এবং তিনি সব দলের নিকট থেকে প্রতিনিধিদের নামের তালিকা চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট এ প্রস্তাবে একমত হয়ে প্রতিনিধিদের নামের তালিকা জমা দেয়। ক্ষমতাসীন দল বিএনপি এ প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হলেও পরে তা থেকে ফিরে আসে এবং প্রতিনিধিদের নাম জমা দেয়া থেকে বিরত থাকে।

www.pathagar.com

ফলে প্রস্তাবিত সর্বদলীয় নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠন করা যায়নি। সিইসি অনির্ধারিতভাবে ঢাকায় ফিরে গেলে আওয়ামী লীগের নেতা তোফায়েল আহমেদ দাবি করেন, বিএনপির এ ভূমিকার প্রতিবাদেই সিইসি অসন্তুষ্ট হয়ে ঢাকায় ফিরে যান। ২. ক্ষমতাসীন দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে সিইসি বিচারপতি রউফ মাগুরা-২ উপনির্বাচন সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার জন্য মাগুরার নির্বাচনী এলাকায় যাবার ও দু'দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্য মাগুরা সার্কিট হাউজের ৬টি কক্ষের সবগুলো ইসির সিইসি ও কর্মকর্তাদের জন্য তথা ইসির নামে-'ইসির অস্থায়ী সচিবালয়' হিসেবে ১৯ ও ২০ মার্চ তারিখের জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং একটি সাইনবোর্ডও সেখানে স্থাপন করা হয়। কিন্তু ১৯ মার্চ সকালে আওয়ামী লীগ ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সার্কিট হাউজের ১ নম্বর কক্ষে যান ও অবস্থান করতে থাকেন। মর্যাদার বিবেচনায় ১ নম্বর কক্ষটি সিইসির জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। সিইসি মাগুরা সার্কিট হাউজে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়টি জানতে পারেন এবং সার্কিট হাউজের কমন রুম বা দর্শনার্থী কক্ষে অবস্থান নিয়ে সেখানেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন ও নির্দেশনা প্রদান করেন। এবং ১৯ মার্চ দ্বিতীয় বেলায় মাগুরা ত্যাগ করার কথা জানিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ক্ষমতাসীন দল বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় সিইসির জন্য সংরক্ষিত সার্কিট হাউজের ১ নম্বর কক্ষটি শেখ হাসিনা 'দখল করায়' সিইসি বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা বাতিল করে ঢাকায় ফিরে যান।

এদিকে ২০ মার্চের কয়েকটি দৈনিক বার্তা সংস্থা ইউ*এনবি*-র সূত্রে সিইসির অনির্ধারিতভাবে মাগুরা থেকে ঢাকায় ফিরে আসার বিষয়ে সিইসির উদ্ধৃতিসহ একটি সংবাদ প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, 'সিইসি সুষ্ঠু নির্বাচন বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন' এবং বলেছেন 'আমি এমন নির্বাচনের দায় নিতে চাই না' (*দ্য বাংলাদেশ অবজার্ভার*সহ ২০ মার্চ সংখ্যায় ঢাকার কয়েকটি দৈনিক এ সংবাদ প্রকাশ করে)।

এ ২০ মার্চ তারিখেই ঢাকায় কয়েকজন সাংবাদিকের পীড়াপীড়িতে সিইসি জানান, তিনি মাগুরায় কোনো সাংবাদিকের সাথেই কথা বলেননি এবং তিনি উল্লিখিত বক্তব্যও রাখেননি (*দ্য ডেইলী স্টার*সহ ২১ মার্চ সংখ্যায় ঢাকার কয়েকটি দৈনিকে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়)।

সিইসির অনির্ধারিতভাবে ঢাকায় ফিরে আসার কারণ তার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবার কথা (*দ্য ডেইলী স্টার*, ২০ মার্চ ১৯৯৪) থাকলেও সেটি আর কখনো ঘটেনি। এমনি বাস্তবতায় ঘটনার ১৪ বৎসর পর বিচারপতি মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আবদুর রউফের সাথে বর্তমান গবেষক কথা বলেন এবং তার মাগুরা ছেড়ে ঢাকায় ফিরে আসার প্রকৃত কারণ জানাবার অনুরোধ করেন। সাবেক সিইসি বিচারপতি আবদুর রউফ যা বলেন তার সারকথা এমন:

'মাগুরা-২ উপনির্বাচনটি প্রথম নির্দিষ্ট মেয়াদে (আসন শূন্য হবার ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠান) আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। অতিরিক্ত দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দিবসের আগের দিন নির্বাচনটি হচ্ছিলো। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সব পক্ষের অনুরোধেই আমি মাগুরায় উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এ জন্য মাগুরা সার্কিট হাউজকে ইসির অস্থায়ী সচিবালয় ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাচনের আইনমতে ইসির অধীনে আসা মাগুরার ডিসি এবং নির্বাচনটির রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় সব আয়োজন করা হয়েছে বলে আমাকে জানান। আমি ইসির সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিয়ে মাগুরা সার্কিট হাউজে যাই। এ সময় মাগুরার ডিসি জড়োসড়ো ভঙ্গিতে ক্ষমা চান এবং বলেন, স্যার আমি এক্ষুণি বিরোধী দলীয় নেত্রীকে সার্কিট হাউজের ১ নম্বর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার অনুরোধ করছি। আসন্ন নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বিবেচনায় আমি তাকে তীব্র ভর্ৎসনা থেকে বিরত থাকি এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বের করে দেয়া থেকে তাকে থামিয়ে নিচতলার একটি কক্ষে অবস্থান নিই। আমি তখন বিবেচনায় নিয়েছি, বিরোধী দলীয় নেত্রীর সার্কিট হাউজে অবস্থান নেয়ার তথ্যটি ডিসি আমাকে অন্তত যশোরে পৌঁছা পর্যন্ত সময়ে এবং এমনকি যশোর থেকে মাগুরার উদ্দেশ্যে যাত্রার আগেও জানাতে পারতো। তেমনটি না করা এ ডিসির অযোগ্যতা অথবা কূটবুদ্ধির নির্দেশক হতে পারে। এ অবস্থায়ই আমি সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করি। এতে সবার জন্য আমি করণীয় নির্দেশ করি। বৈঠকে সরকার দলীয় কয়েকজন মন্ত্রী-এমপিও উপস্থিত ছিলেন। বিএনপির পক্ষে মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া আমার প্রস্তাবিত সর্বদলীয় নির্বাচন মনিটরিং টীম-এর সাথে না থাকা ও তাতে তাদের দলীয় প্রতিনিধিদের তালিকা প্রদান না করার কথা জানান। তাতে সে উদ্যোগটি কার্যকর হতে পারেনি। আমি এ নির্বাচনটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বসহ নিয়োগের পাশাপাশি তাদের ন্যায্যভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। কয়েকজন কর্মকর্তা ক্ষমতাসীন সরকার দলীয় স্বার্থের প্রতিকূলে সম্ভাব্য দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সংশয় ও শঙ্কা প্রকাশ করার প্রেক্ষাপটে তাদের নিয়োগপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ নির্বাচনী বিধিটিও আমি সংযুক্ত করে দেয়ার ব্যবস্থা করি, যাতে দায়িত্ব পালনকালে সরকার দলীয় প্রভাবশালীদের যে কোনো অন্যায্য দাবির ক্ষেত্রে তারা সে বিধিটিও

www.pathagar.com

প্রদর্শনের সুযোগ নিতে পারে। স্বভাবতই বিভাগীয় ও জেলা পুলিশ ইসির নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হয়েছিলো এবং নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ইসির আওতায় ছিলো। আমি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মাগুরায় বৈঠককালে অনুধাবন করেছিলাম, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে বিজয়ী হবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ সময় বেশ ক'জন মন্ত্রী এবং শতাধিক সরকার দলীয় এমপি মাগুরায় অবস্থান করছিলেন। অন্যদিকে বিরোধী দল এবং বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগও আসনটি রক্ষার জন্য একই মাত্রায় মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলো। দলটির প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় নেতা মাগুরায় জড়ো হয়েছিলেন। খোদ বিরোধী দলীয় নেত্রী মাগুরা সার্কিট হাউজের ১ নম্বর কক্ষে অনুমোদন ছাড়াই অবস্থান নিয়েছিলেন। আমি খেয়াল করছিলাম, বিরোধী দলীয় নেত্রীর অনুমোদনবিহীন এ অবস্থানের বিষয়ে দলটির কেন্দ্রীয় নেতা তোফায়েল আহমেদসহ কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা বিষয়টি অনুধাবন করছিলেন না। আমি দেখেছি, আমার সাথে বৈঠককালেই ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলীয় শীর্ষস্থানীয় নেতারা একে অন্যের দিকে তেড়ে যাবার ভঙ্গি করছিলেন। এর অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয়বরণ এ জন্য ভূমিকা রেখে থাকতে পারে। আর বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দলও কোনোভাবে ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলো না। যে কোনো সুযোগে এ দু'দলের সংঘর্ষ বাঁধার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলো। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলের কোনো দায়িত্বশীলতা আমি দেখিনি। যেহেতু পুলিশ প্রশাসন ইসির নিয়ন্ত্রণে ছিলো, তাই যে কোনো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায় তারা ইসির ওপর চাপাবার সুযোগে ছিলো বলে অনুমান করা যাচ্ছিলো।

এ দফায় মাগুরায় যাবার আগে আমি একবার নির্বাচনটির পরিস্থিতি বোঝার জন্য অঘোষিতভাবে মাগুরা সফর করেছিলাম। তখন রমজান মাস। এক বিকেলে আমি সাধারণ পোশাকে, কোনো নিরাপত্তা কর্মী ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ছাড়াই, নির্বাচনী এলাকার শালিখা থানার একটি মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করি এবং মুসুল্লিদের কাছে আসন্ন নির্বাচন বিষয়ে কৌতুহল প্রকাশ করি। পায়জামা, পাঞ্জাবী ও টুপি পরিহিত এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত এ অচেনা আমাকে মুসুল্লিরা একজন 'হুজুর' বিবেচনা করেই নির্বাচন বিষয়ে খোলাখুলি তাদের মতামত বলছিলেন। এর সারমর্ম ছিলো: 'শালিখার ভোট শালিখার, মোহাম্মদপুরের ভোট মোহাম্মদপুরের'। আমি বুঝে নিয়েছিলাম, আসন্ন নির্বাচনটি আঞ্চলিকতার বিবেচনায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ দিন এ নির্বাচনী এলাকার মোহাম্মদপুর থানার অধিবাসীরাই এমপি হয়েছেন, শালিখা থানা থেকে কেউ এ সুযোগ পাননি। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল শালিখা থেকে

www.pathagar.com

তাদের প্রার্থী মনোনীত করেছিলো। তার সম্ভাব্য বিজয় ঠেকানো প্রায় কঠিন বিষয় ছিলো। কারণ মোহাম্মদপুর থেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৪ জন প্রার্থী। মোহাম্মদপুরেরর ভোট ৫ ভাগে বিভক্ত হবার সুযোগ বেশি ছিলো। মাগুরায় ১৯ মার্চে উপস্থিত হয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুধাবনের পর উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য পরিণতি বিবেচনায় রেখে আমি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে ঢাকায় ফিরে যাওয়াই সঙ্গত বিবেচনা করেছিলাম। উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির মধ্যে ছিলো বিরোধী দলীয় নেত্রীর অনুমোদনবিহীন সার্কিট হাউজে অবস্থান, এ বিষয়ে আমাকে ডিসির পক্ষ থেকে না জানানো এবং বিপুল সংখ্যক ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের মাগুরায় অবস্থান আর সম্ভাব্য পরিণতির মধ্যে ছিলো যে কোনো সুযোগে প্রধান দু'দলের মধ্যে বড় মাত্রার সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়া এবং সেখানে অনিবার্যভাবেই ইসিকে রেফারীর ভূমিকা পালন। আমি অনুধাবন করেছিলাম, আমার উপস্থিতি উভয় দলকে সংঘর্ষ বাঁধানোয় উৎসাহিত করতে পারে। কারণ সে ক্ষেত্রে সংঘর্ষ থামাবার একজন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি থাকতো। আমি চাইনি ১৯৯১ সালে আমার হাতে বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হয়েছিলো, আমার হাত দিয়েই তা ক্ষতিগ্রস্ত হোক।'

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়*

বাংলাদেশে সংসদীয় আচরণ: তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ

প্রস্তাবনা

পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি উপনির্বাচনের পর, ২০ মার্চ ১৯৯৪-র পরবর্তী দিনগুলোয়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় ১৯৯১-র ফেব্রুয়ারী মাসে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থার দাবী আদায়ের লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলগুলো সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনে (৪ মে - ১২ মে ১৯৯৪) যোগদান থেকে বিরত থাকে। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন বয়কট অব্যাহত থাকবে বলে বিরোধী নেতৃবৃন্দ প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে সংসদীয় আলোচনার আহবান জানানো হলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। বাহ্যত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী একটি জাতীয় দাবীতে উন্নীত হয়েছে। এ বাস্তবতায়, বর্তমান উপস্থাপনায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সংসদীয় আচরণের একটি সমীক্ষা করা হবে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন প্রক্রিয়া, বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের বিকাশ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট আলোচিত উপনির্বাচন প্রসঙ্গে কিছু তথ্য ও মূল্যায়ন উপস্থাপিত হবে। আর অনিবার্য বিবেচনায় সংসদীয় ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের চেষ্টা করা হবে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

ক. সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পশ্চিমা উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি দিক। কথাটি নির্দিষ্ট করে বলেছেন V. Bhaskara Rao ও B. Venkateswarlu তাদের সম্পাদিত গ্রন্থে এভাবে: 'সংসদীয় ব্যবস্থার সরকার, যার উৎপত্তি ও

---

* বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ আয়োজিত "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকরিতা" শীর্ষক সেমিনারে (৫ জুন ১৯৯৪) এ অধ্যায়টি প্রবন্ধ আকারে উপস্থাপিত।

www.pathagar.com

বিকাশকে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে চিহ্নিত করা যায়, পশ্চিম উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দুই প্রধান ধারার একটি, অন্যটি হলো মার্কিন ধাঁচের রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থা'।[১] Karl Loewenstein দু'টি দেশের সরকারকে সংসদীয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন: 'শেষ বিশ্লেষণে মাত্র দু'টি ব্যবস্থা বাকি থাকে, যেগুলোকে প্রামাণ্য অর্থে (এজ অথেন্টিক) সংসদীয় সরকার বলা যায়, ফ্রান্সের ধ্রুপদী (ক্লাসিক) সংসদীয় তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজাতন্ত্র এবং বৃটিশ নমুনা (ভার্সন), সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদীয় (কেবিনেট) সরকার'।[২]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে সংসদ, সংসদ গঠনের শর্ত এবং সংসদীয় সরকারের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। এ তিনটি ধারণা পাবার জন্যই আমরা Karl Loewenstein-এর শরণ নেবো: 'বর্তমানে 'সংসদ' (পার্লামেন্ট) বলতে বোঝায় সীমিত সংখ্যক সদস্যের একটি সংস্থাকে, যে সদস্যদের আনুষ্ঠানিক (অফিশিয়াল) কাজ হলো তাদের 'প্রতিনিধিত্ব' করা, যারা সংখ্যা অথবা ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে নিজেদের (পার্লামেন্টে) উপস্থিত করতে পারে না। তাই 'সংসদ' একটি 'প্রতিনিধিত্বশীল' সংস্থা, এবং আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্ব দাবী করে, সব বয়স্ক নাগরিকের সেখানে 'প্রতিনিধিত্ব' রয়েছে। নির্বাচন এখানে প্রতিনিধিদের, সীমিত সংখ্যায়, মনোনয়নের মাধ্যম। যদিও তাত্ত্বিকভাবে মনোনয়নের অন্য ধরনগুলো (ফর্মস) গ্রহণও সম্ভব। নির্বাচনগুলো অবশ্যই গণতান্ত্রিকভাবে সৎ হতে হবে অর্থাৎ নির্বাচনী-ফলের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো থেকে নির্বাচনকে মুক্ত হতে হবে। এর অর্থ, কার্যত, নির্বাচনগুলো হতে হবে সাধারণ সার্বজনীন বয়স্ক ভোটারভিত্তিক, যাতে সংঘ ও অভিমতের স্বাধীনতা থাকবে এবং যা সরকারী চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। এখানে বোঝানো হচ্ছে, যেখানে প্রকৃত শাব্দিক অর্থেই একটি সংবিধান আছে, লিখিত বা অলিখিত, কেবল সেখানেই একটি খাঁটি সংসদ বিরাজ করতে পারে এবং বিকশিত হতে পারে'।[৩] সংসদীয় সরকারের সংবিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সংসদীয় সরকার কেবল একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোর আওতায়ই বিকশিত হতে পারে। এটি সরকারী নীতি প্রণয়নে সংসদের সহযোগিতার অপরিহার্যতাকেই কেবল ইঙ্গিত করে না, এর অর্থ সংবিধানে অবশ্যই, এর নিজস্ব প্রক্রিয়ায়, নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কার্যকর বিধান থাকতে হবে,

---

১ V. Bhaskara Rao and B. Venkateswarlu (eds), *Parliamentry Democracy in India*, Delhi: Mittal Publications, 1987, preface.

২ Karl Loewenstein, *British Cabinet Government*, New York: Oxford University Press, 1967, p-XIV.

৩ Loewenstein, ibid, p-IX

www.pathagar.com

যাকে অগ্রসর সমকালীন রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিভাষায় বলে আন্তঃআঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ'।[৪] সংসদীয় সরকারের স্বরূপ প্রসঙ্গেই Loewenstein বলেছেন, 'প্রকৃত প্রস্তাবে সংসদীয় সরকার হলো সংসদ ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক ক্ষমতা-সাম্য, প্রতিটিরই থাকে নিজস্ব আন্তঃআঙ্গিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, যাতে কোনোটিই অন্যটিকে ছাড়া সাংবিধানিকভাবে সরকারী নীতি প্রণয়ন করতে পারে না। আধুনিক সাংবিধানিক গণতন্ত্রে কোনো দেশ এমনটি প্রয়োগ করলে, সেটিকে কোনোভাবেই সংসদীয় ব্যবস্থা বলা যাবে না, যদিও তাদের মুক্ত নির্বাচন থাকে, থাকে রাজনৈতিক সংঘ ও অভিমতের স্বাধীনতার সকল গুণ'।[৫]

সংসদীয় তথা প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের 'পূর্বশর্ত' তুলে ধরেছেন অধ্যাপক Harold J Laski: 'বেজহট কথিত সফল প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের 'পূর্বশর্ত' বস্তুত বহুসংখ্যক এবং জটিল উভয়ই। এটি বুদ্ধি এবং সততার চাইতে বেশি কিছু দাবী করে। ... দ্বিতীয়ত: এটি দাবী করে কোনো গুরুত্বের, সমাজের কোনোও একটি শ্রেণী স্থায়ীভাবে ক্ষমতা থেকে বাইরে থাকবে না- জাতির মধ্যে এ বিচারশক্তি থাকতে হবে। ... সফল প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের তৃতীয় শর্ত হলো; একে পুরো জাতির মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃত সহিষ্ণুতার অভ্যাসের ওপর নির্মিত হতে হবে'।[৬]

সংসদীয় সরকার হলো নাগরিক সম্মতির সরকার। অধ্যাপক Laski বলেন, 'এখন সংসদীয় সরকার, আমি যেমনটি বলেছি, এ নীতিকে মান্য করে যে, নাগরিকেরা চাইলে তাদের মতভিন্নতাগুলোকে সম্মতির আপোষের মাধ্যমে স্থির করতে পারে। তারা যৌক্তিক সৃষ্টি -এর দ্বারা কেবল এটিই মেনে নেয়া হয় না, এ দ্বারা গ্রহণ করা হয় যে, তারা তাদের মতদ্বৈততাগুলো আলোচনা করে, একই রকমের আলোচনার প্রতিজ্ঞাকে মেনে নিয়ে'।[৭]

বৃটিশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা বৃটিশ সংবিধান যে কোনো উদীয়মান গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার জন্য নমুনা হিসেবে বিরাজ করে থাকে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দাবী করেন।[৮] এ বৃটিশ সংবিধান সংসদের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করেছে: 'সংসদের

---

৪ Loewenstein, ibid, p-X

৫ Loewenstein, ibid, p. XI

৬ Harold J Laski, *Parliamentary Government in England*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1963, pp-14-15.

৭ Laski, pp-45-46.

৮ 'বৃটিশ সংবিধানের প্রমাণিত উপকারিতা এবং অনুশীলনযোগ্যতা বলতে বোঝায়, এটি সর্বদা এবং নির্দিষ্টভাবে সাম্প্রতিক সময়ে, সংবিধান প্রণয়ন অথবা বিদ্যমান সংবিধানের সংশোধনের সময় এটি (বৃটিশ সংবিধান) নমুনা হিসেবে কাজে লেগেছে' Loewenstein, ibid, p-6.

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব বৃটিশ সংবিধানের একটি নীতি। যেমনটি আমরা দেখবো, কোনো তত্ত্ব ইঙ্গিত করেনি বৃটেনে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কোথায় বিরাজ করে, কিন্তু সংসদকে সার্বভৌম হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কারণ বৃটিশ রাষ্ট্র পরিচালনার এটি একটি স্থিরীকৃত প্রক্রিয়া যে, সংসদ যে কোনো আইন তৈরী বা বাতিল করতে পারে। সংসদের কোনো আইনের বৈধতা বিষয়ে কেউই প্রশ্ন করতে পারে না'।[৯]

প্রাসঙ্গিকভাবে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদীয় সরকারের দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা নেয়া যেতে পারে। Loewenstein বলছেন, 'বৃটেনে অনুশীলিত মন্ত্রিপরিষদীয় সরকার হলো মূল সংসদশাসিত সরকারের পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপ। এর সফল অনুশীলন নির্ভর করে দেশব্যাপী দু'টি, এবং দুই-র চাইতে বেশী নয়, রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এবং দল দু'টির পারস্পরিক ক্রিয়ার ওপর। এর অর্থ বহুদলীয় পরিবেশ গঠনের সুযোগ কম, যদিও অভিজ্ঞতা যেমনটি বলছে, এর সম্ভাবনা সর্বত্র বাতিল করে দেয়া যায় না'।[১০]

খ. সংসদীয় আচরণ

সংসদ এবং এর গঠন বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Loewenstein যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা থেকে সাংসদ বা সংসদ সদস্যদের (মেম্বার অব দি পার্লামেন্ট) আচরণের একটি প্রধান দিক স্পষ্ট হয়েছে। সংসদে সাংসদগণ নিজেদের সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করেন। একই সাথে তারা সমগ্র দেশবাসীকেও প্রতিনিধিত্ব করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনা দান ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। একজন সাংসদ তার নির্বাচনী এলাকার জনগণ এবং সমগ্র দেশবাসীকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সংসদের ভেতর এবং বাইরে যে ভূমিকা পালন করেন, কার্যক্রম পরিচালনা করেন, এখানে সেই সামগ্রিক কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট সাংসদের সংসদীয় আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। একইভাবে একটি রাজনৈতিক দল অথবা সমগ্র সংসদের সংসদীয় আচরণকে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমান অধ্যায়ে সংসদীয় আচরণ বলতে এ তিনটি আচরণকেই পৃথকভাবে বিবেচনায় নেয়া হবে এবং নির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে এ সংসদীয় আচরণ বিশ্লেষণ করা হবে।

---

৯ Paul Silk with Rhodri Walters, *How Parliament Works*. London: Longman, (2nd Edition), 1989. p-37.

১০ Loewenstein. ibid, pp- 6-7.

www.pathagar.com

গ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার

যে সরকার কেবল 'সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম' তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন, সাধারণ বিবেচনায় তাকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা যেতে পারে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং মেয়াদের জন্য সরকার গঠিত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে, বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী, নির্বাচিত, মনোনীত ও স্বঘোষিত এ তিন ধরনের সরকারের কথা বলা যায়। নির্দিষ্ট নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গঠিত সরকারকে সংক্ষেপে নির্বাচিত সরকার বলা হয়। রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার স্বঘোষিত হয়ে থাকে। এ ঘোষণার সাথে সাধারণ নাগরিকজনের সম্পর্ক ক্ষীণ অথবা আদৌ নেই। মনোনীত সরকার বলতে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি-গোষ্ঠীর পছন্দের সরকারকে বোঝানো হয়। নির্বাচিত সরকারের মতো মনোনীত সরকারের একটি 'মেয়াদ' থাকে। তবে এ 'মেয়াদের' স্থায়ী কোনো বিধান থাকে না। মনোনীত সরকারের 'মনোনয়ক'ও স্থায়ী নন। সাংবিধানিক মেয়াদের দু'টি সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মনোনীত সরকারের প্রয়োজন হয় এবং তেমন সরকার গঠিত হয়। মনোনীত সরকার, এ বিবেচনায়, স্বভাবতই অন্তর্বর্তীকালীন। এ মনোনীত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি 'সীমিত' রূপই হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ জন্যে সীমিত যে, এ সরকার রাষ্ট্রের দৈনন্দিন অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের বাইরে কোনো কাজে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে। একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে দায়িত্ব অর্পণ পর্যন্ত এ সরকার দায়িত্ব পালন করে। ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান। ইসহাক খান গোলাম মোস্তফা জাতোই-র নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। জাতোই জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করেন এবং নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকেন এবং একটি নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হন। এর আগে ১৯৪৫ সালে উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে, ১৯৭৯ সালে চৌধুরী চরণসিং-এর নেতৃত্বে ভারতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিলো। এ ছাড়া পাকিস্তানে ১৯৯০ ও ১৯৯৩ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তর্বর্তীকালীন অথবা জাতীয় সরকার-প্রশাসনের তালিকায় রয়েছে র‍্যামজে ডোনাল্ড (১৯৩১) ও উইনস্টন চার্চিলের (১৯৪০) নেতৃত্বে যুক্তরাজ্য সরকার ও ড. নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৯৩ সালের সরকার। এ ছাড়া নামিবিয়া, কম্বোডিয়া ও হাইতিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন নির্বাচন পরিচালনা করে। বাংলাদেশে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর, জেনারেল এরশাদ সরকারের আনুষ্ঠানিক

www.pathagar.com

'পতন' ঘটে এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। তার সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে যারা অংশ নেন, তারাও বিরোধী দলগুলোর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই মনোনীত ও নিযুক্ত হন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের বিকাশ

২৬ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল এ সরকার বর্তমান মেহেরপুর জেলার মুজিব নগরে শপথ গ্রহণ করে। ১৯৭২-র ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিব ঢাকায় পৌঁছেন এবং ১১ জানুয়ারী একটি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী করেন। এ আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিচালিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত। ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ জারী করা বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ অনুযায়ী একটি গণপরিষদ গঠিত হয় সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে। বিভিন্ন কারণে বাদ পড়া সদস্যদের ছাড়া গণপরিষদের সদস্য স্যখ্যা দাঁড়ায় ৪০৩ জন (মোট ছিলেন ১৬৯ + ৩০০ = ৪৬৯ জন)। ৩৪ সদস্যের একটি খসড়া সংবিধান কমিটি গঠিত হয় ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে। নতুন স্থায়ী সংবিধান ১৯৭২-র ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এ সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার বিধান করা হয়। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেন। ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচন (প্রথম সংসদ) এ বিধানের আলোকে সম্পন্ন হয়। ১৯৭৫-র ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিক হয়ে যায়। ১৯৯১-র ২৭ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। এ সংসদের সদস্যগণ ১৯৯১-র ৬ আগস্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী সম্পন্ন করেন। এর ফলে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার: সংসদীয় আচরণ

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবী ওঠে জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিলতার প্রেক্ষাপটে। জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে নেয়ার একটি সম্মানজনক বিকল্প

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া হিসেবে 'নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের প্রস্তাব আসে। বিশিষ্ট আইনজীবী নেতা এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী দাবী করেন, *বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ* তার নেতৃত্বে প্রথম এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী ও প্রস্তাব উত্থাপন করে।[১১] দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৮৩-র ২০ নভেম্বর ঢাকায় এক সমাবেশে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য 'কেয়ারটেকার সরকারের' প্রস্তাব ও দাবী উপস্থাপন করে এবং একটি ফর্মুলা পেশ করে।[১২] একটি তত্ত্বাবধায়ক বা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনাকালে ১৯৯১-র ২৭ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনটিকে সাধারণভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে দাবী করা হয়েছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠনের পর ১৯৯১-র ৬ আগস্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়। এ সময় জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকারের সাংবিধানিক আয়োজন দ্বাদশ সংশোধনীতে যুক্ত করার দাবী তোলে। দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী অংশের কেউ কেউ কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে একই দাবী করেছিলেন।[১৩] সে কথা তখন প্রধান দুই বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এবং ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ভেবে দেখতে সম্মত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তির দাবীতে যে সংকট সৃষ্টি হয়, তার প্রধান প্রকাশ ঘটে ২০ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের পর। কথিত ভোট কারচুপির অভিযোগের পাশাপাশি সব বিরোধী দল মাগুরা উপনির্বাচনের ঘোষিত ফল প্রত্যাখ্যান করে, সরকারের সামগ্রিক ব্যর্থতার দাবী করে, সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভিত্তি দাবী করে এবং এ জন্য একটি বিল সংসদে উত্থাপনের ও পাশ করার নির্দিষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দেয়। সে অনুযায়ী বিরোধী দল জাতীয় সংসদের চতুর্দশ

---

১১ *সাপ্তাহিক রোববার*, ঢাকা, ৮মে ১৯৯৪, পৃ-১৩।

১২ ১৯৮৩-র ২১ নভেম্বর ঢাকায় প্রকাশিত *দৈনিক*সমূহ।

১৩ 'বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময়ও আমি এ বিষয়টির প্রতি জাতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি তখন বলিয়াছিলাম সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রাখিবার পদক্ষেপ নেওয়া যাইতে পারে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সকলকে অভ্যস্ত করিবার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা কিছু সময়ের জন্য রাখিলে ভাল হইবে। কিন্তু তখন শাসনতন্ত্রে এ ধরনের কোন বিশেষ বিধান সংযোজনের কথা কেহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই সময় সবাই মিলিয়া পদক্ষেপ নিলে কাজটি সহজ হইত'। মইনুল হোসেন, *অনেক কিছু ভুলিতে হইবে, অনেক কিছু শিখিতে হইবে*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯৪।

www.pathagar.com

অধিবেশনে (৪-১২ মে ১৯৯৪) যোগদান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির এ সঙ্কটটি অব্যাহত রয়েছে। আগামী ৬ জুন ১৯৯৪ তারিখে সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। এ অধিবেশন বাজেট অধিবেশন। এখানে বিরোধী দল উপস্থিত না থাকলে বর্তমান সংসদের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠবে, প্রশ্ন উঠবে সামগ্রিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়েও, যা দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়।

১৯৯৩ সালে তিন প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসহ পৃথক তিনটি বিল জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে জমা দেয়। বিল তিনটি সরকারী দলের অনীহায় সংসদের আলোচ্য সূচীতে আসতে পারেনি। জামায়াতে ইসলামীর দেয়া ফর্মুলায় বলা হয়েছে, সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদের পর ৩টি উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবিত কাঠামোটি গড়ে তোলা যাবে:

(১) জাতীয় সংসদের নির্বাচন ঘোষণার তারিখে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। (২) এ পর্যায়ে প্রসিডেন্ট তার সন্তোষ অনুযায়ী একজন সিনিয়র উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন, যা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার দায়িত্ব পালন করবে। এ উপদেষ্টারা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না এবং নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সংবিধানের ৫৬ (৩) ও ৫৫ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকার গঠিত হবার সাথে সাথে এ উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। (৩) এ উপদেষ্টা পরিষদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দু'টি ক. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা এবং খ. শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।[১৪] জামায়াতের সংসদীয় দলনেতা মতিউর রহমান নিজামী এ নোটিশ প্রদান করেন।

আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলাসহ যে বিল জমা দেয়[১৫], তাতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৪ উপঅনুচ্ছেদ পরিবর্তন এবং ৪-এর পরে ৩টি উপঅনুচ্ছেদ সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদের ৩ উপঅনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করার কথা বলা হয়। ৫৬ অনুচ্ছেদের ৪ দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হবে 'সংসদ ভাঙ্গিয়া গেলে অথবা সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের

---

[১৪] সূত্র জামায়াত উপস্থাপিত সংবিধান সংশোধন বিল, ১৯৯৩।

[১৫] দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১০ নভেম্বর, ১৯৯৩।

www.pathagar.com

(৩) দফার বিধান কার্যকর হইলে অথবা সংসদ সদস্যদের অব্যবহিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে সরকার পরিচালনা এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আহবান জানাইবেন'। ৫৬ অনুচ্ছেদে নতুন ৩টি দফায় থাকবে: ক. প্রেসিডেন্টের আহবানের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যথাসম্ভব ছোট আকারে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। খ. নির্বাচিত নতুন সরকার শপথ নেয়ার পর মুহূর্তেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের দায়িত্ব প্রদান করবেন। গ. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্বটি প্রধান বিচারপতি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পালন করবেন এবং এ দায়িত্ব পালন শেষে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনে কোনো অন্তরায় থাকবে না। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ সংবিধান সংশোধনীর নোটিশটি ২৮ অক্টোবর ১৯৯৩ প্রদান করেন সাংসদ এম আবদুর রহিম (দিনাজপুর-৩)।[১৬] আওয়ামী লীগের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ১২০ দিনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের অভিমত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও স্পীকার তাদের স্বপদে পরবর্তী সরকার গঠন পর্যন্ত বহাল থাকবেন। স্থানীয় সরকার ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারগুলোর নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব করা হয়।[১৭] তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে বলে অভিমত দেয়া হয়।[১৮]

জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে সংসদীয় দলের হুইপ মনিরুল হক চৌধুরী সংবিধান সংশোধনীর নোটিশ দেন ১৪ নভেম্বর ১৯৯৩।[১৯] জাতীয় পার্টির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলাটি জামায়াতের অনুরূপ। তবে জামায়াতের উপদেষ্টা পরিষদের বদলে জাতীয় পার্টি মন্ত্রিসভা-র কথা বলেছে।

যেমনটি আগেও বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৯৩-র শেষাংশে উপস্থাপন করলেও এ ইস্যুতে দলগুলো সোচ্চার অবস্থান নেয় ২০ মার্চ ১৯৯৪ অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের পর থেকে। এ সময়ে সরকারী দলের মুখপাত্রগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক এবং অকল্যাণকর দিকসমূহের বর্ণনা-ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। বিপরীতে বিরোধী

---

১৬ *দৈনিক ইত্তেফাক*, প্রাগুক্ত।

১৭ *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ২ জুন ১৯৯৪।

১৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩ জুন ১৯৯৪।

১৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩।

www.pathagar.com

দলীয় নেতৃবৃন্দ সে সব বক্তব্য খণ্ডন করে সাংবিধানিক ভিত্তিসমৃদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী কয়েক মেয়াদের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতার কথা উপস্থাপন করেন।

জাতীয় সংসদের সদস্য নন, দেশের এমন শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-সাধারণ নাগরিকজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ অভিমতও, স্বভাবতই, মিশ্র। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তির বিষয়ে যেমন একটি অংশের অভিমত রয়েছে, তেমনি জনমত আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে। ডেভলপমেন্ট রিসার্চ পার্টনার্স নামের একটি গবেষণা ও বিপণন বিশ্লেষণী সংস্থার পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরীপে প্রায় ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন চায় বলে দাবী করা হয়েছে।[২০] একটি মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের স্থান গ্রহণ করবে, এ ধারণার সাথে সুস্পষ্ট দ্বিমত পোষণ করে দেশের বেশ ক'জন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সাময়িকী বা দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, কেউ কেউ নিজেরা কলম ধরেছেন।[২১] একজন বুদ্ধিজীবী-আইনবেত্তা অভিমত দিয়েছেন, 'ক্ষমতাসীনরা যাহাতে নির্বাচন প্রভাবিত করিতে না পারে সে জন্য অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যাহা আমার নিকট বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তব মনে হইতেছে তাহা হইল, এমন একটি সমঝোতায় আসা যাহাতে নির্বাচনের সময় মন্ত্রিসভা থাকিবে না। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের সাহায্য ছাড়া সরকারের দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাইবেন। উহার জন্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে না। মন্ত্রীদের ইস্তফা দিতে বলিলেই চলিবে।[২২] কেউ কেউ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে অতদূর অগ্রসর হবার পূর্বে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হবার পক্ষপাতী, তা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে ভোটার জনগণের একটি আনুষ্ঠানিক অভিমত। তাদের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক আয়োজন কতোটা ভালো বা মন্দ, এর সুবিধার কী কী দিক আছে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মন্দ দিক কোন্‌গুলো আর কিভাবে সে সব সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব-এ বিষয়গুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণের পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট করে প্রতিভাত হওয়া উচিৎ যে, যে দাবীটি প্রায় সবগুলো বিরোধী দল মিলে উপস্থাপন করছে, তা কি

---

[২০] *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৯ মে ১৯৯৪।

[২১] ক. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯৪।
খ. সাপ্তাহিক *রোববার*, ঢাকা, ৮ মে ১৯৯৪।
গ. *দৈনিক দিনকালের* মে মাসের কয়েকটি সংখ্যা।

[২২] মইনুল হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯৪।

www.pathagar.com

প্রকৃতই জাতীয় দাবী? অর্থাৎ এ দাবীর পক্ষে কি ভোটার-জনগণের অধিকাংশের সমর্থন আছে? এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানার জন্য একটি গণভোটের আয়োজন করা দরকার।[২৩] এ গণভোটের দাবীটি বিরোধীদলের উত্থাপন করা উচিৎ, ক্ষমতাসীন দলেরও মান্য করা উচিৎ। গণভোটের ফল থেকে যদি প্রতীয়মান হয়, জনগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তিকে সমর্থন করে, তাহলেই কেবল বিবেচনা করা উচিৎ কতোটা যথাযথ ফর্মুলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করা যায়। এবং সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর আপত্তি তোলার সুযোগ নেই। কারণ গণতন্ত্র মানেই সংশ্লিষ্ট জনগণের সরকার ও শাসন। জনগণ যেভাবে চাইবে সেভাবেই রাষ্ট্র-সরকার-প্রশাসন পরিচালিত হবে। আর যদি গণভোটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিকূলে জনমত প্রতিফলিত হয়, তাহলে এ বিষয়ে বিরোধী দলের দাবী তোলার বা রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না। এ গণভোট আয়োজনে রাষ্ট্রের কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে বটে, কিন্তু তাতে দেশ ও জাতি একটি রাজনৈতিক সংকট থেকে রেহাই পাবে। তা'ছাড়া একেক দিনের হরতালের কারণে দেশব্যাপী শতকোটি টাকার লোকসান হয়। তা থেকেও দেশ-জাতি রেহাই পাবে। গণভোটের এ ধারণাটি ক্ষমতাসীন সরকারের একজন সদস্যও এক সাক্ষাৎকারে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলছেন: 'দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক এ সংসদীয় গণতন্ত্র দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবিত হইয়াছে সত্যি, কিন্তু গণভোটের মাধ্যমে এ সংশোধনী আইনে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুহূর্তের জন্যও এ নির্বাচিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে রহিত করিয়া অগণতান্ত্রিক, অনির্বাচিত, অসংসদীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা, কোন গণভোট ছাড়া, বৈধ হইতে পারে না। সংবিধানের কোন সংশোধনীই সংবিধানের এ মূল ধারার পরিবর্তনকে বৈধতা দিতে পারে না। ... একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থাই জাতির প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অধীন নিরপেক্ষ, স্বাধীন নির্বাচনই যথেষ্ট হইবে, না অনির্বাচিত, অস্থায়ী, অগণতান্ত্রিক, অজবাবদিহিমূলক দুর্বল সরকারের অধীন একটি নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট হইবে এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র জনগণই দিতে পারে গণভোটের মাধ্যমে।[২৪] বোঝা যাচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি বিধি সম্মত

---

২৩ তারেক ফজল , *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ঢাকা, বর্ষ-৭, সংখ্যা-২১, ২ মে ১৯৯৪ ও *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ৫ মে ১৯৯৪।

২৪ ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, 'প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে' (সাক্ষাৎকার), *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ মে ১৯৯৪।

www.pathagar.com

করতে হলে, আগে হোক-পরে হোক, জনগণের কাছে যেতেই হবে, গণভোটের আয়োজন করতেই হবে।

এ পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে এর বিপক্ষের ব্যক্তি-দল-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে সব সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, তার কয়েকটি প্রধান দিকে উদ্ধৃত করা হবে। এ সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান হিসেবে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা-ও তুলে ধরা হবে। সরকারী দলের অন্যতম মুখপাত্র তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন:

১. কে গঠন করবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, কাদের নিয়ে। এ বিষয়ে কি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যাবে?[২৫]

২. সংসদের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। উপ-নির্বাচন পরিচালনা করবে কোন্ সরকার? যদি উপনির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করতে হয়, তাহলে তারা কতোবার সরকার গঠন করবেন? এবং তা-কি সম্ভব হবে? আর উপনির্বাচন যদি নির্বাচিত দলীয় সরকারের অধীনে হয়, তাহলে দুই প্রকারের সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মর্যাদার প্রশ্নটি কিভাবে মীমাংসিত হবে?[২৬]

৩. ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে- এ কথা মেনে নেয়া হলে চারটি সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের অবস্থান কী দাঁড়াবে? চার সিটি এলাকায় তারাও প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এ পর্যায়ে তারাও পদত্যাগ করবেন?[২৭]

এ প্রশ্নগুলোর সাথে আরো কিছু সংকটের প্রসঙ্গ আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্তিত্বকে ঘিরে। একজন ভাষ্যকার এমন কিছু সংকটের কথা বলেছেন:

১. 'যাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক করা হবে তাদের যে কেউ যদি যথাযথ সহযোগিতা না করেন, তাহলে তার (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের) কার্যকরিতা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে বাধ্য। অসহযোগী শক্তিকে কাবু করার জন্য প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা নিতে যাবার সাথে সাথে তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে'।

২. 'আর প্রধান বিচারপতি যদি কেয়ার টেকার সরকারের প্রধান হবার লিখিত বিধান থাকে, তাহলে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ বিষয়েও কথা উঠবে। বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে তো কথা উঠেছেই'।

---

[২৫] ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, পূর্বোক্ত।

[২৬] *দ্য ডেইলী স্টার*, ঢাকা, ১৯ মে ১৯৯৪।

[২৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ মে ১৯৯৪।

www.pathagar.com

এরপর এ ভাষ্যকার বলছেন, 'নিরপেক্ষতার অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে নিরপেক্ষতার মাহাত্ম্য সংরক্ষণে নির্বোধ নির্লিপ্ততায় সব কিছুকে পার করতে সচেষ্ট তাহলে সে নিরপেক্ষতা নিঃসীম নৈরাজ্যের নিয়ামক হয়ে উঠা বিচিত্র নয়'।[২৮]

প্রাসঙ্গিক আরো একটি প্রশ্ন এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। একজন বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন তুলেছেন: 'ভোট ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য সব ব্যবস্থা না হয় নেওয়া হইল, কিন্তু নির্বাচন বা রাজনীতি কি ডাকাতদের হইতে রক্ষা পাইবে? কয়েক কোটি টাকা খরচ করিতে পারিলে কাহারও পক্ষে নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাইতে অসুবিধা হয় না। নির্বাচনে জিতিতেও অসুবিধা হয় না'।[২৯]

ক্ষমতাসীন দল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণার বিরোধী পক্ষের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আওয়ামী লীগের অন্যতম মুখপাত্র এবং সংসদে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম। তিনি বলেছেন, 'আমরা কখনোই দাবী করিনি যে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নির্বাচিত সরকারের বিকল্প। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এই বিএনপি সরকারের মেয়াদ ১৯৯৬-র ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।[৩০] যদিও ইতঃপূর্বে ৩ মে ১৯৯৪ আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের বলেছেন, নির্বাচন এ বৎসরে হলেই ভালো হয়।[৩১] আর দলটির পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে অবিলম্বে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে।[৩২] মোহাম্মদ নাসিম দাবী করেন কেয়ারটেকার সরকারের দাবী এখন জাতীয় দাবী। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে পাহাড়সমান মতভিন্নতা থাকলেও এ প্রশ্নে সবাই একমত। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিমান করার জন্য আমরা সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে এসেছি। এখন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য আমরা দাবী করি, পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হোক। স্থানীয় সরকারসমূহের নির্বাচন এবং উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ক জটিলতার প্রশ্নে তিনি বলেন, এগুলো

---

২৮ সাজ্জাদ পারভেজ, 'তত্ত্বাবধায়ক বা কেয়ারটেকার সরকার, যে সব বিষয় ভাবতে হবে', *সাপ্তাহিক বিক্রম*, বর্ষ-৭, সংখ্যা-২১, ঢাকা, ২ মে ১৯৯৪।

২৯ মইনুল হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯৪।

৩০ মোহাম্মদ নাসিম, দ্য ডেইলী স্টার পাবলিক ভিবেট (সাক্ষাৎকার), দ্য ডেইলী *স্টার*, ঢাকা, ১৬ মে ১৯৯৪।

৩১ ৪ মে ১৯৯৪-র ঢাকার সকল *দৈনিক*।

৩২ ৩ জুন ১৯৯৪-র ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন *দৈনিক*।

www.pathagar.com

নেহায়েতই কিছু ছোট প্রশ্ন, যা সহজেই আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা যাবে। আমরা জাতীয় নির্বাচন প্রশ্নে কথা বলছি, যা নির্ধারণ করে কে দেশ শাসন করবে। নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকারের নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে। এগুলো সরকারের কোনো পরিবর্তন আনে না। আমরাও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চাই। তিনি বলেন, অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কিছু বিষয় বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যেমন-পর্যাপ্ত কর্তৃত্বসহ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন এবং খাঁটি অর্থে একটি নিরপেক্ষ সরকার।[৩৩]

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ নম্বর ধারায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে। প্রেসিডেন্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের ৫ বৎসরের জন্য নিয়োগ দেবেন। এ সময়ের জন্য তাদেরকে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কিংবা সরকার ইচ্ছামতো সরাতে পারবেন না। সংবিধানের ৯৬ ধারায় প্রেসিডেন্ট অথবা নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণের বিধান দেয়া আছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং আরো দু'জন সিনিয়র বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেসিডেন্ট, প্রধান নির্বাচন কমিশনার অথবা নির্বাচন কমিশনারদের কোনো অসদাচরণ প্রমাণিত ও স্বীকৃত হলে এবং উক্ত কাউন্সিল সুপারিশ করলেই কেবল তাদের অপসারণ করা যায়। সুতরাং তাদের পদের নিশ্চয়তা রয়েছে দাবী করা যায়। এ ছাড়া নির্বাচন পরিচালনার জন্য সরকারী প্রশাসন থেকে নির্বাচন কমিশন পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল, যান বাহন সংগ্রহ করতে পারে।[৩৪] যে কোনো নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে অথবা পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় শাস্তি দিতে পারে।[৩৫] নির্বাচন পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগ দায়ের করা হলে তার মীমাংসার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে।[৩৬]

---

৩৩ মোহাম্মদ নাসিম, সাক্ষাৎকার, দি ডেইলী *স্টার*, ঢাকা, ১৬ মে ১৯৯৪।

৩৪ দি রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার ১৯৭২ এবং পি ও নং ৮, ১৯৭৩, ধারা ৫ ও ৬।

৩৫ *পূর্বোক্ত*, অধ্যায়-৬।

৩৬ *পূর্বোক্ত*, ধারা- ৫৩।

www.pathagar.com

সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের এ সব আয়োজনের কারণে অনেকেই নির্বাচন কমিশনকে একটি পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট।[৩৭] প্রকৃত অর্থে বাস্তবতাটি এমন সরল নয়। ব্যক্তি হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণ এবং তাদের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষসমূহ ছাড়া পুরো নির্বাচন কমিশন এবং এর পুরো জনশক্তি সরকার প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রীর আওতাধীন। নির্বাচন কমিশনের সব জনশক্তির অবস্থান-বদলী প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আওতায়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন: 'নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ৪৮(৩), ৫৫(৬), ১১৯, ১২০, ও ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর সমন্বিত প্রয়োগের আলোকে এর ওপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালন করে, সুতরাং রাষ্ট্রের নির্বাহী সরকারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।[৩৮] এটি হলো একটি দিক। দ্বিতীয় হলো, রাষ্ট্রের নির্বাহী সরকারের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় অথবা কাঙ্ক্ষিত জনশক্তি ও অর্থবরাদ্দ না পাবার সংকটে থাকে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনার আয়োজন করতে অপারগ। তৃতীয়ত, বিদ্যমান নির্বাচনী বিধানগুলো এমনভাবে প্রণীত, যাতে নির্বাচন কমিশন চাইলেই একটি এলাকার নির্বাচনকে শতভাগ সুষ্ঠু করার ক্ষমতা রাখে না। নির্বাচনে ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট তালিকা তৈরী এবং ব্যালট প্যাকেটের সীল-গালার কাজগুলো সম্পন্ন করেন একজন প্রিজাইডিং অফিসার। স্থানীয় পর্যায়ের একজন 'ছোট অফিসার' এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বিভিন্ন মাত্রার চাপ, ভয় ও লোভের দ্বারা এ প্রিজাইডিং অফিসারকে বশে নেয়া খুব কঠিন কাজ নয়। এবং এটি করা গেলেই নির্বাচনী ফল পাল্টে দেয়া সম্ভব। কারণ এ প্রিজাইডিং অফিসারের উপস্থাপিত ভোটের তালিকাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়, যদি না সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়। প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রদত্ত তালিকার যোগফলের কাজটি করেন রিটার্নিং অফিসার এবং তিনি স্থানীয় পর্যায়ে ফলাফলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। তার ঘোষণাই সরকারী ঘোষণা বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচন কমিশন কেবল সে ঘোষণাকে সরকারী গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[৩৯] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রার্থীদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ না পেলে নির্বাচন কমিশন এ পুরো নির্বাচনী

---

[৩৭] ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ মে ১৯৯৪।

[৩৮] *সিএসি বার্তা*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-৩।

[৩৯] দি রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার ১৯৭২ এবং পি ও নং-৮, ১৯৭৩, ধারা ৩৬ থেকে ৩৯।

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ার মধ্যে ভিন্ন কোনো ভূমিকা নেয়ার অধিকার রাখে না। একটি নমুনা দেয়া যাক: 'বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে শতকরা ৯৬%, ৯৭%, ৯৮% ভাগ ভোট কাস্ট হয়েছিল বলে পরিলক্ষিত হলে ভোট সংখ্যার অস্বাভাবিক আধিক্য দেখে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ সব কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সে আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কমিশনের আদেশ বাতিল করে দেন। আপীল বিভাগ এই মর্মে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, আইনত সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণ করে কমিশন কর্তৃক গঠিত ইলেকশন ট্রাইব্যুনালের পক্ষেই এরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হইবে। আপিল বিভাগের এরূপ আইনের ব্যাখ্যা সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনসহ রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষই মানতে বাধ্য'।[৪০] এমতাবস্থায় নির্বাচন কমিশনকে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় থাকার কোনো বিকল্প নেই। এ পর্যায়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা ও নিশ্চিত করার প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করা দরকার এবং সে সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

মাগুরা-২ উপনির্বাচন প্রসঙ্গ

গত ২০ মার্চ ১৯৯৪ নির্বাচনী এলাকা ৯২ মাগুরা-২ আসনে জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের পর এর ফলাফলকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এখানে মাগুরা-২ উপনির্বাচন প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হবে।

প্রথমতঃ মাগুরা-২ নির্বাচনী এলাকার কিছু ভোটকেন্দ্রের ফল দেখে এবং বিভিন্ন তথ্য-প্রতিবেদন থেকে বাহ্যত ভোট কারচুপি, যে কোনো মাত্রায়ই হোক, হয়েছে বলে ধারণা হয়। দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী লীগসহ পরাজিত ও বিক্ষুব্ধ রাজনৈতির দলগুলো প্রচলিত নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী কথিত নির্বাচনী কারচুপি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেনি, যার বিধান নির্বাচনী বিধিতে নির্দিষ্টভাবে [৪১] রয়েছে এবং যার আলোকে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয়

---

৪০ *সিএসি বার্তা*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-৩।

৪১ দি রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার ১৯৭২ এবং পি ও নং-৮, ১৯৭৩, ধারা ৪৯ থেকে ৭২।

www.pathagar.com

ব্যবস্থা নিতে পারতো। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি 'বিলম্বিত অভিযোগ' দায়ের করা হলেও পরে নির্বাচন কমিশন থেকে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো বিদ্যমান নির্বাচনী বিধি অনুসরণ না করে মাগুরা উপনির্বাচনের ফলকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এ ফল বাতিলের জন্য সরকারের নিকট দাবী তুলেছে, দাবী আদায়ের জন্য মিটিং, মিছিল, ভাংচুর এবং একাধিক হরতাল করেছে। এবং স্পষ্টত এরই রেশ ধরে বিরোধী দলগুলো তাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী নিয়ে একটি রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে এবং নির্বাচিত সরকারের পদত্যাগ দাবী করেছে। কোনো গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের আচরণ এমন হবার সুযোগ কম। কারণ সংবিধানের ১২৫(খ) ধারায়ও কেবল নির্বাচনী দরখাস্তের মাধ্যমেই সংসদের কোনো নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায় বলে বিধান রয়েছে। তৃতীয়তঃ মাগুরা-২ উপনির্বাচনের যে সব ভোটকেন্দ্রকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তার সংখ্যা মোট ২৫। এ নির্বাচনে মোট ভোটকেন্দ্র ছিলো ১০২টি। এর মধ্যে ৩টি ভোটকেন্দ্রের ভোট স্থগিত ঘোষণা করা হয়। বাকী ৯৯টি কেন্দ্রে বিএনপি-র প্রার্থী ৭৩২৪৮ এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৩৯৬২৫ ভোট পান। অভিযুক্ত ২৫টি কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থী ২৭৮৩৮ এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৭,৯৩২টি ভোট পান। অভিযুক্ত এ ২৫টি ভোটকেন্দ্রের সকল ভোট বাদ দিলে বিএনপি প্রার্থী পান ৪৫,৪১০ ভোট এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী পান ৩১,৬৮৮ ভোট। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিএনপি প্রার্থীর চাইতে ১৩,৭৭২ ভোট পিছিয়ে থাকেন।[৪২] সুতরাং এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলার সুযোগ আছে, বিদ্যমান রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থাকে মান্য করলে এবং নিয়মতান্ত্রিকতায় আস্থা থাকলে মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলকে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের 'প্রাথমিক বিন্দু' নির্ধারণ করা চলে না।

সমাপনী পর্যবেক্ষণ

এ পর্যায়ে আমরা কয়েকটি মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করতে চাই:

এক. বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদের সমীক্ষিত 'আচরণ'কে, প্রচলিত বিশ্বের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতি ও মূল্যবোধের আলোকে, কাঙ্ক্ষিত বলার সুযোগ

---

৪২ নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলের আলোকে লেখকের প্রণীত পরিসংখ্যান।

www.pathagar.com

কম। সংসদীয় আচরণকে 'ট্রেড ইউনিয়নের আচরণে পর্যবসিত করা উচিৎ নয়', একজন সমাজচিন্তক যেমনটি অভিযোগ করেছেন।[৪৩]

দুই. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুকূল বা প্রতিকূল দিক নিয়ে বিতর্ক অথবা রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি/অব্যাহত রাখার পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক জনমত তথা গণভোট গ্রহণ করা দরকার। কারণ অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণভোটের আয়োজন করা সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক।

তিন. সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে সাংবিধানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নির্বাচনী বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ ভোটারদের জন্য পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

চার. বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে মাগুরা-২ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট সমর্থনযোগ্য নয়।

---

৪৩ 'শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার অধিকার আইনেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিরোধী দলের দাবি-দাওয়ার জন্য ধর্মঘট করিবার অর্থাৎ পার্লামেন্টের কার্যক্রম বর্জন করিবার অধিকার কোন গণতান্ত্রিক দেশে নাই, থাকিতে পারে না'। মইনুল হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯৪।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়*

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের 'বিতর্কিত' ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ২৬ মার্চ ১৯৯৬ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাশ করে। এ বিলটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিল হিসেবেই বেশি পরিচিত। জাতীয় নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ সাংবিধানিক আয়োজন বাংলাদেশই প্রথম করেছে। জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, অস্থায়ী সরকার অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'সমঝোতামূলক আয়োজন' গণতন্ত্র চর্চাকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইতোমধ্যে দেখা গেছে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে একটি 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক' সরকার গঠিত হয়েছিলো। সে সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন নজির সৃষ্টি হয় এবং একটি নতুন ধারণা যুক্ত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতেও এটি এক নতুন সংযোজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সম্পর্কে সাধারণভাবে শিক্ষিতজনের মাঝে এবং বিশেষভাবে চিন্তাশীল মহলে প্রচুর আগ্রহ লক্ষণীয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বাংলাদেশসহ আরও ক'টি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, ত্রয়োদশ সংশোধনীকে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদানের জন্য গণভোটের বাধ্যবাধকতা, এ বিষয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিকদের প্রতিক্রিয়া, বাংলাদেশের দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি তুলনামূলক আলোচনা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে।

---

* এ অধ্যায়টি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-আইবিএস আয়োজিত একই শিরোনামের একটি সেমিনারে প্রবন্ধ আকারে উপস্থাপিত হয়। এ সেমিনারে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম. ইউসুফ আলী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে আলোচকদের মধ্যে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও স্থানীয় এমপি এডভোকেট কবীর হোসেন, প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (পরবর্তীতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর) প্রমুখ। একই শিরোনামের একটি সেমিনার 'মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের' উদ্যোগে ঢাকার মেট্রোপল্টিন হোটেলে আয়োজিত হয়। সেমিনারটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ ও আলোচনায় অংশ নেন ড. এরশাদুল বারী (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি), প্রফেসর হাসানুজ্জামান চৌধুরী (পিএসসি-র সাবেক সদস্য) প্রমুখ। এ বিষয়ক মিডিয়া রিপোর্ট পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার: তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামো

গণতন্ত্র চর্চাকারী দেশসমূহে 'নির্বাচনকালীন সরকার' হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি বেশ পুরোনো। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি ইংল্যান্ডে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় তৎকালীন পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী Winston Churchill-এর নেতৃত্বে, ১৯৪৫ সালের ২৩ মে।[১] উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী Chamberlein-এর স্থলে Churchill-কে প্রধানমন্ত্রী করা হয়।[২] উদ্দেশ্য, যে কোনো মূল্যে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ। এঁরা দু'জনই ছিলেন রক্ষণশীল দলের নেতা। চলমান যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ইংল্যান্ডের তিনটি প্রধান দলই নির্বাচনের বদলে একটি 'জাতীয় সরকার' চাচ্ছিলো। Churchill সর্বদলীয় একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। এ জন্য এ সরকারটি একটি জাতীয় সরকার হিসেবেও গণ্য। Churchill-এর নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ও মিত্রশক্তি যুদ্ধে ব্যাপকভাবে জয়ী হয়। যুদ্ধ জয়ের পর চার্চিল তাঁর 'বিজয়ীর' সুনাম কাজে লাগিয়ে পরবর্তী নির্বাচনে 'সুবিধা' নিতে পারেন—এমন কথা আলোচিত হতে থাকে। Churchill-এর জীবনীকার Henry Polling-এর ভাষ্যে অবস্থাটি ছিলো এমন: "Liberal and Labour MPs were afraid that he would capitalize upon his reputation as the war winner to have a 'Khaki' election; and to allay their fears, he spoke of a period of two or three months after the end of the war in Europe, in the course of which suitable preparations could be made. This would allow time for the Liberal and Labour parties to withdraw from the Government and for a 'Caretaker' administration to be constituted by the Conservatives, who had been since 1935 the largest party in the chamber."[৩] এ অবস্থায় Churchill সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের প্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন ১৯৪৫ সালের ২৩ মে। সাথে সাথেই রাজা তাকে একটি নতুন সরকার গঠনের আহ্বান জানান। Henry Polling-এর ভাষায়: "Churchill's new 'Caretaker' government consisted of Conservatives, National Liberals and a few non-party or National ministers who were prepared to continue in service."[৪] দেখা যাচ্ছে, Churchill-এর 'জাতীয় সরকারে' থাকলেও তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারে শ্রমিক দল অংশীদার হয়নি। ১৯৪৫

---

১ হেনরি পোলিং, *Winston Churchill* পৃ. ৫৪৮। দেখুন, মিজানুর রহমান খান, *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৮।

২ উইলিয়াম ডগলাস হোম, *The Prime Minister*, দেখুন, মিজানুর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।

৩ পোলিং, পৃ. ৫৪৮। দেখুন, মিজানুর রহমান খান, পৃ. ১৫৮।

৪ পোলিং, পৃ. ৫৪৮। দেখুন, মিজানুর রহমান খান, পৃ. ১৫৮।

www.pathagar.com

সালের ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন Churchill-এর রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং Climent Richard Atley-র নেতৃত্বে শ্রমিক দল ব্যাপক বিজয় অর্জন করে ও সরকার গঠন করে। এর আগে ১৯৩১ সালে Ramzey Donald-এর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাজ করেছিলো।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের প্রয়োজন পড়ে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে। এর আগে, ১৯৭৯ সালের ৯ জুলাই ভারতীয় প্রেসিডেন্ট Sanjeeb N Reddi 'লোকসভার' অধিবেশন ডাকেন। লোকসভার আস্থাভোটের মুখোমুখি না হয়েই জনতা দলের প্রধানমন্ত্রী Morarji Desai ও তার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট Reddi এ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন ও 'একটি নতুন সরকার গঠন করা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার' জন্য Desai-কে অনুরোধ করেন। এরপর জনতা দলের সংসদীয় নেতার বদল হয়। Desaiর বদলে আসেন Jagjiban Ram। প্রেসিডেন্ট Reddi পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্য জনতা দলের নতুন নেতা Jagjiban Ram, বিরোধী দলীয় নেতা Y B Cheban ও সংসদে সংখ্যালঘু নেতা Chowdhury Charan Singh-এর সাথে আলোচনা করেন। Y B Cheban সরকার গঠনে অপারগতা জানান। Jagjiban Ram ও Chowdhury Charan Singh সরকার গঠনে রাজি হলেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট Reddi সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এ অবস্থায় তিনি সংসদীয় দলগুলোর কাছে তাদের দলীয় ও সমর্থক সাংসদদের তালিকা চেয়ে পাঠান। প্রাপ্ত তালিকা থেকে প্রেসিডেন্টের মনে হলো Chowdhury Charan Singh লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন। প্রেসিডেন্ট Charan Singhকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান ও 'সম্ভাব্য নিকটতম সুযোগে' তথা আগস্টের (১৯৭৯) তৃতীয় সপ্তাহে তাকে লোকসভার আস্থাভোটের মুখোমুখি হবার পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী Charan Singh লোকসভায় আস্থাভোটের মোকাবেলা না করেই ১৯৭৯ সালের ২০ আগস্ট তার মন্ত্রিসভাসহ পদত্যাগ করেন ও লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং ২০ আগস্ট তারিখেই এক পত্রে 'অন্য কোনো আয়োজন সম্পন্ন করা পর্যন্ত Charan Singhকে তার মন্ত্রিসভাসহ দায়িত্ব পালন করে যাবার অনুরোধ করেন। প্রেসিডেন্ট Reddiর এ সিদ্ধান্ত Charan Singh-এর সরকারকে একটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে' পরিণত করে। উল্লেখ্য, সে সময় দলীয় সদস্যের হিসেবে ৫৪৪ আসনের লোকসভায় জনতা দলের

www.pathagar.com

ছিলো ২০৫ ও Charan Singh-এর ছিলো ৭৫ জন সদস্য। ভারতীয় প্রেসিডেন্টের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সে সময় মাদ্রাজ, কলকাতা ও দিল্লির হাইকোর্টে রিট মামলা হয়। ৩টি কোর্টই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে Charan Singh-এর নিয়োগকে বৈধ বলে রায় দেয়। যদিও কলকাতা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি Durgadas Basuর মতো কোনো কোনো ভারতীয় সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞ পরবর্তীকালে কোর্টের এ রায়ের সমালোচনা করেছেন।[৫]

উপমহাদেশের অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তানেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চর্চা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানের আওতায় অনির্বাচিত ব্যক্তিসমন্বয়ে মন্ত্রিসভা ও উপদেষ্টা পরিষদ উভয়ই গঠনের সুযোগ আছে (অনুচ্ছেদ-৯১)[৭]। ৪৮(৫) সংখ্যক অনুচ্ছেদে পাকিস্তান সংবিধান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের অধিকার দিয়েছে প্রেসিডেন্টকে। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ৩৭(৯) অনুচ্ছেদে পদত্যাগী মন্ত্রিসভাকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে' পরিণত করার বিধান ছিলো। ১৯৭৩ সালের নতুন সংবিধানে সোজাসুজি 'Care-taker Cabinet' কথাটি যুক্ত হয়। ১৯৮৮ সালে জেনারেল Ziaul Huq নিহত হবার পর পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে Moeen Qureshiর নেতৃত্বে তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু স্বভাবতই সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধান একই ব্যক্তি, সেখানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে নির্বাচনে যাতে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সুবিধা ও প্রভাব ব্যবহৃত হতে না পারে, সে জন্য পর্যাপ্ত আয়োজন রয়েছে, যা দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জুরিসডিকশন ও সংজ্ঞা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জুরিসডিকশন তথা ক্ষমতার পরিধি কতোটুকু হবে, এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান থাকলেও এ সরকারের কর্মপরিধি সম্পর্কে কোনো সীমাবদ্ধতার নির্দেশ নেই। তাই সেখানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকারের মতোই কার্যক্রম চালাতে পারে।

---

৫ Durgadas Basu. *Commentary on the Constitution of India*, Vol. E, 1981, PP. 411-14.

www.pathagar.com

অন্যদিকে, ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট এক রায়ে কেবলমাত্র 'দৈনন্দিন প্রশাসন' পরিচালনার শর্ত আরোপ করে। ১৯৭৯ সালের ২৩ আগস্ট ভারতীয় স্টেটসম্যান পত্রিকার এক রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট Sanjeeb Reddiকে এভাবে উদ্ধৃত করা হয় : "The (Charan Singh's) Government will not take decision during this period which set new policy or involve new spending of significant order or constitute major administrative and executive decision. However, work of an urgent nature involving the nations interest will not be held up." অর্থাৎ ভারতীয় প্রেসিডেন্ট Reddi চাচ্ছিলেন Charan Singh-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার বাইরে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা নীতি নির্ধারণে বিরত থাকুক, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল পরবর্তী মন্ত্রিসভার ওপর বর্তাবে।[৬]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকর প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা দেখি ইংল্যান্ডে, ১৯৪৫ সালে। Winston Churchill-র সে সরকারকে স্যার Ivor Jennings 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৭] কিন্তু তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো সংজ্ঞা দেননি অথবা ঐ সরকারের 'দৈনন্দিন প্রশাসন', 'নীতিগত বিষয়াদি' প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো বক্তব্য রাখেননি। Keith মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তও নিতে পারে।[৮] কলকাতা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি ও সংবিধান-বিশেষজ্ঞ Durgadas Basuও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানের পক্ষে। বিচারপতি Basu প্রশ্ন রাখেন : "Would such Care-taker government be incompetent to deal with national emergencies like war, famine or pestilence which might be fall the nation in such a period of interregnum?... Supposing there is external aggression or an armed rebellion which necessitates the issue of a proclamation ... Should the ministry (like that of Mr. Charan Singh) take their hands off and plunge the country into disaster?"[৯]

---

৬ Madan Murari v. Chowdhury Charan Singh, AIR 1980 CAL 95 (Para 20), দেখুন, মিজানুর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

৭ Ivor Jennings, *Cabinet Government*, 3rd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1969. P-84.

৮ Keith. *British Cabinet System*, 1952, P. 55, দেখুন, মিজানুর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

৯ দুর্গাদাস বসু, *প্রাগুক্ত*।

www.pathagar.com

বিচারপতি Durgadas Basu নির্দিষ্ট করেই দাবি করেন : "ভারতীয় সংবিধানের অধীনে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বলে কিছু নেই।"[১০] অন্যদিকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ৭ সদস্যের ফুল বেঞ্চ Chowdhury Charan Singh-এর সরকারসংক্রান্ত ২টি রিট মামলার রায়ে (১০ অক্টোবর ১৯৭৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংজ্ঞা প্রদান করে: "Though the constitution itself does not refer to a 'Caretaker Government' is yet it is possible to understand the expression, 'Caretaker Government' as the Government in power after dissolution of the 'Lok Sabha' and before its reconstitution."[১১]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি প্রথম উচ্চারিত হয় একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, এ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে *বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের*, পক্ষ থেকে।[১২] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ দাবি ওঠে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে নেয়ার একটি অহিংস ও সম্মানজনক বিকল্প হিসেবে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৮৩-র ২০ নভেম্বর ঢাকায় এক সমাবেশে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য 'কেয়ারটেকার সরকারের' প্রস্তাব ও দাবি উত্থাপন করে এবং এ জন্য একটি ফর্মুলা উপস্থাপন করে।[১৩]

প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন বিরোধী দল ও জোটসমূহের প্রস্তাবিত 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' জন্য ঘোষিত 'রূপরেখা' গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনীতিকদের নির্দেশনামতো (তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের পদত্যাগ, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগদান এবং অতঃপর জেনারেল এরশাদ নিজে পতদ্যাগ করে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ প্রদান) জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক' সরকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য বাংলাদেশের

---

[১০] বসু, *প্রাগুক্ত*।

[১১] মাদ্রাজ হাইকোর্ট, রিট নং ৩৬৭১ ও ৩৭৪২, ১৯৭৯।

[১২] *সাপ্তাহিক রোববার*, ঢাকা, ৮ মে ১৯৯৪, পৃ. ১৩।

[১৩] ২১ নভেম্বরের (১৯৯৪) সব জাতীয় *দৈনিক* দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১-র ৬ আগস্ট বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মাধ্যমে দেশে ১৬ বৎসর পর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এ সময় জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকারের সাংবিধানিক আয়োজন দ্বাদশ সংশোধনীতে যুক্ত করার দাবি তোলে। দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে একই দাবি করেছিলেন।[১৪] এ দাবি তখন প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও ক্ষমতাসীন বিএনপি ভেবে দেখতে সম্মত হয়নি।

এরপর, ১৯৯৩ সালে, তিন প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসহ পৃথক তিনটি বিল জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে জমা দেয়। সরকারি দলের অনীহায় বিল তিনটি সংসদের আলোচ্যসূচিতে আসতে পারেনি।[১৫] ১৯৯৪-র ২০ মার্চে অনুষ্ঠিত মাগুরা উপনির্বাচনে কথিত ব্যাপক ভোটডাকাতির পর প্রধান তিন বিরোধী দল সাংবিধানিকভাবে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' বিল সংসদে উত্থাপন ও পাশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে জাতীয় সংসদের বিরোধী সাংসদগণ পদত্যাগ করেন। দীর্ঘ দু'বছর বিরোধী দলীয় তীব্র ও সহিংস আন্দোলনের ফলে মেয়াদের প্রায় শেষ পর্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ ক্ষমতাসীন দল বিএনপি-র পরামর্শে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এরপর নির্বাচিত ক্ষমতাসীন দল বিএনপি 'বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে' ২৬ মার্চ (১৯৯৬) বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করে ও ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট তাতে সম্মতি দেন।[১৬] বিএনপি এ সংশোধনীর নাম দিয়েছে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। বিরোধী দলের 'নিরপেক্ষ সরকারের' সমালোচনা করে একদা বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন 'শিশু আর পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়'। অবশ্য এ বিএনপি দল ও সরকার দীর্ঘ দু-তিন বৎসর থেকে সাংবিধানিক ভিত্তিসম্পন্ন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানতে অস্বীকার করেছিলো এবং প্রবল দাবির মুখে অবশেষে এ দলটি নিজের উদ্যোগে এবং দায়িত্বেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন করেছে ও বহুল আলোচিত 'গণভোটের' আয়োজন না করেই বিলটি পাশ করেছে।

---

[১৪] মইনুল হোসেন, 'অনেক কিছু ভুলিতে হইবে, অনেক কিছু শিখিতে হইবে', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯৪।

[১৫] সংশ্লিষ্ট ৩টি দলীয় সূত্র, দেখুন, মিজানুর রহমান খান, পরিশিষ্ট।

[১৬] ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধনীর পূর্ণপাঠ, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২৮ মার্চ ১৯৯৬।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধানমতো প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন ও ৩০ মার্চ ১৯৯৬ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস। ৩ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ১০ জন 'নির্দলীয়' ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনকেও পুনর্গঠিত করা হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৯৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম সাদেক পদত্যাগ করেন ও ৮ এপ্রিল পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোঃ আবু হেনাকে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর ১৫ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব আবিদুর রহমান ও সাবেক জেলা জজ মোস্তাক আহমেদ চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়া হয়।[১৭]

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ও নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় ১২ জুন ১৯৯৬ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সপ্তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনটিও সাধারণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তৃতীয় প্রধান দল জাতীয় পার্টির সমর্থনে সরকার গঠন করে। সাবেক ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ১১৬টি আসন (পরবর্তী উপনির্বাচনে বিএনপি ৩টি আসন হারায়) লাভ করে সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে অবস্থান নেয়।

অন্তর্বর্তীকালীন বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার

একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছ থেকে আরেকটি স্বীকৃত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যদি কোনো 'মধ্যবর্তী সময়ের' সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টি করা হয় এবং এ মধ্যবর্তী সময়ে কোনো 'সরকার' অথবা 'প্রশাসন' দায়িত্ব পালন করে তবে এ সরকার অথবা প্রশাসনকে 'অন্তর্বর্তীকালীন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-প্রশাসন স্বাভাবিক নির্বাহী দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-প্রশাসন কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেছে। নামিবিয়া, কম্বোডিয়া, হাইতি এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক নমুনা। ব্রিটিশ-ভারতে ১৯৪৬-৪৭ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব পালন করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সীমিত অর্থে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং মূল দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং কিছু ক্ষেত্রে এ সরকারকে 'নীতিগত সিদ্ধান্ত' গ্রহণে বাধা দেয়া হয়েছে। যেমন ১৯৭৯ সালের চৌধুরী চরণ সিং-এর ভারতীয়

[১৭] 'সংবাদ' ঢাকা, ৯ ও ১৬ এপ্রিল ১৯৯৬।

www.pathagar.com

সরকার। বাংলাদেশে এ বিধানটি ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে কার্যকর করা হয়েছে। পাকিস্তানে সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান থাকলেও সেখানে এ সরকার নির্বাহী দায়িত্ব পালনে সক্ষম। ১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডে উইনস্টন চার্চিলকেও কোনো দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া হয়নি। ১৯৩১ ও ১৯৪০ সালে (যথাক্রমে র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ড ও চার্চিল) ইংল্যান্ডে ও ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠিত হয়। বৃহত্তর অর্থে এগুলোও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নির্দলীয় ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি বাংলাদেশের সংযোজন, অন্য কোনো দেশে এমন কোনো শর্ত উত্থাপিত হয়নি।

ত্রয়োদশ সংশোধনী : একটি প্রাথমিক ভাষ্য

'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি যখন বিরোধী দলগুলো দাবি করছিলো, তখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এটা অনিবার্য বিবেচনা করেছিলেন যে, এ জন্য 'গণভোটের' আয়োজন করতে হবে। কারণ, বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে' রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ গঠন ও নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগের বিধান করা হয়েছিলো। ত্রয়োদশ সংশোধনীর পূর্বে সাধারণ্যে এ ধারণাটি যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিলো তার প্রমাণ হিসেবে এখানে তিনটি নমুনা উপস্থাপন করছি:

এক. সাংবাদিক-ভাষ্যকার মিজানুর রহমান খান তার গ্রন্থে লিখেছেন : "এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, দ্বাদশ সংশোধনী পাসের পর রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারো হাতে দেয়ার সুযোগ সংবিধানে রাখা হয়নি। ... প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনতে হলে ১৪২(১ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে গণভোটের আয়োজন বাধ্যতামূলক"।[১৮]

দুই. তৎকালীন বিএনপি সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ঢাকার একটি দৈনিকের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক এ সংসদীয় গণতন্ত্র দ্বাদশ সংশোধনী আইনে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুহূর্তের জন্যও এ নির্বাচিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে রহিত করিয়া অগণতান্ত্রিক, অনির্বাচিত, অসংসদীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা, কোনো গণভোট ছাড়া, বৈধ হইতে পারে না"।[১৯]

---

[১৮] মিজানুর রহমান খান, *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৫, পৃ. ৬-৭।

[১৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ মে ১৯৯৪।

www.pathagar.com

তিন. আমি নিজেও একটি নিবন্ধে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।[২০] বিরোধী দলীয় তীব্র চাপের মুখে বিএনপি সরকার-দল নিজের দায়িত্বেই যখন 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিল সংসদে উত্থাপন করে আলোচনা করছিলো, তখন ঢাকার দৈনিকগুলোয় একটি তথ্য প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, "গণভোট এড়িয়ে বিলটি পাশ করানো যায় কি-না তা নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু বৈঠকে স্থির হয় যে, কোনোভাবেই গণভোট এড়ানো সম্ভব নয়।"[২১] তবুও দেখা গেলো, ত্রয়োদশ সংশোধনী সংসদে পাশ হলো এবং গণভোট ছাড়াই দু'দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট তাতে সম্মতি দিলেন। তার অর্থ সাধারণভাবে এ দাঁড়ায় যে, ত্রয়োদশ সংশোধনীর কারণে সংবিধানের আলোচিত 'সংসদের কাছে দায়বদ্ধ ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা' তথা ৫৬ অনুচ্ছেদের কোনো পরিবর্তন সাধন করতে হয়নি। বাস্তবে কি তা-ই? ত্রয়োদশ সংশোধনীর যে পূর্ণ পাঠ আমরা বাংলাদেশ গেজেটের ২৮ মার্চ ১৯৯৬ সালের একটি অতিরিক্ত সংখ্যার মাধ্যমে পেয়েছি, তা পাঠ করে মনে হয় সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ব্যত্যয় নির্দিষ্টভাবেই ঘটানো হয়েছে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে, ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।" ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।" আর বহুল আলোচিত ৫৬(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে দ্বাদশ সংশোধনীর মূল কথাটি : "যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।"

ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে '৫৮ক' সংখ্যক একটি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করা হয় বিদ্যমান ৫৮ অনুচ্ছেদের পর, '২ক পরিচ্ছেদ' শীর্ষক ৪টি অনুচ্ছেদ (৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ, ও ৫৮ঙ) সংবলিত একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয় সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পর, ৫টি অনুচ্ছেদের (৬১, ৯৯, ১২৩, ১৪৭ ও ১৫২ অনুচ্ছেদ) কিছু প্রাসঙ্গিক সংশোধন করা হয় এবং সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে 'ফরম ১ক' ও 'ফরম ২ক' শপথ (বা ঘোষণা) সন্নিবেশিত করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সংবিধানে বর্তমানে ১২টি ভাগে {('পার্ট') ('নবম ক ভাগ' যুক্ত হয়ে)} ১৬০টি অনুচ্ছেদ {('আর্টিকেল') (মূল সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদ (+) ৮টি নতুন অনুচ্ছেদ (যেমন ২ক অনুচ্ছেদ, ৪৭ক অনুচ্ছেদ প্রভৃতি) (–) মূল সংবিধানের ১২ সংখ্যক অনুচ্ছেদ

---

[২০] দেখুন, তারেক ফজল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক : ফয়সালা জনতা থেকেই আসুক, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা ৫ মে ১৯৯৪।

[২১] *'সংবাদ'* ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৯৬।

www.pathagar.com

(ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা) ও ৩টি তফসিল (২নং তফসিল অবলুপ্ত, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সংক্রান্ত) রয়েছে। কোনো কোনো ভাগে একাধিক 'পরিচ্ছেদ' ('চ্যাপ্টার') রয়েছে। কোনো কোনো অনুচ্ছেদ একাধিক 'দফা' ('ক্লজ') ও 'উপদফা' ('সেকশন') দ্বারা বিভক্ত।

এবার ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধানগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮গ(১) অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ও পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একজন প্রধান উপদেষ্টার বিধান করা হয়েছে, ৫৮খ(৩) অনুচ্ছেদে 'সংশ্লিষ্ট মেয়াদে' উক্ত প্রধান উপদেষ্টার দ্বারা বা তাঁর কর্তৃত্বে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবার কথা বলা হয়েছে এবং ৫৮খ (২) অনুচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকার বিধান করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ সংশোধনীর এ সব বিধান কার্যকর থাকার সময় দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নির্বাহী কর্তৃত্বসম্পন্ন {৫৫(২)}, সংসদ তথা জনগণের নিকট দায়িত্বশীল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধি-সাংসদদের আস্থাভাজন {৫৬(৩) ও (৪)} প্রধানামন্ত্রীর বিধানাবলি অকার্যকর বা রহিত হয়ে যায়। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২(১ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে ৫৬ অনুচ্ছেদের (সংবিধানের প্রস্তাবনা, ৮ ও ৪৮ অনুচ্ছেদসহ) বিধানাবলির যে কোনো সংশোধনের জন্য গণভোটের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

গণভোট না করার ক্ষেত্রে একটি যুক্তি হলো, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবলিত একটি নতুন পরিচ্ছেদ, বিদ্যমান চতুর্থ ভাগ-এর অধীনে ২য় পরিচ্ছেদ-এর পরে '২ক পরিচ্ছেদ', সংযোজন করার মাধ্যমে গণভোটের বাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আমার ধারণা, এ যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে (১) দফার (ক) উপদফায় সংবিধান 'সংশোধন' (এমেন্ডমেন্ট)-এর 'রূপ' (ফর্ম) হিসেবে 'সংযোজন', 'পরিবর্তন', 'প্রতিস্থাপন', ও 'রহিতকরণ'কে নির্দেশ করা হয়েছে। আর বর্তমান ক্ষেত্রে সংবিধানে একটি পরিচ্ছেদ ও ৪টি অনুচ্ছেদসংবলিত একটি পরিচ্ছেদ 'সংযোজন' করা হয়েছে। এর ফলে সংবিধানের ৫৬(৩) ও ৫৬(৪) অনুচ্ছেদের বিধান অন্তত ৩ মাসের জন্য রহিত তথা সংশোধিত হচেছ। তাই সংবিধানের ১৪২(১ক) অনুচ্ছেদের বিধানমতে এ ক্ষেত্রে গণভোটের আয়োজন বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি যুক্তি হলো, সংবিধানের এ ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করার সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণভোট আয়োজনের অনুকূল ছিলো না। সংবিধান ও

www.pathagar.com

আইনের দৃষ্টিতে এ যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো দল বা গোষ্ঠীর আবেগ-উচ্ছ্বাস দ্বারা সংবিধানের বিধানকে লঙ্ঘন করার সুযোগ নেই। এ বাস্তবতায় প্রতিভাত হচ্ছে যে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীটি এখনো আইনে পরিণত হতে পারেনি এবং সংশোধনীটিকে আইনে পরিণত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করা বাধ্যতামূলক। বিষয়টি দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনবেত্তাগণ ভেবে দেখতে পারেন।

এবার ত্রয়োদশ সংশোধনীর কিছু শব্দ ও বাক্য বিভ্রাট প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

i. ৫৮-ক সংখ্যক 'অনুচ্ছেদকে' দু'বার 'অনুচ্ছেদ' বলা হয়েছে এবং তিনবার 'পরিচ্ছেদ' বলা হয়েছে। এখানে কোন্‌টি সঠিক—'অনুচ্ছেদ' না 'পরিচ্ছেদ'? আমাদের ধারণা, এখানে 'পরিচ্ছেদ'-এর ব্যবহার ভুল হয়েছে।

ii. সংবিধানের চতুর্থ ভাগের '২য় পরিচ্ছেদের' পরে একটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করতে চেয়েছে ত্রয়োদশ সংশাধনী। সে পরিচ্ছেদকে উল্লেখ করা হয়েছে '২ক পরিচ্ছেদ' হিসেবে। বিদ্যমান '২য় পরিচ্ছেদ'-এর পর '২য় ক পরিচ্ছেদ' হওয়াই ছিলো বেশি সঙ্গত। যেমন, সংবিধানের 'নবম ভাগ'-এর পর যুক্ত হয়েছে 'নবম ক ভাগ।'

iii. ৫৮খ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হচ্ছেঃ (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।' এখানে একবার বলা হলোঃ 'প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে ... নির্বাহী ক্ষমতা ... প্রযুক্ত হইবে', আবার বলা হচ্ছেঃ এবং 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।' এ বিধানটি অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক এবং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় প্রধান উপদেষ্টা দ্বারা বা তার কর্তৃত্বেই রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হতে পারতো। কিন্তু এর পরে 'এবং' দ্বারা আরেকটি 'কথা' জুড়ে দেয়ায় নানামুখী অর্থ ও ভাব সৃষ্টি হচ্ছে। 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ' বলতে 'অনধিক দশজন উপদেষ্টার' পরামর্শকে বোঝানো হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দরকার, এ উপদেষ্টাদের 'আনুষ্ঠানিক' অথবা 'অনানুষ্ঠানিক' পরামর্শের ভিত্তিতে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন কি-না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন আরও আছে। উপদেষ্টাদের এ 'পরামর্শ' বাধ্যতামূলক না স্বেচ্ছামূলক? প্রধান উপদেষ্টার একক কর্তৃত্বে এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শসমেত কর্তৃত্বে–উভয় প্রকারেই প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে অথবা হতে পারবে কি-না, এ প্রশ্নেরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মোট কথা, 'এবং'-এর মাধ্যমে যুক্ত বাক্যটি গুরুত্বপূর্ণ এ পুরো বিধানটিকে অস্পষ্ট ও জটিল করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে আমার দু'টি পরামর্শ আছে: এক. প্রকৃতপক্ষেই প্রধানমন্ত্রির ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টা চাইলে সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদের {৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সাপেক্ষে} মতো স্পষ্ট আইন করা যেতে পারে এবং সে-ক্ষেত্রে ৫৮খ(৩) অনুচ্ছেদে 'এবং' দ্বারা যুক্ত কথাটি বাদ দেয়া দরকার। দুই. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'অনধিক দশজন উপদেষ্টার' পরামর্শকে প্রধান উপদেষ্টার জন্য বাধ্যতামূলক করতে চাইলে '(১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে' শব্দগুলোর পরে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী/মোতাবেক' কথাটি যুক্ত করা যেতে পারে। এ উভয় ক্ষেত্রেই আইনটি স্পষ্ট থাকবে।

iv. ৫৮গ(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে ...'। এখানে বিভ্রাট ঘটছে 'প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা' কথাটি নিয়ে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫(১) অনুচ্ছেদে আছে : 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে ...'। এখানে কথাটি স্পষ্ট। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে আবার 'প্রধান উপদেষ্টা' থাকতে যাবেন কেনো? আমাদের ধারণা, ৫৮গ(১) অনুচ্ছেদে লিখিত 'প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর' কথাটি বাদ দিতে হবে।

v. ৫৮গ(৪) অনুচ্ছেদে 'যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় ...' এবং ৫৮গ(৫) অনুচ্ছেদে 'যদি আপীল বিভাগের কোন অপসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায়...' লেখা হয়েছে। আমার ধারণা, প্রথম ক্ষেত্রে লেখা উচিত 'যদি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায়...' এবং অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখা উচিত 'যদি আপীল বিভাগের সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে না পাওয়া যায়...'। ৫৮গ(৪) অনুচ্ছেদের সর্বশেষ লাইনের পূর্বের লাইনে একটি 'অনুরূপ' শব্দ লেখা হয়েছে। আমার ধারণা, এ 'অনুরূপ' শব্দটি অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলীর' বিধান দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ... 'কোন নীতিনির্ধারণী

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।' ইতোমধ্যে একটি বিবৃতির মাধ্যমে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসএসসি পর্যায়ে ইসলামিয়াত তথা ধর্মশিক্ষা বিষয়ের নম্বর ১০০ থেকে ৫০-এ নির্ধারণ করেছেন। স্পষ্টতই এমন একটি নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বিচারপতি হাবিবুর রহমানের ছিলো না।

ত্রয়োদশ সংশোধনী: রাজনীতিকদের অবস্থান

১৯৯৬-র ২৬ মার্চ সকাল ৬টায়[২২] জাতীয় সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী তথা 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল' পাশ হয় এবং ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস এ বিলে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান করেন। বিলটি যেহেতু তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিএনপি সংসদে উত্থাপন করে ও পাশ করে, তাই এ বিলের প্রতি বিএনপি-র ইতিবাচক সম্মতি আছে বলে বিশ্বাস করা যায়। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বা 'কেয়ারটেকার সরকার'-এর দাবি নিয়ে যেহেতু আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে, তাই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ হওয়ায় এ দলগুলো সন্তুষ্ট হবারই কথা। ৩০ মার্চ ১৯৯৬ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন ও বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এ জন্য ৩০ মার্চ পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচি চলতে থাকায় নির্দিষ্টভাবে ত্রয়োদশ সংশোধনীবিষয়ক কোনো বক্তব্য বা মন্তব্য এ দলগুলোর পক্ষ থেকে করা হয়নি। ৩০ মার্চ রাত ৯টা ৪৩ মিনিটে[২৩] প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা তাদের আন্দোলনে সাফল্যের প্রথম স্তর। একই দিনে এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, "নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত মর্যাদা সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এ সব প্রশ্নে আমরাও সচেতন। ... তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ সব আইনগত প্রশ্ন সমাধানের বিষয়টি পরবর্তী জাতীয় সংসদের নিকট অর্পণ করাই সমীচীন হবে।"[২৪] তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথা ত্রয়োদশ সংশোধনী সম্পর্কে শেখ হাসিনার ৩০ মার্চের এ বিবৃতির প্রায় দু'সপ্তাহ পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি

---

২২ *'সংবাদ'* ঢাকা, ২৮ মার্চ ১৯৯৬।

২৩ *'সংবাদ'* ঢাকা, ৩১ মার্চ ১৯৯৬।

২৪ *প্রাগুক্ত*।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এভাবে: "আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সভায় অবিলম্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। সভায় এক প্রস্তাবে এ সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রেখে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কারণ, এটা সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে থাকলে সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হবে। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে থাকায় নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে।"[২৫] পরদিন এক বৈঠকে "আওয়ামী লীগসহ তিনদল (জাতীয় পার্টি ও জামায়াত) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হাতে হস্তান্তর করার জোর দাবি জানিয়েছে।"[২৬]

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের (সর্বাধিনায়কতা) সংশোধন করে বিধান করা হয়েছে : "সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের 'নিয়ন্ত্রিত হইবে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।" এ সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টার আনুষ্ঠানিক পরামর্শ {৪৮(৩) অনুচ্ছেদ} ছাড়াই রাষ্ট্রপতি এ নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। একই সাথে সংবিধানের ১৪১ক(১) ও ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা রহিত করার (৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে এককভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও সে সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের নির্বাহী ক্ষমতা বিষয়ক আওয়ামী লীগ ও তিন দলের দাবি সম্পর্কে বিএনপির মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার বলেছেন, "কোনো দলীয় উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়নি। রাষ্ট্রপতি একজন নির্বাচিত ব্যক্তিই শুধু নন, তিনি সুপ্রিম কমান্ডার। কাজেই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো

---

[২৫] *'সংবাদ'* ঢাকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৯৬।

[২৬] *সংবাদ'* ঢাকা, ১৪ এপ্রিল ১৯৯৬।

www.pathagar.com

একটি স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয় শুধু রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়েছে। এতে সেনাবাহিনীর সুনাম ক্ষুন্ন বা অবমূল্যায়ন হয়নি।"[২৭]

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, "প্রতিরক্ষা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যস্ত হওয়ায় জাতি আস্থাশীল ও নিরাপদ বোধ করছে। রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ সংবিধানের ভিত্তিতে আইনতই তাঁর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ দায়িত্ব অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেয়ার কোন আইনসঙ্গত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই।"[২৮]

ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সাধিত সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের সংশোধন তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্বকে নিয়েই মূলত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের সংশোধনকে সংসদীয় ব্যবস্থায় অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে ও প্রতিরক্ষাবিষয়ক নির্বাহী ক্ষমতাকেও প্রধান উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত করার দাবি করেছে। বিপরীতে ত্রয়োদশ সংশোধনীর উত্থাপক দল বিএনপি এবং সমমনা কিছু দল সংশ্লিষ্ট বিধানের পক্ষে অভিমত দিয়েছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে 'সপ্তম' জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত প্রতিরক্ষাবিষয়ক নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতেই ছিলো। স্মরণ করা যেতে পারে, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৪দিন পর এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা "নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ... এ সব আইনগত প্রশ্ন সমাধানের বিষয়টি পরবর্তী জাতীয় সংসদের নিকট অর্পণ করাই সমীচীন হবে"[২৯] বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অথচ এ আওয়ামী লীগই 'পরবর্তী জাতীয় সংসদের' অপেক্ষা না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'আইনগত প্রশ্ন' নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি স্পর্শকাতর বির্তকের সৃষ্টি করে। এটি স্পর্শকাতর এ জন্য যে, এ বিতর্কের সাথে দেশের সশস্ত্রবাহিনীর অবস্থানকে প্রশ্নের মুখোমুখি করা হচ্ছিলো। যদিও সরকারের (শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার) পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে এখন তেমন কিছু শোনা যাচ্ছে না।

---

[২৭] *সংবাদ*' ঢাকা, ২১ এপ্রিল ১৯৯৬।

[২৮] *প্রাগুক্ত*।

[২৯] '*সংবাদ*' ঢাকা, ৩১ মার্চ ১৯৯৬।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকার : একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, বাংলাদেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিলো ১৯৯০-র ৬ ডিসেম্বর আর দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ৩০ মার্চ ১৯৯৬। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্মরত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ১৭ জন[৩০] উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হয়। দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি[৩১] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হয়।

এবার আমরা বাংলাদেশের দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করতে চাই। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো আন্দোলনরত বিরোধী দল ও জোটগুলোর ঘোষিত যৌথ ঘোষণার[৩২] (১৯ নভেম্বর ১৯৯০) ভিত্তিতে। বিপরীতে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। কর্মরত প্রধান বিচারপতি থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন কর্তৃক প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি ও পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার ফলে সংবিধানের যে লঙ্ঘন করা হয়, তার সাংবিধানিক বৈধতা প্রদানের জন্য পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী (সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে ২১ নং ধারা সংযোজন) উত্থাপন ও পাশ করা হয়। এ সংশোধনীটি ১০ আগস্ট ১৯৯১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের সরকার (প্রথম সরকার) ছিলো রাষ্ট্রপতিক, বিপরীতে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকার (দ্বিতীয় সরকার) ছিলো সংসদীয় পদ্ধতির। প্রথম সরকারের প্রধান ব্যক্তি একই সাথে রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান, তাই কারও কাছে তার জবাবদিহিতার বাধকতা ছিলো না। বিপরীতে দ্বিতীয়

---

৩০ উপদেষ্টাদের তালিকা: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, কাজী ফজলুর রহমান, কফিলউদ্দিন মাহমুদ, ফকরুদ্দীন আহমদ, এম এ জি কিবরিয়া, আলমগীর এম এ কবীর, অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, ডা. অধ্যাপক এম এ মাজেদ, বিচারপতি অব. এম এ খালেক, অ্যাডভোকেট বি কে দাস, মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, এ বি এম মুসা, ইমামুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, আনিসুজ্জামান চৌধুরী, আনিসুল হক ও ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ।

৩১ উপদেষ্টাদের তালিকা : ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ, শেওফতা বখ্‌ত চৌধুরী, এম. শামসুল হক, জে.আ. রহমান খান, ড. মুহাম্মদ ইউনুস, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ড. নাজমা চৌধুরী, ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, এ জেড এম নাছিরুদ্দিন।

৩২ Mohammad A. Hakim. *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*, University Press Limited. Dhaka. 1993.

www.pathagar.com

সরকারের প্রধান ব্যক্তি শুধুমাত্র সরকার প্রধান। তিনি তার উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যসহ যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী ছিলেন।

প্রথম সরকার প্রতিরক্ষাসহ রাষ্ট্রের সমুদয় নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করে। বিপরীতে ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করায় দ্বিতীয় সরকার এ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনি। প্রথম সরকারকে সাংবিধানিকভাবে (একাদশ সংশোধনীর আওতায়) 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় সরকারকে সংবিধান 'নির্দলীয় সরকার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলো 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করেছিলো এবং সংবিধান সংশোধনীর পরও দলগুলো, বিশেষত আওয়ামী লীগ[৩৩] দ্বিতীয় সরকারকে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বিএনপি কার্যত গোড়া থেকেই বিরোধী দলের 'নিরপেক্ষ সরকারের' ধারণার সাথে দ্বিমত ঘোষণা করেছিলো এবং এ দলটির উদ্যোগে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল প্রস্তাবিত ও পাশ হয়, তখন 'নিরপেক্ষ' শব্দটিকেও দলটি সচেতনভাবে পরিহার করেছে।

প্রথম সরকারের সদস্য সংখ্যার কোনো বাধকতা ছিলো না। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন 'কয়েক দফায়' ১৭ জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। বিপরীতে দ্বিতীয় সরকারের ক্ষেত্রে একজন প্রধান উপদেষ্টা ও 'অনধিক দশজন' উপদেষ্টার {৫৮গ(১১) অনুচ্ছেদ} নির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়।

প্রথম সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বড় কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। তবে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের দাবির মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদের দল জাতীয় পার্টিকে প্রচারের ক্ষেত্রে রেডিও-টিভি সম্প্রচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে প্রথম সরকার। এ জন্য দলটি প্রথম সরকারকে অভিযুক্ত করেছিলো। অন্যদিকে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ফলাফল দেখে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা 'সূক্ষ্ম কারচুপি'র অভিযোগ তুলেছিলেন। কার্যত এ অভিযোগটি সরাসরি প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে ছিলো না—ছিলো অন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি।

---

[৩৩] *সংবাদ*, ঢাকা, ৭ এপ্রিল ১৯৯৬, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আয়োজিত 'বিজয় সমাবেশে' শেখ হাসিনার ভাষণ।

www.pathagar.com

বিপরীতে দ্বিতীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রথম অবস্থা থেকেই অভিযোগ উঠতে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্ব প্রথম প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারে এমন কেউ কেউ আছেন যারা বিগত আন্দোলনের সাথে ছিলেন না, বরং বিএনপিকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছেন।"[৩৪]

দ্বিতীয় সরকারের বিরুদ্ধে অন্যতম বড় দল বিএনপি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে। এ পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নটি আসে 'আওয়ামী লীগপন্থি' আমলাদেরকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদে আসীন করা নিয়ে। বিএনপি সরকারবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকার মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ হানিফ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখবর্তী রাজপথে একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন, নাম দেন 'জনতার মঞ্চ'। প্রধানত আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীরা এ মঞ্চে এসে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন এবং বিএনপি সরকারের পতনের লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলনকে সংহত করেছিলেন। 'প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ' নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে 'আওয়ামী লীগপন্থি' কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে 'জনতার মঞ্চে' আরোহণ করেন এবং বিএনপি সরকারকে 'অবৈধ সরকার' হিসেবে আখ্যায়িত করে সরকার পতনের আন্দোলনের আহ্বান জানান। এ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর। তৎকালীন পাট সচিব সফিউর রহমান রাজনীতিকদের স্টাইলে সংবাদপত্রে বিবৃতিদানের[৩৫] মাধ্যমে বিএনপি সরকারকে অবৈধ আখ্যায়িত করে 'চলমান আন্দোলনের' সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া নিপোর্ট-এর মহাপরিচালক[৩৬], জেলা প্রশাসকসহ মাঠপর্যায়ের বেশকিছু কর্মকর্তা[৩৭] প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে বিরোধী দলীয় আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে থাকেন। খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রির পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়ানো ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

---

৩৪ *সংবাদ*, ঢাকা, ৫ এপ্রিল ১৯৯৬।

৩৫ *সংবাদ*, ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৯৬।

৩৬ *সংবাদ*, ঢাকা, ২৮ মার্চ ১৯৯৬।

৩৭ *সংবাদ*, ঢাকা, ৩০ মার্চ ১৯৯৬।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় বিএনপি ক্ষমতা ত্যাগের পর ঢাকায় আহূত জনসভার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে 'সরকারি কর্মচারী বিধি লঙ্ঘন' করে রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী আমলাদের শাস্তির দাবি করে। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকার এ আমলাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং অন্যতম চিহ্নিত এবং 'বিদ্রোহী আমলা' সৈয়দ আহমেদকে প্রধান উপদেষ্টার মূখ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিছুদিন পর বেশকিছু জেলায় 'বিএনপিপন্থি' হিসেবে পরিচিত ডেপুটি কমিশনারকে প্রত্যাহার করে তাদের স্থানে 'আওয়ামী লীগপন্থী' হিসেবে পরিচিত 'বিদ্রোহী আমলা'কে পোস্টিং প্রদান করে। এ পর্যায়ে বিএনপির এক নেতা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত 'জনতার মঞ্চে' যোগদানকারী ১৯ জন আমলার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট মামলা করেন। ৭ মে ১৯৯৬ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট আমলাদের বিরুদ্ধে কেনো শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং কেনো তাদের সর্বশেষ বদলির আদেশ বাতিল করা হবে না, এ মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের সংস্থাপন সচিবকে সাতদিনের সময় দিয়ে এক রুলনিশি জারি করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষ্যকার 'বিএনপিপন্থি' আমলাদের স্থলে 'আওয়ামী লীগপন্থি' বলে চিহ্নিত আমলাদের স্থলাভিষিক্ত করাকে 'নির্দলীয় সরকারের দলীয় আচরণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৮] তারা অভিমত দিয়েছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার খুব সহজেই 'বিএনপিপন্থি' বলে চিহ্নিত আমলা-ডিসিদের স্থলে 'নির্দলীয়' হিসেবে বিবেচিত আমলাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারতো।

দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দু'টো সাধারণ নির্বাচনকেই দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকরা সাধারণভাবে সন্তোষজনক মাত্রায় অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে মূল্যায়িত করেছেন। তবে পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে সুযোগ থাকবে যে, দ্বিতীয় সরকারের আমলে নির্বাচনে বেশি সংখ্যক ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষ হয়েছে ও নির্বাচন স্থগিত হয়েছে, বেশি সংখ্যক মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফলের পর বেশি সংখ্যক আসনের-কেন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে ও নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি যথেষ্ট সাধারণীকৃত, স্বীকার করতে হয়। এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্য-প্রমাণসহ মন্তব্য করার জন্য আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে নির্বাচনী মামলাগুলোর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ একটি ব্যাপক বিস্তৃত প্রসঙ্গ। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্বের বিষয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্ন এলে বলতে হবে, জনগণের

---

[৩৮] *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ঢাকা, ১৩ মে ১৯৯৬।

www.pathagar.com

নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকে।[৩৯] গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলব্যবস্থাও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণভাবে অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের সময় এ রাজনৈতিক দলের নেতারা জনগণের সমর্থন অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক কতোটুকু? আমরা যুক্তরাজ্য (১৯৫৪), ভারত (১৯৭৯) ও পাকিস্তানের (১৯৮৮, ১৯৯০ ও ১৯৯৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। যুক্তরাজ্য ও ভারতে যে দু'জনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তারা দু'জন ইতঃপূর্বে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন। এ দু'টো দেশে সাধারণভাবে মেয়াদ শেষে প্রধানমন্ত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করা হয়ে থাকে। পাকিস্তানেও ১৯৯৩-র নির্বাচনের পূর্ববর্তী নির্বাচনসমূহ পদত্যাগী সরকার প্রধানদের তত্ত্বাবধানেই হয়েছে। বিশেষ বাস্তবতায় ১৯৯৩ সালে পাকিস্তানে একজন অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় ব্যক্তিকে (মঈন কোরেশি) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, তা দলীয় এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমেই অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের জেনারেল এরশাদের আমলে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' দাবি ওঠে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের অবিশ্বস্ততার ও অবৈধতার বাস্তবতায়। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটিকে সাধারণভাবে সব মহল সন্তোষের সাথে গ্রহণ করে। খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপনির্বাচন (২০ মার্চ ১৯৯৪) দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়ে বিরোধী রাজনীতিকদের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে প্রলুব্ধ করে। এরপর বিরোধী দলগুলো 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করে সে দাবি আদায় করেছে।

---

[৩৯] Karl Loewenstein. *British Cabinet Government.* New York: Oxford University Press. 1967. P. IX.

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে একটি সরলীকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে অনুধাবনের চেষ্টা করা যায়। গণতন্ত্রে 'জনগণ' সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।[৪০] রাজনৈতিক দলগুলো যদি 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' দাবি করে, তা হলে তত্ত্বগতভাবে সে দাবিকে জনগণের দাবি হিসেবে স্বীকার করা দরকার। অবশ্য প্রশ্ন আসতে পারে, এটা কতোভাগ জনগণের দাবি। আমি মনে করি, যে কোনো রাজনৈতিক দাবির বেলাতেই দাবিটি কতোভাগ জনগণের দাবি সে বিষয়ে একটি যৌক্তিক ধারণা পাওয়া গেলে বলা সম্ভব সে দাবিটি গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কি-না। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য দাবি নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুকূল হবে বলেই মান্য করতে হয়।

১৯৯৪-র মার্চ থেকে ৩টি প্রধান বিরোধীদল—আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করছিলো। যদি স্বীকার করা যায়, এ দলগুলো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে—তা হলে হিসেবের প্রশ্ন আসে দলগুলো কতোভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৯১-র সাধারণ নির্বাচনকে মানদণ্ড ধরা গেলে বলতে হবে, এ তিনটি দল জনগণের প্রায় ৬৮ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের ভোটার-জনগণের ৬৮ শতাংশের দাবিকে 'গণতান্ত্রিক দাবি' হিসেবে গণ্য করাই গণতন্ত্রমনস্কতার পরিচায়ক। ১২ জুনের (১৯৯৬) নির্বাচনকে যদি 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিষয়ে জনগণের একটি 'গণভোট' হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তা হলে মানতে হবে, জনগণের একটি বিপুল অংশ এ ধরনের 'নির্বাচনকালীন' সরকার পছন্দ করে। গণতন্ত্রে জনগণের চাহিদা পূরণই মূলকথা এবং শেষ কথা।

এ বিশ্লেষণ থেকে সম্ভবত নিঃসংকোচে বলা যায়, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' সাংবিধানিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুকূল একটি আয়োজনই বটে।

সমাপনী মন্তব্য

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আনুষ্ঠানিক ধারণা যুক্তরাজ্যে প্রচলিত হয় ১৯৪৫ সালে, যখন জাতীয় সরকারের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে রাজা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানান। এরপর ভারত ও পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুশীলন দেখা গেছে। ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে

---

৪০ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, pp. 89-91. দেখুন, মিজানুর রহমান খান, পৃ. ৪০।

www.pathagar.com

'নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত' গ্রহণের বদলে কেবল 'দৈনন্দিন প্রশাসন' পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি ছিলো নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং এ সরকারের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। আমার বিবেচনায়, বাংলাদেশে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তা এ যাবৎ বিশ্বের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার যাবতীয় উন্নয়নের (নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রশ্নে) মিলিত রূপ। সেদিক থেকে বাংলাদেশের 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ও সংযোজন হিসেবে মূল্যায়নের সুযোগ আছে।

'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দু'টি সাধারণ নির্বাচন সাধারণভাবে দেশি-বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। সাধারণ দেশবাসীর কাছেও নির্বাচন দু'টি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এতে করে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। অবশ্য এ জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আইনগুলোকে সংশোধন করে জটিলতামুক্ত করতে হবে, নির্বাচন কমিশনকে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ স্বায়ত্তশাসিত করতে হবে এবং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালকে স্বল্পতম সময়ে মামলা নিষ্পত্তির বিধান করতে হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিকাশ এবং অতঃপর বিলুপ্তি?

ভূমিকা

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে। এ সরকারটি ব্যাপকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ পর্যায়েই নির্বাচনকালীন সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান প্রণয়নের দাবি উঠেছিলো। কিন্তু প্রধান তিন দলের (আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি) আগ্রহের অভাবে সে সময় এ ব্যবস্থা সাংবিধানিক ভিত্তি পায়নি। ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনকালীন সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি সম্মিলিত বিরোধী দলের দাবিতে পরিণত হয় এবং দু'বৎসরের ব্যবধানে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সে দাবি পূরণ হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন প্রথম সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'তত্ত্বাবধানে' সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির সমর্থনে সরকার গঠন করে। দ্বিতীয় সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চার দলীয় জোট অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দু'-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ২০০১ সালে সরকার গঠন করে। এ পর্যায়ে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দাবি তোলে। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই মেয়াদের অবশিষ্ট বৎসরগুলো পার হয়। সাংবিধানিক আয়োজনের সূত্রে প্রধান উপদেষ্টা হবার প্রথম বিকল্প বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়ে আওয়ামী লীগের অনমনীয় বিরোধিতা ও 'লগি-বৈঠার' হুমকিপূর্ণ আন্দোলনের মুখে দায়িত্ব গ্রহণের শেষ মুহূর্তে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে প্রধান বিরোধী দল ও সদ্য বিদায়ী সরকারের নেতৃত্বের একগুঁয়েমীপূর্ণ অবস্থানের পেক্ষাপটে এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন এবং ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন।[১] বাংলাদেশের এ তৃতীয় সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারী নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন(ইসি)কে সহযোগিতা করে এগুতে থাকার এক পর্যায়ে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট প্রার্থীবৃন্দ ৩ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে একসাথে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন। আশঙ্কা ও জটিলতাপূর্ণ সময় অতিক্রমের এক পর্যায়ে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী রাতে 'প্রেসিডেন্টের উচ্চারণে' দেশে জরুরী অবস্থা জারি হয় ও পরদিন প্রেসিডেন্টের স্থলে ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।[২] দায়িত্ব গ্রহণের ২৩ মাসের মাথায় ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে এ সরকার। ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ অথবা এর নেতৃত্বের মহাজোটের শরীক দলগুলো 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা বিষয়ে কোনো মন্তব্য অথবা অঙ্গীকার করেনি। অন্যদিকে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এর নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতায় গেলে বিদ্যমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার সাধনের অঙ্গীকার করে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো ধারণা দেয়া হয়নি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট 'সাত-অষ্টমাংশে'র বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে নির্বাচিত হয় ও সরকার গঠন করে। এমনি একটি ব্যাপক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশে নির্দলীয়

---

১ ২৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। ২৯ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সংবিধানের ৫৮(গ-৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। ৩১ অক্টোবর তিনি ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। উপদেষ্টাগণ হলেন: বিচারপতি মো: ফজলুল হক, ড. আকবর আলি খান, লে.জে.(অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী, সিএম শফি সামি, ধীরাজ কুমার নাথ, মাহবুবুল আলম, এম আজিজুল হক, ডা. সুফিয়া রহমান, ইয়াসমিন মুর্শেদ ও সুলতানা কামাল।

২ ১২ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আগে ১১ জানুয়ারী রাতে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন পদত্যাগ করে সিনিয়র উপদেষ্টা বিচারপতি মো: ফজলুল হককে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করেন। এ দিন অন্য ৯ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। পরদিন ১২ জানুয়ারী ড. ফখরুদ্দীনের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টার পদ থেকে বিচারপতি ফজলুল হকের দায়িত্বের অবসান ঘটে। ড. ফখরুদ্দীন ১৩, ১৬ ও ১৮ জানুয়ারী-এ তিন ধাপে ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। এ উপদেষ্টাগণ হলেন: ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ড. এ বি মির্জ্জা মো: আজিজুল ইসলাম, মেজর জে.অব. এম এ মতিন, বেগম গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী, তপন চৌধুরী, ড. আইয়ুব কাদরী, মেজর জে. অব. ডা. এ এস এম মতিউর রহমান, আনোয়ারুল ইকবাল, ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী ও ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিকাশ ও সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দাবি

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার (জুন ১৯৯৬ - জুলাই ২০০১) জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব) থেকে একজন করে মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করে নিজেকে 'জাতীয় ঐকমত্যের' সরকার হিসেবে দাবি করে। এ দাবি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। ক্ষমতায় থাকার সময় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন, এটিকে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এ মডেলকে বিভিন্ন দেশে 'রফতানী' করার আগ্রহও ব্যক্ত করেন।

মেয়াদ শেষে শেখ হাসিনা বিচারপতি লতিফুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বিচারপতি লতিফুর রহমান ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে তার দ্বিতীয় সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন[৩]। শেখ হাসিনা এর আগে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এসইসি'র সাবেক চেয়ারম্যান, বৃহত্তর ফরিদপুরের অধিবাসী এম এ সাঈদকে সিইসি হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ইসিতে এ সময় সফিউর রহমান নামের এক আমলাকেও সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি বিতর্কিত ছিলেন। বিএনপিসহ চার দলীয় জোটের (বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি-মঞ্জুর ও ইসলামী ঐক্যজোট সমন্বয়ে গঠিত) পক্ষ থেকে এ নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং এ সিইসি ও ইসি তাদের পরিচিতির আঞ্চলিকতা ও বিতর্কের সূত্রে আওয়ামী লীগের অনুকূলে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করতে ও পদক্ষেপ নিতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এর আগে, সরকার গঠনের পর, আওয়ামী লীগ সাবেক প্রধান বিচারপতি ও ১৯৯০ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান ও সিইসি এম এ সাঈদ বিষয়ে চার দলীয় জোটের প্রকাশ্য বা ঘোষিত ইতিবাচক ধারণা ছিলো না। প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে বিচারপতি লতিফুর রহমান আওয়ামী লীগ সরকারের দেয়া কিছু কর্মকর্তার পোস্টিং-

---

[৩] ১০ জন উপদেষ্টা হলেন: ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী, মেজর জে. অব. মইনুল হোসেন চৌধুরী, হাফিজ উদ্দিন খান, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ব্রিগেডিয়ার অব. ডা. আবদুল মালেক, এ এস এম শাহজাহান, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, রোকেয়া আফজাল রহমান ও একেএম আমানুল ইসলাম চৌধুরী।

www.pathagar.com

এর ক্ষেত্রে রদবদল[৪] করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ক্রুদ্ধ অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এর বাইরে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আওয়ামী লীগের বড় কোনো অভিযোগ-অসন্তোষ ছিলো না। দলটি নির্বাচনের জন্য অন্যতম বড় দল জাতীয় পার্টির সাথে পৃথক জোট করতে সম্মত ছিলো না, যদিও অন্য কয়েকটি বামপন্থী ক্ষুদ্র দলের সাথে আওয়ামী লীগ (১১ দল+আওয়ামী লীগ+জাসদ-ইনু+ওয়ার্কার্স পার্টি) মিলে ১৪ দলীয় জোট নামে আন্দোলন করেছে এবং নির্বাচনেও অংশ নিয়েছে।

২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাভাষের চাইতে কিছুটা ভিন্নই ছিলো। বিএনপির নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট ২১৪টি আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের এ ফলাফল মানতে অস্বীকার করেন এবং প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা ও সিইসিকে এ নির্বাচনে স্থূল কারচুপির দায়ে অভিযুক্ত করেন। এর আগে, ১৯৯১-র ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে শেখ হাসিনা সে নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ করেছিলেন। তার সে অভিযোগ দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক মহলসহ বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্থূল কারচুপির অভিযোগ তোলায় এবং প্রেসিডেন্টকেও এতে সহযোগী[৫] হিসেবে চিহ্নিত করায় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের সাথে শেখ হাসিনার সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটে। এ পর্যায়ে উভয়ের মাঝে বেশ কিছু নাটকীয় ঘটনার তথ্য মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়।[৬]

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল স্বীকার না করা, সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ না করা এবং সংসদের অধিবেশনে যোগদান না করার বিষয়ে শেখ হাসিনা পৃথকভাবে ঘোষণা করলেও প্রতিটি বিষয়েই তিনি ক্রমান্বয়ে নতি স্বীকার[৭] করেন। অবশ্য সংসদের অধিবেশনে তিনি সামান্যই অংশ নিয়েছেন এবং ইতঃপূর্বে হরতাল

---

৪ ১৩জন সচিবকে ভিন্ন পোস্টিং দেয়া ও ট্রান্সফার করা হয়।

৫ শেখ হাসিনার ভাষায় '৬ দলীয় ঐক্যজোট' ষড়যন্ত্র করে তাদের বিজয় ছিনিয়ে নেয়। এ '৬ দল' হলো: প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন, প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফ, সিইসি সাঈদ, আর্মি ও ৪ দলীয় জোট। দেখুন: Rashed Chowdhury,'AL Flexing Muscles to Launch Movement', The Dhaka Courier, ২ নভেম্বর ২০০১, পৃ-১০ ও Shamim Ahmad, 'Shahabuddin Breaks His Silence and Angers AL', The Dhaka Courier, ১১ জানুয়ারী ২০০২, পৃ-১৪।

৬ Rashed Chowdhury,'AL Flexing Muscles to Launch Movement', The Dhaka Courier, ২ নভেম্বর ২০০১, পৃ-১০ ও Shamim Ahmad, 'Shahabuddin Breaks His Silence and Angers AL', The Dhaka Courier, ১১ জানুয়ারী ২০০২, পৃ-১৪।

৭ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১ জানুয়ারী ২০০২।

www.pathagar.com

না করার[৮] স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তিনি ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ৫২৭ দিন হরতাল[৯] করেছেন।

এ মেয়াদের (২০০১-২০০৬) প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ চার দলীয় জোট সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘোষণা[১০] দেয়। এতে দলটি ব্যর্থ হয়। এর পর দলটি ১৪ দলীয় জোটের ব্যানারে বিদ্যমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিতে সংস্কার দাবি করে। শীর্ষ আইনজীবী-কাম-রাজনীতিবিদদের[১১] কেউ কেউ এ সময়ে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধানটির তীব্র বিরোধিতা করেন। আওয়ামী লীগ ও ১৪দলীয় জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির সংস্কার দাবি করে চললেও অনেকদিন পর্যন্ত[১২] তাদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ সময়ে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর[১৩] সূত্র ধরে সাধারণভাবে ১৪ দলীয় জোট পরবর্তী প্রধান উপদেষ্টা বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে আপত্তি উত্থাপন করে এবং সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা হয়, এ আসনে নির্বাচনের পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয় এবং কয়েকটি সাংবিধানিক পদে অবসরগ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরগ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বৎসর করা হয়। এ সুযোগ সুপ্রীম কোর্টের সব বিচারপতি পেলেও এর একটি প্রয়োগগত বিশিষ্টতাকে বিরোধী দলসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়। অবসরের এ বয়সসীমা বৃদ্ধির ফলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মুদাস্‌সিরের অবসরগ্রহণের সময়টি পিছিয়ে যায় এবং এর ফলে ২০০৬ সালের অক্টোবরে, যখন চার দলীয় জোট সরকারের ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবে, 'সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতির' অবস্থানে থাকার কথা বিচারপতি কে এম হাসানের। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হবার আগে তিনি বিএনপি দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হলে নির্বাচনে বিএনপিকে অন্যায্য-অবৈধ সুবিধা

---

৮ *প্রাগুক্ত*।

৯ 'তারুণ্যের প্রাণবন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়', মাসুদ মজুমদার, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

১০ ৩০ এপ্রিল ২০০৩-এর মধ্যে চারদলীয় জোট সরকার পতনের আলটিমেটাম ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল।

১১ ড. কামাল হোসেন প্রমুখ।

১২ ২০০৫ সালের ১৩ মার্চ প্রথম বারের মতো আংশিক সংস্কার প্রস্তাব আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। ১৫ জুলাই ১৪ দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে ৩১ দফার সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেখ হাসিনা।

১৩ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী সংসদে পাশ হয় ২০০৪ সালে ১৫ মে।

www.pathagar.com

দেবেন বা দলটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন- এ বিবেচনা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ১৪ দলীয় জোট বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং সরকারের কাছে বিদ্যমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করে। এর আগে, ১৯৯৬-র সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে, এ জোট এবং জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের হাতে রাখার বিধানের বিরোধিতা করেছিলো। ১৯৯৬-র সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে (১৪২ আসন, ৩০০ আসনের বিপরীতে) সরকার গঠনের পর ৫ বৎসরের মেয়াদকালে এ বিষয়ে এ জোট কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ২০০৪ সালের দিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আবার ১৪ দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংস্কারের অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট দাবি তোলে। জবাবে ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ থেকেও একাধিকবার বলা হয়, পরবর্তী নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন বিদ্যমান বিধানের আলোকেই অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য সরকারের কোনো কোনো সদস্য নির্বাচন সুষ্ঠু করার বিষয়ে বিরোধী দলের যে কোনো পরামর্শ বিষয়ে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২০০৫ সালের ১৪ মার্চ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পুনরায় অনির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করা হয়। পরের মাস, এপ্রিল, এর মাঝামাঝি নাগাদ তাদের দল ও জোটের পক্ষ থেকে একটি চূড়ান্ত সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে বলে পত্রিকান্তরে জানানো হয়। দলীয়ভাবে আয়োজিত এ গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে দাবি করা হয়: ক. বিচারপতি কে এম হাসানের বদলে অন্য কাউকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে, খ. সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ১০জন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে, গ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্বও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে হবে এবং ঘ. নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগত স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।[১৪] ১৫ মার্চ ২০০৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।[১৫]

আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের দাবির একটি কাছাকাছি দাবি উত্থাপন করেন গণফোরাম সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এবং তাকে আরো

---

[১৪] ১৫ মার্চ ২০০৫-এর ঢাকার সব *দৈনিক*।

[১৫] ১৬ মার্চ ২০০৫-এর ঢাকার সব *দৈনিক*।

www.pathagar.com

কেউ কেউ সমর্থন করেন। বিদ্যমান সাংবিধানিক বিধির আলোকে পরবর্তী সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানকে যেহেতু রাজনীতির একটি পক্ষ চাচ্ছে না, তাই তিনি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে বিব্রতবোধ করার কথা প্রকাশ করতে পারেন। তাতে সমস্যার সমাধান হয়। বিচারপতি কে এম হাসানকে 'বিব্রত হওয়ার' প্রস্তাব দেয়ার কথাও বলেন কেউ কেউ। এ সব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি।[১৬] বলেছেন, বিচারপতি এবং এমনকি প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালেও যিনি কারোরই কোনো সমালোচনার কারণ হননি, আপত্তির কারণ হননি, আস্থা হারাননি, নির্বাচন তত্ত্বাবধানের আংশিক দায়িত্ব পালনকালে তিনি কেনো কারো আস্থা হারাবার মতো আচরণ করবেন? আর বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলেই কি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে? আজ যাকে গ্রহণযোগ্য বলা হবে নির্বাচনের পরও তিনি গ্রহণযোগ্য থাকবেন, এর নিশ্চয়তা কে দেবে? আগের 'গ্রহণযোগ্য' ব্যক্তিরা কি গ্রহণযোগ্য থাকতে পেরেছিলেন?

প্রধান উপদেষ্টা বিষয়ক এ জটিলতা চলাকালে বর্তমান লেখক একাধিক নিবন্ধে বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়ে আওয়ামী লীগ-১৪ দল- ড. কামাল হোসেনদের অবস্থানকে অপছন্দ করার কথা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন এবং সেই সাথে তৎকালীন শাসকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিরোধী দল যেহেতু নির্দিষ্টভাবে 'ব্যক্তি বিচারপতি হাসানের' বিষয়ে আপত্তি করছে এবং ব্যাপকভাবে দাবি করছে বিচারপতি হাসান চারদলীয় জোটের নির্বাচনী ফলাফল বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন, তাই এ বিষয়ে তাদের একটি নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিৎ এবং এ প্রশ্নে বিরোধী দলকে তাদের নমনীয় অবস্থান বিষয়ে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য উচ্চারণে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।[১৭] ক্ষমতাসীনদের এমন অবস্থানের কারণে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দল বিচারপতি হাসান ইস্যুতে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থি ও ক্ষতিকর আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে চাপ বোধ করবে।

কিন্তু ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দদল নিজেদের অবস্থানে অনমনীয় থাকে এবং বিচারপতি হাসান ইস্যুটি কার্যত বাংলাদেশকে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি করে দেয়। আওয়ামী লীগের 'লগি-বৈঠার' ভয়ঙ্কর প্রদর্শনী-আন্দোলনের মুখে শেষ মুহূর্তে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার

---

[১৬] ড. আসিফ নজরুল, 'সময়চিত্র', *প্রথম আলো*, ১৩ এপ্রিল ২০০৫।

[১৭] পরিশিষ্ট-৪।

www.pathagar.com

দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। বিচারপতি হাসানের অপারগতা ঘোষণার পর পরবর্তী সাংবিধানিক বিকল্পগুলো বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রাজনীতির প্রধান দু'পক্ষের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে ৬ নম্বর বিকল্পটি গ্রহণের ঘোষণা দেন, যেখানে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তার প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করে ড. ইয়াজউদ্দিন রাজনীতির দু'পক্ষের নিকট থেকে সংগৃহিত তালিকার আলোকে ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন[১৮]। এ উপদেষ্টাদের মধ্য থেকে এক পর্যায়ে ৪ জন পদত্যাগ[১৯] করলে প্রেসিডেন্ট নতুন ৪ জন উপদেষ্টা নিয়োগ[২০] দেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া এগিয়ে চলার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রাজনীতির একটি পক্ষ বিচারপতি এম এ আজিজের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবিতে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।

রাজনীতির এ পক্ষটি ইসি, ভোটার তালিকা এবং অন্য কিছু বিষয়ে দরকষাকষি শেষে ২০০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে 'উৎসবের আমেজে' 'মহাজোটের ব্যানারে' পরবর্তী ২২ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশ নেয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে মনোনয়নপত্র জমা দেয় এবং এ সময়ের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক ৪১৪৬টি মনোনয়নপত্র জমা[২১] হয়। মহাঐক্যজোটের অংশীদার হয় আওয়ামী লীগ, ১১ দল, জাসদ-ইনু, ওয়ার্কার্স পার্টি, এলডিপি, খেলাফত মজলিস-শায়খুল হাদিসসহ আরো কয়েকটি দল। এ মহাঐক্যজোটভুক্ত সব প্রার্থীই আবার ৩ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে তাদের সমুদয় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অভিযোগ আনেন এবং ক. সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত হালনগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ, খ. প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ড. ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগ, গ. প্রশাসনকে দলীয়মুক্তকরণ, ঘ. জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদসহ মনোনয়ন

---

[১৮] তালিকা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে।

[১৯] ১১ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে পদত্যাগী ৪ উপদেষ্টা হলেন: ড. আকবর আলি খান, সিএম শফি সামি, লে. জে. অব. হাসান মশহুদ চৌধুরী ও এডভোকেট সুলতানা কামাল।

[২০] এ পর্যায়ে সেদিনই নিয়োগ পাওয়া নতুন ৪ উপদেষ্টা হলেন: ড. শোয়েব আহমদ, প্রফেসর এম মঈনউদ্দীন খান, সফিকুল হক চৌধুরী ও মেজর জে. অব. রুহুল আলম চৌধুরী।

[২১] ২৭ ডিসেম্বর ২০০৬ এর ঢাকার সব *দৈনিক*।

www.pathagar.com

বাতিলকৃত সব প্রার্থীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান ও ঙ. নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল বাতিল করে নতুন তফসিল ঘোষণা করার দাবি জানান[২২]। সে পর্যায়ে পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ নির্দিষ্টভাবে দাবি করেন, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে ৩ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখ সময়ের মধ্যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদের সব ক'টি মনোয়নপত্র মামলা বিষয়ক জটিলতার সূত্রে বাতিল করা ছাড়া নতুন কোনো রাজনৈতিক ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেনি[২৩]। তাই এরশাদের মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল ঘোষণা ও নির্বাচন কমিশন পর্যায়ে শুনানীর পরও তা 'বাতিল হওয়া বহাল' থাকাই মহাঐক্যজোটের নির্বাচন বর্জনের একমাত্র প্রকাশ্য কারণ। কেননা শেখ হাসিনা উত্থাপিত অন্য প্রসঙ্গগুলো নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের ঘোষণার তারিখেও (২৪ ডিসেম্বর ২০০৬) বিদ্যমান ছিলো এবং ৩ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে সে সব প্রসঙ্গে কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি।

মহাঐক্যজোটের মনোয়নয়নপত্র প্রত্যাহারের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জন ও নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের একটি বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান উপস্থাপন করেছিলেন বর্তমান লেখক এভাবে: 'এ জন্য প্রত্যাহৃত মনোনয়নপত্র পুনরায় জমাদানের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি একটু স্পষ্ট করে বলা যায়: রাষ্ট্রপতি রাজনীতির প্রধান দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যাহৃত মনোনয়নপত্রগুলো পুনরায় জমা দেয়ার সুযোগ দিতে পারেন। এ জন্য আইনগত সংরক্ষণের স্বার্থে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় অর্ডিন্যান্স জারী করবেন এবং নতুন সংসদে রাজনীতির পক্ষগুলো এ অর্ডিন্যান্সকে অনুমোদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তুলনামূলকভাবে সহজ। এর বাইরে সমাধানের অন্য সব বিকল্পই অনেক বেশী জটিল এবং কঠিন। আর নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার অনিবার্য পরিণতি অজানা ও সীমাহীন সংঘাত, রক্তপাত এবং জাতীয় জীবনের অভাবনীয় দুর্গতি। জাতীয় জীবনের এ দুর্গতি বাংলাদেশের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নস্যাত করাসহ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকেও বিপন্ন করতে পারে'।[২৪]

---

[২২] *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৪ জানুয়ারী ২০০৭।

[২৩] *'কালো মেঘে ঢাকা বাংলাদেশের দায়িত্বহীন রাজনীতি*, ড. তারেক ফজল, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জানুয়ারী ২০০৭

[২৪] *প্রাগুক্ত*।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশী রাজনীতির সে উত্তেজনাপূর্ণ ও দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতিতে রাজনীতির সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো আমার উপস্থাপিত সে সমাধান বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পাননি, সুযোগ নেননি অথবা প্রয়োজন বোধ করেননি। আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমার সে প্রস্তাবে মনোযোগী হলে বাংলাদেশ পরবর্তী দু'বৎসরের মহাক্ষতিকর সঙ্কটে পড়তো না।

এ অবস্থায় ১১ জানুয়ারী ২০০৭-এর রাতে বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়, যাকে আন্তর্জাতিক মিডিয়া 'সামরিক শাসনের বাংলাদেশী সংস্করণ' হিসেবে চিহ্নিত করে। ১২ জানুয়ারী তারিখে ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ নতুন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং কয়েক দফায় ১০ জন উপদেষ্টা নিযুক্ত[২৫] হন। এ পর্যায়েও কয়েকজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে[২৬] সমসংখ্যক নতুন উপদেষ্টা নিযুক্ত[২৭] হন। ২৩ মাসের দীর্ঘ 'তত্ত্বাবধায়ক শাসনামলে' নির্বাহী দায়িত্ব পালনে 'প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী' পদে কয়েকজনকে নিয়োগ[২৮] দেয়া হয়।

ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং অনেক ভোটারকে জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ভালো উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর সাথে বেশ কিছু বিতর্কিত ও ক্ষতিকর উদ্যোগ এ সরকার নিয়েছে। একাধিকবার তফসিল পরিবর্তন করে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি?

ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের সরকারকে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা তাদের আন্দোলনের ফসল[২৯] হিসেবে দাবি করেন এবং এ সরকারের যাবতীয়

---

২৫ ইতোমধ্যে তালিকা দেয়া হয়েছে।

২৬ ৮ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে পদত্যাগী ৪ উপদেষ্টা হলেন: ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, তপন চৌধুরী, মেজর জে. অব. ডা. এএসএম মতিউর রহমান ও গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী। তবে দাবি করা হয়, এ ৪ উপদেষ্টা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি বরং তাদের পদত্যাগে বাধ্য বা চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিলো। এর আগে ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে ফ্রান্সের গিমে জাদুঘরে বাংলাদেশের পুরাকীর্তি প্রেরণ কেলেঙ্কারীর নৈতিক দায় স্বীকার করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা ড. আইয়ুব কাদরী পদত্যাগ করেছিলেন।

২৭ ৯ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে নিযুক্ত ৫ উপদেষ্টা হলেন: ড. এএমএম শওকত আলী, মেজর জে.অব. গোলাম কাদের, এডভোকেট এ এফ হাসান আরিফ ও ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

২৮ ১২ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে প্রতিমন্ত্রির মর্যাদায় নিযুক্ত ৩ জন 'প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী' হলেন: চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, ব্রিগেডিয়ার অব. ডা. এম এ মালেক, ড. ম. তামিম। এরপর ২১ জানুয়ারী মন্ত্রির মর্যাদায় মাহবুব জামিলকে এবং প্রতিমন্ত্রির মর্যাদায় মানিক লাল সমাদ্দারকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী নিয়োগ করা হয়।

২৯ ১৩ জানুয়ারী ২০০৭ এর ঢাকার সব *দৈনিক*।

www.pathagar.com

কার্যক্রমের বৈধতা প্রদানের ঘোষণা[৩০] দেন। এ সময়ে (জানুয়ারী ২০০৭ - ডিসেম্বর ২০০৮) শেখ হাসিনা অথবা তার সহযোগী-সমর্থকদের কারো দিক থেকেই বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার সাধনের কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য উত্থাপিত হয়নি। 'দিন বদলের' শ্লোগানসহ উপস্থাপিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে কোনো বক্তব্য দেয়া হয়নি। এটি দলটির বিষয়ে একটি গুরুতর প্রশ্নবোধক প্রসঙ্গ বটে। কারণ নির্বাচনী ইশতেহার একটি দলের ক্ষমতাসীন অবস্থায় বাস্তবায়নযোগ্য অঙ্গীকার-পরিকল্পনার নির্দিষ্ট দলিল। এ দলিলে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কার করার বিষয়ে কিছু না বলায় বা অঙ্গীকার না করায় এ দলটির ইতঃপূর্বেকার এ বিষয়ক আন্দোলন নীতিগত প্রশ্নের আওতায় চলে আসে। বিপরীতে ক্ষমতায় থাকাকালে (২০০১-২০০৬) বিএনপি তত্ত্বাবধায়াক সরকার ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনতে অস্বীকার করলেও দলটি এর নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে একটি অঙ্গীকার করেছে। বলেছে: 'বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রতি পাঁচ বছর পর পর যথাসময়ে যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে'।[৩১]

বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে নির্দিষ্ট করে আগাম কিছু বলেনি। বলেছে 'প্রাসঙ্গিক আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী' আনবে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক পরিভাষায় সংশোধন (এমেন্ডমেন্ট) বলতে পরিবর্ধন, বিয়োজন, প্রতিস্থাপন ও বাতিলকরণ বা রহিতকরণ-এ সবগুলো অবস্থাকেই বোঝানো হয়। এর প্রাথমিক অর্থ, সংশ্লিষ্ট আইনটিতে ছোটো-খাটো কোনো পরিবর্তন করা থেকে শুরু করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রহিত করা পর্যন্ত যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পথই দলটি খোলা রেখেছে। অঙ্গীকার রক্ষার জন্য নীতিগত সুরক্ষা পাবার বিবেচনায় এটি একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ নমনীয় অঙ্গীকার বটে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের কথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি এর কর্তব্যসম্পাদনগত সাংবিধানিক পরিধি ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করেছে বলে দাবি করা হয় এবং এ

---

[৩০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ১৫ মার্চ ২০০৭ তারিখে শেখ হাসিনার ঘোষণা। ১৬ মার্চ ২০০৭ তারিখের ঢাকার সব *দৈনিক*। এমন ঘোষণা তিনি একাধিকবার দিয়েছেন।

[৩১] বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮।

www.pathagar.com

সরকারের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে স্বীকার করা[৩২] হয়। রাষ্ট্রীয় নীতিগত বিষয়ে এ সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সাংবিধানিক অধিকার না থাকলেও এ সরকার প্রচুর সংখ্যক রাষ্ট্রীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ সরকারের আমলে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের আওতায় অনেক রাজনীতিক অন্যায্যভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। জরুরী বিধিমালার আওতায় অযথাই অনেক ব্যক্তি ও রাজনীতিককে গ্রেফতার করা হয় ও জেলে রাখা হয়। দুই প্রধান দলের দুই শীর্ষ নেত্রীকেও জামিনযোগ্য অভিযোগে গ্রেফতার করে দীর্ঘ দিন 'বিশেষ জেলে' আটকে রাখা হয়, সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও জনগণের জীবন যাপন এ সময় গুরুতর দুর্ভোগের মুখে পড়ে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার মধ্যে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্যের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে প্রকট হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজনীতিক বা জনপ্রতিনিধিদের যে প্রাধান্যের কথা গণতন্ত্রে স্বীকার করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সে চেতনার সুস্পষ্ট পরিপন্থী।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সূত্রে বাংলাদেশে কিছু আমলা উপদেষ্টা হবার সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে মহারাজনীতিক বা সুপার পলিটিশিয়ান ভাবার সুযোগ পেয়েছেন এবং আচরণ-উচ্চারণে তারা এমন ভাবনার প্রকাশও ঘটিয়েছেন। এ বক্তব্যটি সাধারণীকৃত হলেও নির্দিষ্টভাবে এর প্রচুর নমুনা উপস্থাপন করা সম্ভব।

সারকথায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাজনীতিক তথা জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্যপূর্ণ মর্যাদার সাথে প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক একটি ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে রাজনীতিক বা জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশী রাজনীতিকদের একটি বড় অংশের অনমনীয় দাবির মুখেই এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিলো। আবার এমন দাবির পিছনে কিছু গ্রহণযোগ্য কারণও ছিলো বটে। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকগণ নির্বাচনকালে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য, ভোটের ফলকে প্রভাবিত করার জন্য এবং ক্ষমতার বাইরের প্রার্থীদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে ন্যাক্কারজনকভাবে সরকারী ও প্রশাসনিক সুবিধাদিকে ব্যবহার করে থাকেন। তাৎক্ষণিকভাবে ১৯৯৪ সালের মাগুরা-২ উপনির্বাচনকে এ জন্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হলেও অন্যসব নির্বাচনেও এর প্রমাণ বিদ্যমান। শেষ বিবেচনায়

---

[৩২] ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের ঘোষণা, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৭।

www.pathagar.com

মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করা তৎকালীন বিরোধী দলের জন্য ন্যায্য ছিলো না বটে। কিন্তু সে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি সরকারী ও প্রশাসনিক সুবিধাদি ব্যাপকভাবেই দলটির অনুকূলে (যা একই সাথে ক্ষমতার বাইরের দলগুলোর জন্য 'প্রতিকূলে' হিসেবে বিবেচ্য) ব্যবহার করেছিলো। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকগণ যেনো সরকারী ও প্রশাসনিক সুবিধাদি নির্বাচনকালে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে না পারেন, সে লক্ষ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি জামায়াত উপস্থাপন করেছিলো বলে দলটি দাবি করে। অন্যদিকে, এরশাদ শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি ছিলো নেহায়েতই ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পদ্ধতি। সেখানে 'স্বীকৃত কোনো মেয়াদপূর্তির' বিষয় ছিলো না, ছিলো সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে অবৈধ হিসেবে দাবিকৃত শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার একমাত্র লক্ষ্য।

এ পর্যায়ে নির্বাচনকালীন ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের পক্ষে সরকারী ও প্রশাসনিক সুবিধাদির অবাঞ্ছিত ও অন্যায্য ব্যবহার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ও উপযোগী পন্থা বের করাই বেশী কাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

নির্বাচনকালে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকগণ সরকারী ও প্রশাসনিক কী কী সুবিধা নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারে ও বিরোধীদের সেগুলো থেকে বঞ্চিত করতে পারে তা অনুধাবন ও চিহ্নিত করা যাক:

ক. বিভিন্ন পর্যায়ের ও মাত্রার উন্নয়ন কার্যক্রম সাধন ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হতে পারে, যা ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীদেরকে ভোট প্রাপ্তিতে সুবিধা দিতে পারে।

খ. প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূল/প্রতিকূল পদায়ন/বদলীর হুমকি/প্রলোভন ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীদের অনুকূলে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ/প্ররোচিত/বাধ্য করা হতে পারে।

গ. প্রশাসনিক/নির্বাহী ক্ষমতার সুবিধা নিয়ে বিরোধী দলীয় কর্মী-সমর্থক-ভোটারদের গ্রেফতার করা/আটকে রাখার হুমকি প্রয়োগ করে নিষ্ক্রিয়/ছত্রভঙ্গ করা ও পলাতক থাকতে ভীত/বাধ্য করা হতে পারে, যা বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ. সরকারের মন্ত্রিগণ এবং অন্যবিধ সরকারী/রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালনকারী সংসদ সদস্য/দলীয় নেতাগণ (রেড ক্রিসেন্ট ও অন্য সব সরকারী/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান/প্রধান হিসেবে) সরকারী যানবাহনসহ অন্যবিধ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার কাজে অংশ নিতে পারেন, যা তাদের অনুকূলে সমর্থন সৃষ্টিতে ও ভোট প্রাপ্তিতে সহায়ক হতে পারে।

ঙ. নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের এবং নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনকারী অন্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় অতিরিক্ত ব্যালট পেপার ছাপিয়ে ভোট চিহ্ন দিয়ে ব্যালট বাক্সে ফেলার ঘটনা ঘটতে পারে বলে সম্প্রতি একটি রিপোর্টে ইঙ্গিত করা হয়েছে[৩৩]। এ কাজটি অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী যে কোনো প্রার্থীর পক্ষেই করা সম্ভব বলে কল্পনা করা যায়।

চ. ভোট প্রদানের গতি কমিয়ে/বাড়িয়ে কোনো প্রার্থীর পক্ষে/বিপক্ষে ভূমিকা রাখা যায়।

ছ. প্রদত্ত ভোট গণনা না করা, গণনা করা ভোট চূড়ান্ত পর্যায়ে যোগ না করা এবং ভোট যোগ করা হলেও তা স্বীকার/ঘোষণা না করে অন্য ফল ঘোষণা করা হতে পারে।

জ. ভোট কেন্দ্র থেকে বিরোধী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদেরকে বের করে দেয়া এবং অথবা তাদেরকেও মামলার মাধ্যমে হয়রানির ভীতি দেখিয়ে এবং অথবা বিশেষ কোনো প্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীদের অনুকূলে ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা করা হতে পারে। ভীতি ও প্রলোভন দেখানোর কাজটি বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের অনুকূলে হওয়াও সম্ভব বটে।

ঝ. ডিজিএফআই-এনএসআই প্রভৃতি সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাও কোনো রাজনৈতিক পক্ষ/প্রার্থীর নেতা-কর্মী-সমর্থকদের অঘোষিতভাবে গ্রেফতার প্রক্রিয়ার আওতায় হয়রানি করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের বিজয়কে নিশ্চিত করতে পারে[৩৪]

চিহ্নিত এ বিষয়গুলোর সম্ভাব্য যথার্থ সমাধান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাহীন এবং অথবা ক্ষমতার অসৎ ব্যবহারের সুযোগবিহীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যবস্থাপনা বা তত্ত্বাবধানেই সম্ভাব্য ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। নির্বাচনকালে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার আওতায়

---

[৩৩] '৩৫ আসনের ফল মহাজোটের পক্ষে আনার কাজ শুরু', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮।

[৩৪] *আওয়ামী লীগের পুরনো খেলা নতুন করে শুরু*, সিরাজুর রহমান, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৯ জানুয়ারী ২০০৯।

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশনকে কর্তৃত্বসম্পন্ন করা এ কাজে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এভাবেই 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার' অরাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক চেতনা বিরোধী ব্যবস্থাপনা থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হতে পারে।

উপসংহার

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনকালে রাষ্ট্রীয় নির্বাহী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারটিকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারই বলা হয়। কারণ এ সরকারটি সংবিধানের ৫৮(গ) অনুচ্ছেদের আওতায় শপথ নিয়েছিলো। এ শপথ এবং একজন প্রধান উপদেষ্টা ও ১০ জন উপদেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যেই এ নির্বাহী কর্তৃপক্ষটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় নীতিসংশ্লিষ্ট নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং চলমান রাষ্ট্রীয় নীতি বদলে দেয়ার মতো প্রচুর সিদ্ধান্ত এ সরকার গ্রহণ[৩৫] করেছে, যা সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে বারণ করা হয়েছে।

রেকর্ড পরিমাণ দীর্ঘ সময় দেশে জরুরী অবস্থা জারি রেখে এ সরকার আরো অনেক কাজ করেছে, যা এ সরকারের সংবিধান স্বীকৃত আওতার বাইরে ছিলো।

বর্তমান লেখক এ সরকারকে 'জরুরী সরকার' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন একটি নিবন্ধে[৩৬]। এর পর বেশ ক'জন পণ্ডিত ও কলামিস্টকে তাদের লেখায় 'জরুরী সরকার' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

এ সরকার বাহ্যত বেশ কিছু সাধু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো। দুর্নীতি বিরোধী অভিযান তার একটি। কিন্তু অগ্রাধিকার নির্ণয়ে প্রজ্ঞাহীনতা, পদ্ধতি নির্ধারণে অদূরদর্শিতা এবং অসংযমী আয়োজনের কারণে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানটি কার্যত রাজনীতি ও রাজনীতিক বিরোধী অভিযানে পরিণত ও পর্যবসিত হয়েছিলো এবং অনিবার্যভাবেই এ সরকারকে তাৎপর্যহীন অগ্রগতির অবস্থানে থেকে সে উদ্যোগের সমাপ্তি টানতে[৩৭] হয়েছে। এতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেশ ক'জন রাজনীতিক অযথা এবং অন্যায়ভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

---

৩৫ ড. ফখরুদ্দিনের 'জরুরী সরকার' ১২২টি অধ্যাদেশ জারী করেছিলো, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৮ জানুয়ারী ২০০৯।

৩৬ 'জরুরি অবস্থায় জরুরি কিছু প্রসঙ্গ', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১ অগস্ট ২০০৭।

৩৭ দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক থেকে সম্পদের বিবরণ চেয়ে আর কোনো ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ না করার ঘোষণা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ জাতীয় সমন্বয় কমিটি-এনসিসি-র প্রধান সমন্বয়কারী ও উপদেষ্টা মেজর জে. অব. এম এ মতিনের 'আর কোনো অভিযোগপত্র' দুদকে প্রেরণ না করার ঘোষণা।

www.pathagar.com

সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা বির্তকের পর ড. ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্থিতিশীলতার অভিজ্ঞতা এবং ড. ফখরুদ্দীন সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অবমাননাকর অভিজ্ঞতার পর বাংলাদেশের রাজনীতিক এবং জনপ্রতিনিধিগণ এ নির্বাচনকালীন নির্বাহী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন কিনা জানা যায়নি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের ঘোষিত ইশতেহারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার রেডিও-টিভি ভাষণে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি এবং নবম সংসদ নির্বাচনে ১৯৯৩-পরবর্তী সর্বোচ্চ বিজয় অর্জনের পর সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেয়া প্রথম প্রেস ব্রিফিংয়েও শেখ হাসিনা ৫ বৎসরের মেয়াদ শেষে আরেকটি নির্বাচনকালীন নির্বাহী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো বক্তব্য রাখেননি। এটি যথেষ্ট বিস্ময়কর ও প্রশ্নযোগ্য বিষয়। কারণ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দল আশানুরূপ সাফল্য অর্জন না করার পর থেকেই তিনি বিদ্যমান সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং এ ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে ও বিজয়ী হবার পরও এ বিষয়ে তার অভিমত হলেও ন্যূনতম মাত্রায় কোনো বক্তব্য ও অঙ্গীকার থাকা উচিৎ ছিলো বলে দাবি করা হয়। অন্যদিকে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে আশাহত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে সব মহলের সাথে আলোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানাবলীতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর অঙ্গীকার করেছিলেন। বিএনপি ও চারদলীয় জোট ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে শুরুতে সমালোচনা না করলেও এ সরকারের শেষ দিনগুলোয় ব্যাপকভাবে সমালোচনামুখর হয়ে উঠে এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় এ সরকার (এবং ইসি) এর সাজানো নক্সা ছিলো বলে তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় দাবি করে।[৩৮] পরবর্তীতে ঐ জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে কী অবস্থান গ্রহণ করে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এ জোট যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে আর সন্তুষ্ট থাকবে না, তা অনুমান করা যায়। কিন্তু এ জোটের পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে যে কোনো প্রস্তাব দাবি উত্থাপন করা সম্ভব হলেও তা, এমনকি, জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন দলের/জোটের (মহাজোট) বিপুলত্বের কারণে তাদের ইতিবাচক মনোভাব ছাড়া আলোচনার জন্য তালিকাভুক্ত করারও সুযোগ নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থা বদলে দেয়ার বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে ক্ষমতাসীনদের আগ্রহের ওপরই নির্ভর করবে। আওয়ামী লীগ চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ক যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ তৈরী হয়েছে।

---

[৩৮] ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের দৈনিকসমূহ।

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট গ্রন্থপঞ্জি

১. খান, মিজানুর রহমান, *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, ঢাকা: সিটি প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৫।

২. ফজল, তারেক শামস, *বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩: শিক্ষকদের ভাবনা*, ঢাকা: মোস্তাফিজুর রহমান, ১৯৯০।

৩. ফজল, তারেক, *বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩: পরিমার্জন প্রস্তাবনা*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

৪. ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধনীর পূর্ণপাঠ, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা: ২৮ মার্চ ১৯৯৬।

৫. রহমান, তারেক মুহম্মদ তওফীকুর, *ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকা: কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ২০০৮।

৬. রহমান, তারেক মুহম্মদ তওফীকুর, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ: ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ২০০৭।

৭. Ahmed, Nizam, *NON-PARTY CARETAKER GOVERNMENT IN BANGLADESH: EXPERIENCE AND PROSPECT*, Dhaka: University Press Ltd., 2004.

৮. Basu, Durgadas, *Commentary on the Constitution of India*, Vol. E, 1981.

৯. Hakim, Mohammad A, *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka: University Press Limited, 1993.

১০. Home, William Douglas, *The Prime Minister*

১১. Jennings, Ivor, *Cabinet Government*, 3rd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

১২. Keith, *British Cabinet System*, 1952.

১৩. Laski, Harold, *Parliamentary Government in England*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1968.

১৪. Loewenstein, Karl, *British Cabinet Government*, New York: Oxford University Press, 1967.

১৫. Polling, Henry, *Winston Churchill*

১৬. Silk, Paul with Walters, Rhodri, *How Parliament Works*, London: Longman, (2nd Edition), 1989

১৭. Wheare, K.C. *Modern Constitution.*

www.pathagar.com

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১: *সিএসি বার্তা* নামের একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ-এর সাক্ষাৎকার

সিএসি বার্তা ধারাবাহিকভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করছে। বর্তমান সংখ্যায় কিছুটা ব্যতিক্রম আনা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ এবং সংসদ সদস্যা বেগম ফরিদা রহমান এর সাক্ষাৎকার প্রস্তুত হলো

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ এর কাছে সিএসি প্রতিনিধির প্রশ্নমালা ছিল নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

২. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশনের বিকাশে কোন্ ফ্যাক্টর (factor) গুলি সহায়ক হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৩. দাপুনিয়ায় মডেল নির্বাচন অনুষ্ঠানের পেছনে কোন্ দর্শন নিহিত ছিল? এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার রূপ রেখা কি ছিল, সংক্ষেপে বলবেন কি?

৪. নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ শোনা যায়। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ? নির্বাচন পরিচালনায় নিরপেক্ষতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়, এ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব কোন চিন্তা ভাবনা আছে কি?

৫. ১৯৯১-র সাধারণ নির্বাচন থেকে যে সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর সচ্ছতা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

৬. 'সিএসি বার্তা'-র মাধ্যমে আপনি কি আহবান জানাবেন?

"নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুণগত মানের ওপর সংসদীয় গণতন্ত্রের সুফল নির্ভরশীল"

১. বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ। লিখিত সংবিধানের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নির্বাহী সরকার, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ যেমনি ভাবে সংবিধানের যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ভাগে বিধৃত হয়েছে, তেমনিভাবে সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এদিক থেকে দেখা যায় যে নির্বাহী সরকার এবং পার্লামেন্ট গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকেও একটি পৃথক সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে।

সংসদীয় গণতন্ত্র একটি 'total concept'। নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুণগত মানের ওপরে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুফল নির্ভরশীল। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদের বিধান বলে সংবিধান এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কাজেই সংবিধান ও গণপ্রজাতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় স্পষ্টতই নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রের চতুর্থ অঙ্গ (fourth organ)। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ৪৮(৩), ৫৫(৬), ১১৯, ১২০ ও ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর সমন্বিত প্রয়োগের আলোকে এর ওপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে, সুতরাং রাষ্ট্রের নির্বাহী সরকারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

সংবিধানের উল্লেখিত অনুচ্ছেদসমূহ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

১১৮। (৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

৪৮। (৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শদান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

৫৫। (৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

১১৯। (১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(গ) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২০। এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

২. সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান বা পরিচালনা বহুলাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রার্থীবৃন্দ এবং তাদের অনুসারীদের সদিচ্ছার ওপর। তাঁরা যদি মনে করেন যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এবং নিজেদের মনমত নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনা করা তাঁদের একটি রাজনৈতিক অধিকার, কিন্তু সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাঁদের কোনই দায়িত্ব নেই, তাহলে কোন নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না।

বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বভার বহুলাংশেই রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে থাকে। মূলত তাদের মনোনীত ব্যক্তিবর্গই সম্মিলিতভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই ঐসব দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনুরূপ একটি সমন্বিত কার্যক্রম গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

www.pathagar.com

৩. বাংলাদেশের বর্তমান অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি, যথা- "জনগণের রাষ্ট্র, জনগণ দ্বারা জনগণের জন্য পরিচালিত হবে", কার্যকরী করা সম্ভব কিনা এটাই মূলত দাপুনিয়া মডেল নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক এদেশের মালিক। তার এই অধিকারটুকু সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা এবং ১৮ বছর উর্ধ্ব জনগোষ্ঠিকে সঠিকভাবে ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করে ভোটাধিকার প্রয়োগের নিশ্চিত পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাকে একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

যিনি ভোটারদের চেনেন তিনি একটি ফরমে একজন ভোটারের জন্ম তারিখ থেকে শুরু করে সনাক্তকরণ চিহ্ন পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এমনকি ভোটারের ছবি, সম্ভব হলে নিজে তুলেছেন অথবা অন্য কাউকে ছবি তুলতে সহায়তা করেছেন, এবং ঐ ছবি নির্দিষ্ট ফরমে লাগিয়েছেন। তার সনাক্তকরণের ওপর ভিত্তি করে ঐ ভোটার সম্পর্কে কম্পিউটারে ডাটা বেইস তৈরী করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ভোটার তালিকা এবং আইডি কার্ড তৈরী ও বিতরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে শিক্ষিত, উদ্যোগী যুবক-যুবতীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ভোটার ক্লাব তৈরি করা হয়। তাদের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচনী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। যেহেতু ভোটার নিবন্ধিকরণ থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনা পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাদি ঐ গ্রামের লোকদের ওপরই প্রকৃতপক্ষে ছেড়ে দেয়া হয়, সেজন্য তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠে। ভোটাররা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে যেমন উদ্যোগী হন, তেমনিভাবে ভোট প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা, নিরপেক্ষতা এবং সচ্ছতা বজায় রাখতে তারা সচেষ্ট থাকে। অর্থাৎ ভোট প্রক্রিয়া যদিও একটি জটিল প্রক্রিয়া, তা সত্ত্বেও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মাঝে পুরো দায়িত্ব ভাগ-বন্টন করে দিয়ে তাদেরকে মূল প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার ফলে তাদের মধ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করার মানসিনকতা (sense of participation) গড়ে উঠে এবং কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য তারা দায়িত্বশীল হয়।

৪. প্রজাতন্ত্রের ধ্যান ধারণায় ১৮ বর্ষরের উর্ধ্বে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। স্পষ্টতই তিনি কোন দলীয় বা নির্দলীয় প্রার্থীকে ভোট দিবেন। সেদিক থেকে কাউকে নিরপেক্ষ ধরে নেয়া খুব একটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তির মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা কল্পনাপ্রসূত বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই এমন একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা দরকার যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরপেক্ষ না হলেও প্রক্রিয়াগত কারণে নির্বাচনের ফলাফলকে তাদের ইচ্ছামুযায়ী প্রভাবিত করার কোন সুযোগ থাকবে না। এটাই উন্নত বিশ্বের নির্বাচনী স্ট্রাটেজী। মোট কথা, প্রক্রিয়াটিকে নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় উন্নীত করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনায় প্রায় ৬ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হয়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী, আধা সরকারী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীদের নির্বাচন পরিচালনা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয় নির্বাচনে দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে অনেকেই নির্বাচন পরিচালনার ঝুঁকি প্রায় নিতে চান না; অনেকটা জোর জবরদস্তি করেই তাদের নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োগ করা হয়। নির্বাচনী আইন কানুন সম্পর্কেও খুব সন্তোষজনক ভাবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভবপর হয় না। সাধারণ অভিজ্ঞতা (common sense) দিয়ে তারা তাদের মত

www.pathagar.com

করে কোনভাবে নির্বাচন কাজ শেষ করেন। অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের দায়-দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করার সুযোগ থাকে না।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে হলে নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক অর্থাৎ গ্রাম-মহল্লা ইত্যাদি ভিত্তিক নির্বাচনী স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাদের মাঝে নাগরিক মূল্যবোধ, কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচনী আইন কানুন সুন্দরভাবে প্রয়োগের মন মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব। অবশ্য এ জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক; একা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এটি সম্ভব নয়।

কম্পিউটারের মাধ্যমে উক্তরূপ স্বেচ্ছাসেবী দলের ডাটা বেইস তৈরী করে তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবীর আই ডি কার্ড দিয়ে নির্বাচন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যায়। এভাবে ৬ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী তৈরি হলে তাদের প্রত্যেকের ওপর একশত জন ভোটারের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তারা ঐ সকল ভোটারের স্থানীয় পর্যায়ে নিবন্ধীকরণ সম্পর্কিত কার্যাদি পরিচালনায় সাহায্য করবে এবং নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকেও সহায়তা দেবে। তাদের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুণগত মান বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোন, নির্বাচনে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের ফলে একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এবং ঐ পরিবেশে জনমনে নির্বাচনের শৃঙ্খলাবোধ জাগবে। এতে কারো ইচ্ছা হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কলুষিত করার অপপ্রয়াস আপনা আপনি রোধ হবে। কেননা নির্বাচনের বহু পূর্ব হতেই নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করার মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকবে।

৫. ১৯৯১র সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তব্যে এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সুস্পষ্টভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে যে রাজনৈতিক মতবাদে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনকে সকল প্রকার ব্যক্তি স্বার্থের উপরে রেখে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্বাচন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব। বিভিন্ন সময় এ উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করতে দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট মহলকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচনে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ছোটখাট ত্রুটি, সংশ্লিষ্ট আইনের অপর্যাপ্ততা এবং নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ধাপগুলিতে স্বচ্ছতা পরিস্ফুটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দেশবাসী তাদের অতীত ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে নির্বাচনকে ব্যক্তি স্বার্থের ওপরে স্থান দিয়ে সম্মিলিতভাবে দাপুনিয়া ভোটার ক্লাবের মত সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২: জাতীয় সংসদের ৯২ মাগুরা-২ নির্বাচনী এলাকার শুন্য আসনের ফলাফলের বিষয়ে আওয়ামীলীগের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে ২৭শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে প্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের আদেশ

রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ৯২ মাগুরা-২ জাতীয় সংসদ আসনের উপ-নির্বাচনের নির্বাচনী রিটার্ণ, নির্বাচনে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত নির্বাচন কমিশনের একজন উপ-সচিব, দুইজন উপ-নির্বাচন কমিশনারসহ ২৬ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের প্রেরিত সকল প্রকার প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনসমূহে ৩টি স্থগিত ঘোষিত ভোটকেন্দ্র ব্যতীত অপর ভোটকেন্দ্র সমূহে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আইন ভংগ করে বা অমান্য করে ভোট গৃহীত হয়েছে তেমন কোন বিষয় প্রতিফলিত হয় না। তাদের মতে ভোট কেন্দ্রগুলিতে বিধি সম্মতভাবেই ভোটগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানায় ৪৪টি কেন্দ্র, শালিখা থানায় ৩৯টি কেন্দ্র, মাগুরা সদর থানায় ৪টি ইউনিয়নে ১৯টি কেন্দ্র, অর্থাৎ সর্বমোট ১০২টি ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। মোহাম্মদপুর থানা থেকে ৪টি রাজনৈতিক দলের যথা আওয়ামী লীগের জনাব শফিকুজ্জামান, জাতীয় পার্টির এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর জনাব গোলাম আকবর হোসেন ও ইসলামী ঐক্য জোটের মওলানা মাহবুবুর রহমান প্রার্থী হয়েছেন। শালিখা থানা থেকে কেবলমাত্র বি এন পি-র কাজী সলিমুল হক এ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। মোহাম্মদপুর থানায় যে ভাবে ৫জন প্রার্থীর মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়েছে শালিখা থানায় তেমনটি হয়নি। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিক হারে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা পরিলক্ষিত হয়। শালিখা থানার ৩৯টি ভোটকেন্দ্রে উভয় প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট গণনায় না আনলেও জনাব কাজী সলিমুল হক মোহাম্মদপুর ও মাগুরা সদর থানায় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব শফিকুজ্জামান থেকে কয়েক হাজার ভোট বেশী পেয়ে থাকেন।

বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে শতকরা ৯৬%, ৯৭%, ৯৮% ভাগ ভোট কাস্ট হয়েছিল বলে পরিলক্ষিত হলে ভোট সংখ্যার অস্বাভাবিক আধিক্য দেখে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষে এ সব কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সে আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে মামলা দায়ের হলে শেষ পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কমিশনের আদেশ বাতিল করে দেন। আপীল বিভাগ এইমর্মে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, আইনতঃ সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করে কমিশন কর্তৃক গঠিত ইলেকশন ট্রাইবুনালের পক্ষেই এরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক হইবে। আপীল বিভাগের এরূপ আইনের ব্যাখ্যা সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনসহ রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষই মানতে বাধ্য।

২০-৩-৯৪ তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শাহ এ. এম. এস. কিব্রিয়া, মেম্বার আওয়ামী লীগ এডভাইজারী কাউন্সিল এইমর্মে ইংরেজীতে লিখিত একটি অভিযোগ পেশ করেন যে ভোটগ্রহণ কার্য্যক্রম চলাকালীন সময় বি এন পি দলের কর্মীরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মোহাম্মদপুর থানার পানিঘাটা ও রাহাতপুর ভোটকেন্দ্র সহ শালিখা থানার ছন্দ্রা, নওখোলা, কৃষ্ণপুর , তালখরি, ভাটোয়াইল, খৈপাড়া, কালিবাড়ী, শতখালি, ধনেশ্বরগাতি, সিংড়া বাজার, আমিয়ান বাজার ভোটকেন্দ্রগুলি দখল করে নেয়। সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে দেয়

www.pathagar.com

নাই। আরও উল্লেখ করেন যে ভোটের পূর্ব রাত্রিতে বেশ কিছু এক শ্রেণীর ভোটারদেরকে মারধর করা হয়। অভিযোগ পত্রে নির্বাচন কমিশনকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান হয়। টেলেক্স এর মাধ্যমে অভিযোগ পত্রটি হুবহু তৎক্ষনাত রিটার্নিং অফিসারের প্রতিবেদনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রিটার্নিং অফিসার হইতে প্রাপ্ত টেলেক্স প্রতিবেদনে দেখা যায় নির্বাচনের দিন উল্লেখিত কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে কোন অভিযোগ তাহার নিকট উত্থাপন করা হয় নি।

এটা লক্ষণীয় যে, উল্লেখিত কেন্দ্রসমূহে প্রদত্ত ভোট যদি কোন প্রার্থীর পক্ষেই গণনা না করা হয় তা হলেও অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের প্রদত্ত ভোটের হিসেবে কাজী সলিমুল হক তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে অনেক ভোট বেশী পেয়ে থাকেন।

আরও একটি প্রশ্ন এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৩টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকা অবস্থায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা আইনসিদ্ধ হইবে কিনা। সংশ্লিষ্ট The Representation of the People Order, 1972 এর ২৫ (২) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নথিতে রক্ষিত বিষয়াদির প্রেক্ষাপটে ঐ সকল স্থগিত ভোটকেন্দ্রে পুনঃ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব বিধায় রিটার্নিং অফিসার আইনানুগ ফলাফল ঘোষণা করে নির্বাচনী রিটার্ণ দাখিল করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত The Representation of the People Order, 1972 আইনে নির্বাচন কমিশনকে এমন কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই যে কমিশন সরাসরি সাক্ষী সাবুদ নিয়ে নির্বাচনী অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার করে নির্বাচন বাতিল করতে পারে। তা'ছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৫ অনুচ্ছেদের (খ) উপ-অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত আইনের বিধান মতে শুধুমাত্র নির্বাচনী দরখাস্তের মাধ্যমেই (Election petition) সংসদের কোন নির্বাচনকে প্রশ্ন করা চলে। আইনটি নিম্নরূপ:

১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

× × × × × ×

(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরুপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

সুতরাং সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে নথিতে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজের ভিত্তিতে এটা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে এ পর্য্যায়ে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের জন্য আইনের দিক থেকে কোন বিকল্প নাই। সুতরাং প্রেরিত ফলাফল আইনানুগ গেজেটে প্রকাশের জন্য পাঠানো হোক।

স্বা./-
(বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ)
২৭-৩-৯৪
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২ক: মাগুরা-২ উপনির্বাচনের বৈধ্যতা বিষয়ে আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পত্রের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের গৃহিত কার্যক্রমের বিবরণ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ২৭শে মার্চ, ১৯৯৪ ইং

১৩ই চৈত্র, ১৪০০ বাং

জাতীয় সংসদের ৯২ মাগুরা-২ নির্বাচনী এলাকার শুন্য আসনে ২০ শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বৈধতার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন পূর্বক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব শফিকুজ্জামান বাচ্চু, পিতা: মো. আসাদুজ্জামান এর পক্ষে ব্যারিষ্টার কে. এস. নবী ও অন্যান্য অদ্য ২৭শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একটি দরখাস্ত দাখিল করেন। উক্ত দরখাস্তটি মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সমীপে উপস্থাপন করা হইলে তিনি উহাতে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন:

"It is too late to move this petition for consideration on merits as the order has already been passed for publication of the election result. But as per desire of the learned counsel Mr.K.S.Nabi, for the petitioner let this petition be put up on 29-3-94 at 11-00 a.m. for hearing on its maintainability, The Learned Counsel be accordingly informed".

প. ১৬৩-১৬৯/পত্রাংশ (প্রাপ্তি)

Order passed by the Election Commission dated 29-3-94 in respcct of election held on 20th March, 1994 in Constituency No. 92 Magura-2

96. The Learned Counsel Mr. Masood R. Sobahan appearing for the petitioner Mr. Shafiquzaman Bachu submits that he has instruction not to press the petition submitted on 27.3.94 and has prayed for its disposal for non-prosecution.

97. In the previous order the office was directed to putup the petition today for hearing on its maintainability as desired by the learned Counsel Mr. K.S.Nabi.

98. Be that as it may when attention of the learned Counsel was drawn to the constitutional mandadte, provided in Article 125 (b) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh and to the procedure for challenging an election of Jatiya Sangshad of Bangladesh, the learned Counsel could neither show from the constitution itself nor from the relevant Articles of the Representation of the People Order, 1972 or any other legal authority, that inspite of such Constitutional mandate, there are scope under the Law to Challenge result of election, when the authority under the Representation of the People Order, 1972 to declare the result has been specifically vested in the Returning Officer and the Election Commission is to arrange only for its publication in the gazette, unless there appears any gross clarical error.

www.pathagar.com

99. Normally, I would not make any comment on the allegations made in the petition, where the petitioner himself has sought for dismissal of the petition for non-prosecution, but in the instant case some statements have been made, specially in para 10 of the petition, refering me in connection with the elecdtion in question, to the effect that I made the following quoted statements to the newsmen at Magura Circuit House :

"Under the prevailing situation, It appears to me that a free and fair election cannot be expected. The situation seems to be unpleasant. I do not want any untoward incident to occur in my presence and I do not want to take any responsibility of it." and that the same were published in different news paper on 20.3.94 and I did not refute the same." With reference to the statements under quotation I like to mention that I did never make any statement whatsoever to the Newsmen at Magura Circuit House in connection with Magura bye-election, not to speak of making the above quoted statements to any newsman. I did neither sit nor I talked even for a moment with any newsman at Magura so long I had been there. On 20-3-94 some Journalists met me at my office and I emphatically denied making of any such statement to any Newsman at Magura Circuit House. It was also published in different newspapers on 21.3.1994.

100. With this observation the petition is filed as not being pressed and maintainable. The parties to the petition be accordingly informed.

(Justice Mohammad abdur Rouf)
Chief Election Commissioner

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৩:

সারণি-১: ভোটকেন্দ্র পর্যায়ের প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক পেশকৃত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের ফলাফলের একত্রিভূত বিবরণী

৯২ মাগুরা-২ শুন্য আসনে নির্বাচন-৯৪

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম ও নং	এম. নিতাই রায় চৌধুরী (লাঙ্গল)	কাজী সালিমুল হক (ধানের শীষ)	গোলাম আকবর হোসেন (দাঁড়িপাল্লা)	মুন্সী মাহবুবুর রহমান (মিনার)	শফিকুজ্জামান (নৌকা)	বৈধ ভোট	বাতিলকৃত ভোট	মোট প্রদত্ত ভোট	মোট ভোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	বাবুখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১	৮০৬	৩০১	২০৩	২	২৬৭	১৫৭৯	২৪	১৬০৩	২৪১৬
২.	চালমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২	৫৫৩	৩০৬	২৩৪	৭	৩৩০	১৪৩০	৭	১৪৩৭	২০৯৩
৩.	চুক্কারপাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(পুরুষ)-৩	৩৫৮	১৪৭	২৪	০	৫৩৬	১০৬৫	১	১০৬৬	১৫৭৮
৪.	চুক্কারপাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(পুরুষ)-৪	২৭৯	১৩৭	১৭	০	৪৮২	৯১৫	১৬	৯৩১	১৪৯৬
৫.	ছুমুরশিয়া উচ্চবিদ্যালয়-৫	৭৬৮	২০৯	১০৪	১২	৫২৯	১৬২২	১৪	১৬৩৬	২৪৮৩
৬.	কেরিমনার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬	৬৩০	২৯৮	৯৮	২	৩০৯	১৩৩৭	১৭	১৩৫৪	১৯১০
৭.	বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয় (পুরুষ)-৭	৩২৯	৩৩২	১০১	৩	৫৯৭	১৩৬২	০	১৩৬২	১৯২৯
৮.	বিনোদপুর মমীবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়-(মহিলা)-৮	২৬৯	৪১১	৬৬	৫	৪৭৩	১২২৪	০	১২২৪	১৭৬১
৯.	খালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৯	৪৪৯	২২৯	১০২	৮	৫৭৬	১৩৬৪	৮	১৩৭২	১৯২৩
১০.	উকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১০	৪৮৫	৪০২	২৮৩	২২	৬৬১	১৮৫৩	১২	১৮৬৫	২৬৭১
১১.	ঘুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১১	৪৪৪	৫৫৭	১৬৬	৩৫	৯০১	২১০৩	১৬	২১১৯	২৯০৬
১২.	কানুটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-১২	৫৫০	২৪৭	৫৫	১৬	৭৫১	১৬১৯	৫	১৬২৪	২২০৪
১৩.	চিত্ত বিশ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৩	৫৩৮	৪৩৯	১৩৮	৫	৩৪৫	১৪৬৫	১৩	১৪৭৮	২৩৪২
১৪.	কুমরুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৪	৩৮৭	১০৭	১৪৭	৫	১৪২	৭৮৮	৭	৭৯৫	১২৫২
১৫.	দীঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৫	৯৪১	২৮১	২৫৫	২০	৫৮৪	২০৮১	২১	২১০২	২৯৫৯
১৬.	পাল্লা উচ্চ বিদ্যালয়(পুরুষ)-১৬	৪৫৮	২২৩	৯০	৮	২২৫	১০০৪	০	১০০৪	১৫৫৪
১৭.	পাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (মহিলা) ১৭	৩৮৮	২৬৭	৫১	৭	১৯৪	৯০৭	২০	৯২৭	১৪৯৯
১৮.	মাওভাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৮	৩৯২	৫০৬	১৭৫	১৫	৬৮৮	১৮৭৬	২০	১৮৯৬	২৬২৩
১৯.	রাজাপুর রাহাতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৯	৬০	১১৩৭	৬৬	৯	৫৯৮	১৮৭০	২৫	১৮৯৫	২৯৬৭
২০.	রাজপাট উচ্চ বিদ্যালয়-২০	১৫২	৬০৯	৩০৭	৫	৮১৫	১৮৮৮	১৪	১৯০২	২৭০৮
২১.	বকিয়ারদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-২১	৩৩০	৩৬৭	২৫০	১	৫৫১	১৪৯৯	১১	১৫১১	২০৬৬
২২.	গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়-২২	৪৩৯	৩১৩	১৬৬	৯২	৩০৭	১৬১৬	৩৪	১৬৫৯	২৪২১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৩.	মিয়াহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৩	১৬৮	২৯০	১১২	১৩	১৬১	৯৩৪	৬	৯৪০	১০৮৮
২৪.	মৌলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৪	৫৯৩	৪২১	৯৬	৯	৩৬৩	১৪৮২	০	১৪৮২	২১৯০
২৫	বড়ুরিয়া সিনিয়র মাদরাসা-২৫	৫৪৩	৬৬৯	১৩৮	২১	২৪১	১৫৯২	০	১৫৯২	২৬১৬
২৬.	হরেকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৬	২৬৫	৬৩১	৭১	১২	৪১৮	১৩৯৭	৮	১৪০৫	২১৬০
২৭.	উত্তর কুচবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৭	৮৩৪	৩৯৩	১০৯	৫	৫৯৪	১৯৩৫	২০	১৯৫৫	২৯৫২
২৮.	মহম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস-২৮	৫২৯	১৩৩	২৪	৭	৪৩৭	১২৩০	১০	১২৪০	১৯৯৮
২৯.	ধোপাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৯	৬২১	৪৬৮	১৭৩	৯	২৯৭	১৫৬৮	৪	১৫৭২	২৩০৬
৩০.	মহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়-৩০	৭১০	৪৩৫	১২৫	১০	৫১০	১৭৯০	১৩	১৮০৩	২৮০৯
৩১.	রায়পাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩১	৪৮৪	৪৫৫	৪৩	৫	৩৮৪	১৩৭১	০	১৩৭১	২৬৪৮
৩২.	পলাশ বাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়-৩২	৮৯	৪৯৩	৭৬	৭	৯৯৮	১৬৬৩	১১	১৬৭৪	২৭৪৫
৩৩.	বলরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৩	২১	৪৩১	৮১	৪	৭৫১	১২৮৮	৮	১২৯৬	১৯০৭
৩৪.	যশোরকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৪	৭৩	৭৫১	১৪০	২	২৭৭	১২৪৩	৪	১২৪৭	২০৭২
৩৫.	ঝামা উচ্চ বিদ্যালয়-৩৫	৬৪	৬৬৮	৯৭	১৭	৬৪৫	১৪৯১	১৮	১৫০৯	২৪৪০
৩৬.	বন্দগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৬	১৬৪	৪৭০	৩৪৯	৭	৬০৮	১৫৯৮	৯	১৬০৭	২৪১৭
৩৭.	রোনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৭	১১৮	৬০৯	৮৯	২	১২৯	৯৪৭	১	৯৪৮	১৬২৩
৩৮.	কাশিনাথপুর রেজিঃ বে- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৮	৪	৪০৯	৫৯	২	৪৭৪	৯৪৮	১০	৯৫৮	১৬২৭
৩৯.	নগাটা উচ্চ বিদ্যালয়-৩৯	৬৮	১০৬৪	৩৭	১১	৩৮৬	১৫৬৬	০	১৫৬৬	২৩০৩
৪০.	বেজড়া মারার্দয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪০	৭	৮১০	২৮	৭	৯৭	৯৪৯	৪	৯৫৩	১৪৬৮
৪১.	পানিঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪১	৪৩	২৩৭৬	২৯	১৪	২৮	২৪৯০	১৯	২৫০৯	২৮১১
৪২.	ফুলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪২	৯৭	৫৭৪	১৬	২০	২৬৮	৯৭৫	০	৯৭৫	১৩৫২
৪৩.	…সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৩	২৪	৯২২	২০	১	৮১৬	১৭৮৪	১৫	১৭৯৯	২৪৮৩
৪৪.	মবারকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৪	১	১৭৪০	৬	১	২৯	১৭৭৮	২০	১৭৯৮	২১২৯
৪৫.	খিলগাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৫	১৫৭	৮৪১	৫৫	১৬	৫৬৪	১৬৩৩	১৬	১৬৪৯	২১১৫
৪৬.	ধনেশ্বরগাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৬	১৫	৭৬৮	৩২	১৭	৬২৬	১৫০৮	৪	১৫১২	১৯৮২
৪৭.	মহাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৪৭	৫৪	১৯৫৬	৪৯	১০	১৩৩	২২০২	৪৫	২২৪৭	২৬১৭
৪৮.	শ্রীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৮	২	৯০৩	০	০	৭৩	৯৭৮	২২	১০০০	১০৭৫
৪৯.	…সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৯	১৪	১৩১৫	৩৬	৬	৭৪	১৪৪৫	৯	১৪৫৪	১৯৭৫
৫০.	শিকড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৫০	৮	১৮৩৩	৩৩	৮	১৬৭	২০৪৯	০	২০৪৯	২২১৫
৫১.	চতুরবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫১	১৭২	৭৮১	১৮	৮১	১০৯	১১৬২	১২	১১৭৪	১৫০৩
৫২.	…সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫২	৭৮	১৪১১	৬০	১৫	২৭২	১৮১৭	৯	১৮২৬	২৫২৯
৫৩.	…পুর ইসলামিয়া … মাদ্রাসা-৫৩	১১১	৯৮৬	২৫	৩৪	২০৪	[illegible]	০	১৩৭৫	১৫৮১

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫৪.	দক্ষিণ [illegible] বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫৪	৮৫	৫৮৪	১১	১২৫	৩২০	১১১১	১১	১১২২	১৬৬৮
৫৫.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(পুরুষ)-৫৫	৪৪	১১৭	৮২	১০৭	২৩১	১৪১১	২	১৪১৩	১৮০৬
৫৬.	[illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয়(মহিলা)-৫৬	২১	১০২৪	২৫	৭৮	১৭১	১৩৬৯	৯	১৩৭৮	১৭৬১
৫৭.	[illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৫৭	২৯৫	৭৩৫	২৬	৫৯	৬১১	১৭৩৬	১৭	১৭৫৩	২৩৯৪
৫৮.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫৮	১৯৮	৮৩৭	৪৩	৫১	৫৯৮	১৭২৭	১৯	১৭৪৬	২২২৯
৫৯.	[illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৫৯	৬৬	৮০৯	২৯	৩১	৫৬৭	১৫০২	৮	১৫১০	২১৫৪
৬০.	[illegible] বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬০	৩৫	৭৩৮	২	১১	১৮৫	৯৭১	৮	৯৭৯	১১৩৭
৬১.	কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬১	৪১	৮৭১	১০	৩১	২৪২	১১৯৫	৭	১২০২	১৪৫২
৬২.	জুনারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬২	৩০	৮৩৩	৩৭	১৫১	৩৩১	১৩৮৩	১৮	১৪০১	১৫৮৯
৬৩.	পুখুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬৩	১৫৪	৬৬৫	৫৮	১৮	৫৭৩	১৪৬৮	৪	১৪৭২	১৮৯১
৬৪.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(পুরুষ)-৬৫	১৭৩	৫৬৭	১২৪	৮৬	২৫৮	১২০৮	২	১২১০	১৫৯৬
৬৫.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(মহিলা)-৬৬	১১৩	৫০৩	৯৮	৪৯	২০১	৯৬৪	১৬	৯৮০	১৫১৬
৬৬.	[illegible] সিনিয়র মাদ্রাসা-৬৭	৪৬	৫৬৭	১৭৬	৯১	৫৩	৯৩৩	৮	৯৪১	১০৪৯
৬৭.	[illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৬৮	৫৫	৮৬৫	২০	৩০৬	১২৩	১৩৬৭	৯	১৩৭৬	১৮৩১
৬৮.	হরিণপুর দাখিল মাদ্রাসা-৬৯	১৭৩	৯৩৭	৮৮	১৩২	২০৬	১৫৩৬	১৩	১৫৪৯	২১৬৪
৬৯.	বয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭০	৫৯	১২৪৭	১৬	৭৫	৩৫১	১৭৪৮	১০	১৭৫৮	২০৯৬
৭০.	কাউলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭১	৭১০	৪৯৮	৩৪	৩১	১৫৮	১৪৩১	০	১৪৩১	২০৩৫
৭১.	হাজরাহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭২	১	২১৮০	১	৪২	১৯৮	২২৪৩	১৬	২২৫৯	২৫৩৪
৭২.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৩	২০	১০৫৪	১০১	১১৯	৫৯১	১৮৮৫	৮	১৮৯৩	২৩৬৮
৭৩.	দক্ষিণ [illegible] বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৪	২৭	৯১৫	৯৫	৬৭	৭৩১	১৮৩৬	৯	১৮৪৫	২৪০০
৭৪.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৬	২৩	১১৪৬	৪৩	১২	৮১১	২০৩৫	৯	২০৪৪	২৪১৯
৭৫.	[illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৭৭	৭৪	১৪৫১	৪১	৪৫	৪০০	১১১৭	৬	২০০৩	২৪৭৬
৭৬.	[illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৭৮	১৮	১৪১৫	২	১৫	২৮১	১৭৩১	৬	১৭৩৭	১৮৬১
৭৭.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৯	১৩	১০৫৭	১৪	২	৫৬	১১৪২	০	১১৪২	১২৯২
৭৮.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮০	৮	১১৪০	৭	২	১৪	১১২২	০	১১২২	১২৮৮
৭৯.	[illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৮১	৬	১০৯০	৪	১	৪৮	১৪৪৯	৮	১৪৫৭	১৫৮০
৮০.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮২	০	১১০১	০	০	০	১১০৯	০	১১০৯	১১৯৫
৮১.	[illegible] সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮৫	২	২০৮১	০	১	১	২০৮৫	১০	২০৯৫	২১৭৩
৮২.	[illegible] উচ্চ বিদ্যালয়-৮৬	১১৪	[illegible]	২৯	৯	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮৩.	কাশিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮৫	৮১	৭১৭	২৫	১৪	২০৪	১০৫১	২	১০৫৩	১৫৬৫
৮৪.	দুর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮৬	৩২	৪৭৫	৮০	১১	১৯৪	৮০২	৫	৮০৭	১২১৮
৮৫.	পশারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮৭	৮৬	৮২৫	৫৭	৪	৭৪৫	১৭১৭	১৪	১৮৩১	২৫১২
৮৬.	বাহেরবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮৮	২৪৬	৬৬৯	১৩৬	১২২	৩১৫	১৪৮৮	০	১৪৮৮	২২৯৯
৮৭	সংবোচখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮৯	১৫	৭০৪	৩০	১০	৪৩৩	১২০২	০	১২০২	১৮৯৪
৮৮	গোয়ালবাথান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৯০	৫৫	৫৭৮	২১	১৩	৬১২	১২৭৯	০	১২৭৯	১৭৯৫
৮৯	বড়জোকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৯১	৪৬	৬৮২	২২	৭	৬৩১	১৩৮৮	৮	১৩৯৬	১৮৩১
৯০	বাতীজোড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৯২	১৮	২১৭	১৮	০	৬৭৪	৯৩৭	৩	৯৪০	১৪১৫
৯১	বেরাইদপশ্চিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়-৯৩	২৯৩	৬৫৫	৯৩	১২	৩৫২	১৪১৩	৯	১৪২২	২২২৫
৯২	বেরাইদপশ্চিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৯৪	১৪৬	১৫৯	১০	১	৪৩৬	৭৫২	৪	৭৫৬	১০১২
৯৩	বাসমডাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৯৫	১৩১	৩৭৬	১২	১	৮২৯	১৩৫০	৭	১৩৫৭	১৮৮৫
৯৪	পারপশ্চিম উচ্চ বিদ্যালয়-৯৬	৫৭	৫৬৬	৪৩	১১	৪৫৬	১১৩৩	০	১১৩৩	১৬৪২
৯৫	বড়ুন্দাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(পুরুষ)-৯৭	১১৬	৩৪১	৮০	৬১	৬৯০	১২৬৮	২৭	১২৯৫	১৯১২
৯৬	বড়ুন্দাই জুনিয়র হাইস্কুল (মহিলা)-৯৮	৬৩	২৮৪	৩৬	৪৮	৫৭৩	১০০৩	০	১০০৩	১৮৬৩
৯৭	আড়ুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৯৯	৩১১	৮১৭	১৪৮	২৭৬	৩৫৭	১৯০৯	২০	১৯২৯	২৮৭৭
৯৮	দুলগ্রাম নতুনগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১০১	৬১	৯৬৬	৪৩	৫	৬২৮	১৭০৩	৪	১৭০৭	২২২৮
৯৯	গান্ধী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১০২	১০৮	৭৪৭	১১৬	৭	৪৬৬	১৪৪৪	০	১৪৪৪	২১৩৯
	মোট	১০৭৯৪	৭৩২৪৮	৭৭৩২	৩১২২	৩৯৬২৫	১৪৪৫২১	৯১৮	১৪৫৪৩৯	২০০৭৫১

	নিম্ন উল্লেখিত ৩ (তিন) টি কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত হলেক									
১	বরইচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬৪	০	০	০	০	০	০	০	০	১৫৮৭
২	ছাটবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৫	০	০	০	০	০	০	০	০	২২৮৮
৩	কুড়িয়া হাইস্কুল-১০০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৯৩৮

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৪

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১

দৈনিক জনকণ্ঠ

বগুড়া: বৃহস্পতিবার, ৫ মে ১৯৯৪ ইংরেজী

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক ॥ ফয়সালা জনতা থেকেই আসুক

তারেক ফজল

গতকাল ৪ মে থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া অধিবেশন বয়কটরত বিরোধী দলের প্রতি অধিবেশনে যোগদানের আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য করার জন্য বিরোধী দলের যে কোন প্রস্তাব সংসদেই আলোচনা করা উচিত। রাষ্ট্রায়ত্ব বার্তা সংস্থা বাসস'র সাথে সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে ইতঃপূর্বে জাতীয় রাজনীতির এক ক্রান্তিকালের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, 'একটি অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনই একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের চাইতে যদি একটি অনির্বাচিত ও মনোনীত সরকার অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে তা হবে জনগণের রায়ের প্রতি আস্থাহীনতার শামিল।' বাসস'র সাথে ৩০ এপ্রিলের এই পরিকল্পিত সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী আরও কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন, যা বর্তমান মূল্যায়নে প্রাসঙ্গিকভাবে আসতে পারে। ৩০ এপ্রিলেই অধিবেশন বয়কটরত বিরোধী দলগুলো এক যৌথ বৈঠকের পর বলেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তারা একমত। মাগুরা উপনির্বাচনে অংশ নেয়াসহ অন্যান্য কিছু বিষয়ে তারা আলোচনা করেছেন এবং এ বিষয়ে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৩ মে '৯৪ সন্ধ্যায় জানান। জাতীয় রাজনীতির এমনি এক বাস্তবতায় কিছু বিষয় মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে। ইতঃপূর্বে সরকারের এক মুখপাত্র দাবি করেছেন, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানই মূল গ্যারান্টি। সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত অবাধ নির্বাচনের পরও ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা আছে, যা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি আয়োজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ কথার সবই খাঁটি কথা এবং তাত্ত্বিকভাবে হলেও যৌক্তিক কথা। ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন, পৌর ও ইউপি নির্বাচন এবং বেশ ক'টি উপনির্বাচন মিলিয়ে বর্তমান নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তাদের প্রতি দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর একটি বিরল আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। গত ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই আস্থার ক্ষেত্রে ব্যত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মাগুরা উপনির্বাচন এবং ফলকে ক্ষমতাসীন দল ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্য কোন দলই (৪টি দল) স্বীকার করেনি বা গ্রহণ করেনি। সম্মিলিতভাবে দলগুলো এই নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপি, সন্ত্রাস, প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নির্বাচনী এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়ার অভিযোগ করেছে। তারা দাবি করেছে, বিএনপি ক্ষমতায় থাকায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা রদবদল, সাজাপ্রাপ্ত আসামী ও গ্রেফতারকৃত সর্বহারাদের ছেড়ে দেয়ার মতো কাজগুলো করেছে এবং তা স্পষ্টতই দলটি ক্ষমতসীন থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

মাগুরা উপনির্বাচনের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান থেকেও কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯১ এর নির্বাচনে সাবেক মন্ত্রী জেনারেল (অব) মজিদ-উল-হক বিজয়ী মরহুম আসাদুজ্জামানের কাছে ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। ঠিক ৩ বছর পর বিজয়ী আসাদুজ্জামানের উত্তরাধিকারী নবাগত প্রার্থী কাজী সলিমুল হক কামালের কাছে ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

www.pathagar.com

বিএনপি দাবি করেছে, প্রথমবারের মতো শালিখাবাসী তাদের নিজেদের এলাকার একজন প্রার্থী পাওয়ায় তার পক্ষে সবাই জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং ভোট দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিগত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে না পারায় মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপি'র বেশ কিছু নেতা-কর্মী, যাদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রী এবং এমপি ছিলেন, একনিষ্ঠভাবে নির্বাচনী প্রচারকাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং জনগণের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। দুটো যুক্তিই কম-বেশি গ্রহণযোগ্য বটে। কিন্তু যা মানা কষ্টকর তা হলো মোট ভোটারের প্রায় ৭৩ ভাগের ভোট প্রদান। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, শালিখা থানা এলাকাতে মোট ভোটের ৮৯% কাস্ট হওয়া। এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার বাকি অর্ধেক এলাকায় ৫০% - র মতো ভোট কাস্ট হওয়া আরেকটি বিবেচ্য বিষয়। বিভিন্ন সূত্র দাবি করেছে, শালিখা থানার অধিকাংশ কেন্দ্রে মধ্যাহ্ন বারোটার মধ্যে ভোটদান পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। এগুলো সবই নির্বাচনে অস্বাভাবিকতার পরিচয়বাহী। কার্যত, এ জন্যই সবগুলো বিরোধী দল মাগুরা উপনির্বাচনকে এবং এর ঘোষিত ফলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সকল বিরোধী দলের একযোগে এই নির্বাচনী ফল প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি একটি দাবি জোরের সাথে উঠেছে, তা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় স্থায়ীভাবে নির্বাচন পরিচালনার দাবি। এ নিয়েই বিরোধী দলের সাথে সরকারী দলের বর্তমান রাজনৈতিক বিতর্ক জমে উঠেছে, যা একই সাথে রাজনৈতিক অচলাবস্থাকে জটিলতর করেছে।

সরকারী মুখপাত্র এর আগে যেমনটি দাবি করেছেন, সংবিধানই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গ্যারান্টি, তত্ত্বগতভাবে তা শুদ্ধ, সঠিক উচ্চারণ হলেও মাগুরা উপনির্বাচন সে উচ্চারণকে অস্পষ্টতায় ঢেকে দিয়েছে। একটু পুরনো কথাও এই সূত্রে স্মরণ করা যাক। ১৯৯১-র সাধারণ নির্বাচনকে দেশবাসী এবং বিশ্ববাসী মুক্তকণ্ঠে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে স্বীকার করেছিল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন এবং স্পষ্টতই এ অভিযোগ তখন যথেষ্ট সমর্থন পায়নি। সাধারণ ভোট কারচুপি সাদা চোখে দেখা যায়। সূক্ষ্ম কারচুপি সাদা চোখে দেখা যায় না বলে তা মানা সে সময় কষ্টকর ছিল। কালো টাকার প্রভাব সে নির্বাচনেও ছিল, আরও ছিল জুজুর ভয় মিশ্রিত আশঙ্কাবাণী। এগুলো সূক্ষ্ম কারচুপির আওতায় বিবেচিত হতে পারে। এবং স্পষ্টতই, এ অভিযোগ শক্তিমান সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল। নির্বাচনের তিন বছরের মাথায় নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নির্বাচন কমিশন ঘোষিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী এক সাংসদের নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে (চট্টগ্রাম, আওয়ামী লীগের), তখন ১৯৯১-র নির্বাচনে যে 'সাধারণ ভোট কারচুপিও' ঘটেছিল তা মানতে হয়। দাবি করা হয়, এমন ভোট কারচুপি সেই নির্বাচনে আরও ঘটেছিল। দক্ষ উপস্থাপক আর প্রয়োজনীয় সাক্ষী-সাবুদের অভাবে সে সব অভিযোগ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি হয়তো অর্জন করতে পারেনি। তাই সে সব নির্বাচন অক্ষত থেকে গেছে।

তা'হলে কথা দাঁড়াচ্ছে, একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবার আশঙ্কা থাকে। সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের বর্তমান কর্মকর্তারা মাগুরা উপনির্বাচনে সন্তোষজনক দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। প্রাসঙ্গিকভাবে ১৯৮৮-র ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একজন বিচারপতির নেতৃত্বে, বিচারপতি সুলতান হোসেন খান, সেই নির্বাচন যে 'ইতিহাস' সৃষ্টি করেছিল, বর্তমান নির্বাচন কমিশন সেই ইতিহাসকে ইতিহাস থেকে নির্মূল করার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেছে (৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কোন ডকুমেন্ট সংরক্ষণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে)।

বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রেক্ষাপটে সরকারী দলের পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, প্রাথমিকভাবে তাকে মান্য করার সুযোগ আছে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নয়। 'একটি

www.pathagar.com

অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনই একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না' - প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য তাত্ত্বিকভাবে, নিশ্চিতভাবেই, একটি খাঁটি কথা। প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী উচ্চারণের সাথে একে মিলিয়ে বিশ্লেষণে যাওয়া যাক। 'গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের চাইতে যদি একটি অনির্বাচিত ও মনোনীত সরকার অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তবে তা হবে জনগণের রায়ের প্রতি আস্থাহীনতার শামিল।' বর্তমান বিএনপি সরকারের সাংবিধানিক মর্যাদা ও নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবকাশ কম। প্রশ্ন এখানে নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশ্ন এখানে আসেনি। এসেছে নির্বাচন পরিচালনার প্রশ্ন, যে প্রশ্ন উঠেছে মূলত মাগুরা উপনির্বাচনকালীন ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে। সার্বজনীন ও অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি 'নির্বাহী কমিটি', যাকে সরকার বলা হয়, গঠিত হবে–জাতীয় সংসদের সদস্যদের আস্থার ভিত্তিতে, এ বিষয়ে প্রশ্ন নেই। একটি দলীয় নির্বাচিত সরকার নির্বাচন পরিচালনার সময় কতোটা নির্মোহ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে এবং পারছে এ নিয়েই কথা। মাগুরা উপনির্বাচনের ঘটনাবলীর মাধ্যমে বিরোধী দল এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে, বর্তমান বিএনপি সরকারের অধীনে আসন্ন ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কাঙ্ক্ষিত মানের সুষ্ঠু ও অবাধ হবে না। তাই তারা নির্বাচন পরিচালনার সময়কালের জন্য ৩/৪ মাস বা যে সময়ের জন্যই হোক, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থায়ী সাংবিধানিক আয়োজনের দাবি তুলেছেন। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থায়ী আয়োজনের সাথে এ কথাটিও স্পষ্ট যে, আসন্ন নির্বাচনে অন্য কোন দল সরকার গঠনের মতো গণ আস্থা অর্জন করতে পারলে তারাও পরবর্তী নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব সাংবিধানিক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ছেড়ে দেবেন। এই বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে সরকার উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নে জবাব পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সাম্প্রতিক বৈঠকে বলা হয়েছে, দৈনিক পত্রিকান্তরে প্রকাশিত ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানের কোন বিরোধী দল ক্ষমতায় থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে তারাও মানতো না। এই বক্তব্যের মধ্যে একটি সুপ্ত আস্থাজাত মর্যাদার প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবির সাথে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি একটি গণঅনাস্থার ভাব যুক্ত রয়েছে। কথাটি ঠিক এবং তা নির্দিষ্টভাবেই নির্বাচন পরিচালনার প্রশ্নে। এ কথাটিও ঠিক, নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার প্রশ্নে এই আস্থাহীনতার সাংবিধানিক স্বীকৃতি যুক্ত হলে তার দায়ভার কেবল বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের সাথেই যুক্ত হয় না, যুক্ত হয় এই দাবির উপস্থাপক অন্য দলগুলোর সাথেও। কোন সময় তারাও বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা চর্চা করবে এবং তারাও নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে। এই আস্থাহীনতার অংশীদারিত্ব, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, সকল রাজনৈতিক দলকেই ভাগ করে নিতে হয়, নিতে হবে।

পরের প্রশ্নটি আসছে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার বনাম মনোনীত ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে। ১৯৯১ সালের মনোনীত ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে বিএনপি যে মূল্যায়ন প্রদান করছে তা সঠিক, সন্দেহ নেই। বর্তমান সময়ে যে বাস্তবতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটি দৃঢ় ভিত্তি অর্জন করেছে তার সামগ্রিক দায় ক্ষমতাসীন দলের ওপর বর্তাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি প্রথম উপস্থাপন করে এ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই ধারণাটি সবার আগে ধারণ করে জামায়াতে ইসলামী 'কেয়ার টেকার সরকার' নামে। ১৯৯১-র নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলেও এই দাবিটি অতো জোরালো হতে পারেনি। মাগুরা উপনির্বাচনের ঘটনাবলী দাবিটিকে সর্বদলীয় দাবিতে পরিণত করেছে।

www.pathagar.com

প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো এই দাবিটির প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক-ভোটারের সমর্থন আছে কি-না, তা- নিরূপণ করা। কারণ, আমরা গণতন্ত্রের কথা বলছি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলছি, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' বলে শ্লোগান দিচ্ছি। যদি জানা যায় ও নিশ্চিত হওয়া যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তির বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক—ভোটার অনুকূল মত পোষণ করেন, তা হলে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার বনাম অনির্বাচিত মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিতর্কের অবসান ঘটবে।

মনে রাখা দরকার, সমগ্র বিশ্বের নানা দেশে গণতন্ত্র চালু আছে, গণতান্ত্রিক সরকার চালু আছে। তার অর্থ এই নয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের শাসন প্রক্রিয়াটি হুবহু এক। গণতন্ত্রের মাতৃভূমি বলে কথিত যুক্তরাজ্যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। আর বর্তমান বিশ্বে 'গণতন্ত্রের স্বঘোষিত অতন্দ্র প্রহরী' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা। এই দেশটিতে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি এবং এদেশের এই সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন প্রক্রিয়াটি বড়ই জটিল, যাতে ব্যক্তি নাগরিকের ভূমিকা চিহ্নিত করা কঠিন। গণতন্ত্রের অন্যতম শক্তিমান চারণভূমি ভারতেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি বিশ্বের অন্যসব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে অনেকগুলো বিষয়ে পৃথক। বিস্তারিত নমুনা হাজির করা হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্য বোঝা সহজ হতো, মানি। কিন্তু অন্যসব সীমাবদ্ধতার কথাও স্মরণ রাখতে হয়।

মোদ্দাকথা, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে কিছু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন ও অনুশীলন করতে হয়। তার প্রধানতম দিকটি হলো, সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিক অথবা ভোটারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আবার বিবর্তিত হয়, পরিবর্তিতও হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এটা যদি প্রতীয়মান হয়, প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ, জনগণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থায়ী সাংবিধানিক ভিত্তিকে সমর্থন করে, তাহলে 'নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের মর্যাদা', 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্বল ও অনিষ্টকর কাঠামো' অথবা 'কেয়ার টেকার সরকারের কেয়ার' নেয়ার প্রশ্ন কারও উত্থাপনের সুযোগ নেই। ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছে। ব্রিটিশ জনগণ একদা মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছিল, আবার তা সিদ্ধ করেছে। পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল, সিদ্ধ করা হয়েছে। বিল ক্লিনটন সমকামিতাকে আইনগত বৈধতা দিয়েছেন, জনমতের চাপেই নিশ্চয়। দোষ হোক, গুণ হোক—এটাই গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য। জনগণ চাইলে সরকার-প্রশাসন-নির্বাচন ব্যবস্থার যে কোন পরিবর্তন করা যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাটি শেষ বিচারে জনগণের জন্য জনগণের কাছে অকল্যাণকর প্রতীয়মান হলে এই জনগণই আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে বাতিলের ব্যবস্থা নেবে—ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের বাধ্য করবে। জনগণের ভাল-মন্দের 'সোল এজেন্সী' কোন দল বা গোষ্ঠীর, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার সুযোগ নেই, অধিকারও নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে বিরোধী দলীয় দাবির পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের অভিমত আছে কি-না, এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের নিশ্চিত ধারণা যদি না থাকে, তাহলে বিষয়টি জনগণের তথা দেশের ভোটারদের কাছে উপস্থাপন করা দরকার, যে জনগণ দেশের শাসন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতিক থেকে সংসদীয় বানিয়েছে। তবুও এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে দেশকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও অস্থিতিশীলতার দিকে সরকারের ঠেলে দেয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-২

দৈনিক ইনকিলাব, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০১

তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নিরপেক্ষতা এবং সুবিধাবাদ

তারেক ফজল

২৬ জুলাই ২০০১-এর একটি দৈনিকে কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন লিখেছেন, আমাদের দেশে দীর্ঘকাল গণতন্ত্র ছিল না বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে আমরা অভ্যস্ত নই। আর তাই সাধারণত সত্যোচ্চারণের চেয়ে সুবিধা বুঝে কথা বলাই আমাদের মজ্জাগত।

তিনি তিনটি প্রসঙ্গের মূল্যায়ন করেছেন এবং বাহ্যত এ তিনটি প্রসঙ্গই দেশের দুই প্রধান দলের একটি অর্থাৎ আওয়ামী লীগের উত্থাপিত এবং তাদের দ্বারা প্রবলভাবে সমালোচিত প্রসঙ্গ। এ তিনটি প্রসঙ্গের বাইরেও প্রচুর সংখ্যক প্রসঙ্গ ছিল, যা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলোর মূল্যায়ন করা হলে আওয়ামী লীগের স্বার্থের বিপক্ষে যেতে পারত। যেমন- আওয়ামী লীগ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার এখতিয়ারের প্রশ্ন তুলেছে, নাম ধরে ক'জন উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, আবুল মোমেন এগুলোকে জরুরী ভাবেননি। কারণ এতে আওয়ামী লীগের প্রতি দোষারোপের এবং দলটিকে অভিযুক্ত করার দরকার হতে পারত। তিনি এক্ষেত্রে স্পষ্টতই 'সত্যোচ্চারণে' কুণ্ঠিত অথবা বিচলিত অথবা ভীতিবোধ করেছেন এবং সুবিধা বুঝে আওয়ামী লীগের অনুকূলে যায় এমন প্রসঙ্গের তেমন বিশ্লেষণই পাঠকদের শুনিয়েছেন। এ পর্যায়ে বলে রাখা দরকার, সংশ্লিষ্ট লেখক যেমনটি নিজেকে নিরপেক্ষ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন, বর্তমান লেখক নিজেকে কখনই নিরপেক্ষ ভাবেন না। কেন ভাবেন না, তার একটি ক্ষুদ্র ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ পরই দেয়া হবে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ স্বভাব হল, যা কিছুই দলটির স্বার্থের বিপক্ষে যায়, তা পরিত্যাজ্য বলে শোরগোল করা এবং তার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক এবং হাফিজ উদ্দিন খানের নাম ধরে আওয়ামী লীগ তাদের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলেছে। এমন কাজ এ দলটি বিচারপতি হাবিবুর রহমানের উপদেষ্টাদের কারও কারও বেলায়ও করেছিল ১৯৯৬ সালে। কিন্তু নির্বাচনে বেশী আসন পাওয়ার পর দলটি সে প্রসঙ্গ আর তোলেনি। তারা বলছেন না, সংবিধানের আপত্তি না থাকলে প্রধান উপদেষ্টার পছন্দকে প্রশ্নের আওতায় নেয়া ঠিক নয়। যেমন ঠিক নয় ব্যারিস্টার ইশতিয়াক সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। এর আগেও তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। তখন প্রশ্ন তোলেনি আওয়ামী লীগ। এবার তুলেছে, কারণ তিনি সম্প্রতি বিএনপির এক নেতার পক্ষে মামলা চালিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ ভুলে গেছে, এই ব্যারিস্টার ইশতিয়াকই শেখ হাসিনার মামলার উপস্থাপক ছিলেন, ছিলেন এ দলের সহযোগী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মামলার আইনজীবী এবং ছিলেন শেখ মুজিব সরকারের অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল। কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেনের অন্য দু'টি প্রসঙ্গের আলোচনা এড়িয়ে (কারণ এ দু'টোর প্রথমটিও 'স্বার্থের অনুকূলে' থাকা একটি বিষয় এবং দ্বিতীয়টির বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাখ্যা জানা যায়নি) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার।

www.pathagar.com

আবুল মোমেন লিখেছেন, 'রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা ও বিধানটি আমাদের রাজনীতিবিদদেরই উদ্ভাবন। এদিক থেকে অবশ্যই বাহবাটি আওয়ামী লীগের প্রাপ্য'। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার জন্য প্রথমে কাউকে বাহবা দিতে হলে তা আইনজীবী নেতা এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীকে দিতে হবে। রাজনীতিকদের বাইরে তিনিই প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেন। এটা এরশাদ সরকারের সামরিক শাসনের প্রথম দিককার কথা। আর রাজনীতিকদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী প্রথম উত্থাপন করেন জামায়াতে ইসলামীর মরহুম (সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর) আব্বাস আলী খান। যদিও এ দলটি দাবী করে, এ ধারণাটি দলটির সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের। ১৯৮৩-৮৪-এর দিকে তিনি দলটির ঘোষিত আমীর না হওয়ায় আব্বাস আলী খানের মাধ্যমে এ দাবী উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ এ দাবীতে অনেক পরে যোগ দেয়। আর বিএনপির খালেদা জিয়ার শাসনকালের দ্বিতীয়ার্ধে মাগুরা নির্বাচনের ট্রাজেডি সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে সোচ্চার হয়। সুতরাং আবুল মোমেন তথ্যের সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। অথবা বলা যেতে পারে, 'সুবিধা বুঝে' তিনি এ কৃতিত্বটা এমনিতেই আওয়ামী লীগকে দেয়া পছন্দ করেছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাংলাদেশী মডেলটি রাজনীতিকদের জন্য কোন অর্থেই সম্মানজনক নয়- এ কথা অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিকও এখানে-সেখানে বলেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাংলাদেশী মডেলটি নিয়ে আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিনি। এটিকে কখনও গৌরবজনক মনে করিনি। কারণ এ মডেলটির পুরোটাই রাজনীতিকদের প্রতি অনাস্থা, অবিশ্বাস, অমর্যাদা এবং ঘৃণার বাস্তব রূপ। আমার এ মন্তব্য কঠিন ও কঠোর মনে হতেই পারে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিকদের একটি বিরাট অংশই নৈতিক মানদণ্ডে (সকল অর্থেই) এতটা নীচে অবস্থান করছিলেন এবং এখনো করছেন যে, রাজনৈতিক প্রাধান্যের (পলিটিক্যাল সুপ্রিম্যাসি) ধারণার শতভাগ বিপরীত হবার পরও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান মডেলটি বাংলাদেশে সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করেছে। আমি আমার কঠোর মন্তব্যের প্রমাণ দিতে সক্ষম। তবুও এই আমিই ১৯৯৪ সালের ৫ মে তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছিলাম, যেহেতু সব ক'টি বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চায় এবং যেহেতু বিরোধী দলগুলো মোট হিসেবে বেশী সংখ্যক জনগণ-ভোটারের (১৯৯১-র নির্বাচনী ফল অনুযায়ী) প্রতিনিধিত্ব করে, তাই বিএনপির উচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ দাবী মেনে নেয়া। সম্ভবত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সেটি ছিল প্রথম লেখা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্য থেকে তো বটেই। বলা যেতে পারে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে প্রথম একাডেমিক প্রবন্ধ লেখকও বর্তমান লেখক।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ এলেই নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় সর্বাগ্রে। এই নিরপেক্ষতা নিয়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে (কম অথবা বেশী শিক্ষিত নির্বিশেষে) আমি বিভ্রান্তি লক্ষ্য করেছি। বলা যাক, আওয়ামী লীগ নেত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার উচ্চারণের আগে তিনি দুটি বিশেষণ অথবা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। এক. নির্দলীয় ও দুই. নিরপেক্ষ। বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় এ দু'টি বিশেষণ যোগ করেই তারা রাজপথে কথা বলেছেন। কিন্তু ১৯৯৬-এর ২৫ মার্চ দিবাগত শেষরাতে সমালোচিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে যে সংবিধান সংশোধনী পাস হয় তার শিরোনাম দেয়া হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল-১৯৯৬। বিএনপি নেত্রী ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুন্সীগঞ্জের এক জনসভায় দাবী করেছিলেন যে, শিশু ও পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়। বেগম জিয়ার এ উচ্চারণ ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কিন্তু তিনি

www.pathagar.com

তার বক্তব্যে এ ধারণায় অটল ছিলেন এবং সংবিধান সংশোধনীর সময়ও বিরোধী দলের দাবীকৃত 'নিরপেক্ষ' বিশেষণ সচেতনভাবে সংশোধনীর অংশ করা থেকে বিরত থেকেছেন। এ বিষয়ে শান্ত ও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারা মানুষেরা বেগম জিয়াকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাইবেন। কারণ, বিরোধী দলীয় দাবী অনুযায়ী তিনি যদি নিরপেক্ষ বিশেষণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অংশ করতেন, তবে তা বড় ধরনের সাংবিধানিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারত। অল্প সংখ্যক মানুষের ধারণাই এ বিষয়ে স্পষ্ট যে, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবার মধ্যে পার্থক্য কোথায়। এ ধারণা স্পষ্ট হলে তারা একটানে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ উচ্চারণ করতেন না। যে কোন ব্যক্তি দেশে বিদ্যমান কোনও দলের সাথে আনুষ্ঠানিক বা প্রথাসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় যুক্ত না হলেই তিনি নির্দলীয় বলে দাবী করতে পারেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি, বিশেষত রাজনৈতিক ইস্যু ও বিষয়ে, নিজেকে নিরপেক্ষ দাবী করতে পারেন না। কোন ক্রমেই পারেন না। একজন ব্যক্তি যদি সচেতন হন, কম-বেশী বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী হন, তবে তার পক্ষে যে কোন রাজনৈতিক ইস্যু বা বিষয়ে নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। কথাটি সহজ করে বলি। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার- এ রাজনৈতিক বিষয়ে দেশের প্রতিজন নাগরিক ভোটারের কোন না কোন পক্ষে অবস্থান করা অনিবার্য। তাই প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে পক্ষ আছে। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় মূলনীতি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, যা চতুর্থ সংশোধনী পর্যন্ত সংবিধানে বাঙালী জাতীয়তাবাদ ছিল। এই জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বাংলাদেশের একজন নাগরিকও নিরপেক্ষ? সহজ জবাব- একজনও নয়। প্রথম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান কি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন? না। হতে পারে তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। হতে পারে বাঙালী জাতীয়তাবাদে (তাকে যারা চেনেন, তারা দ্বিতীয়টির কথাই বলেন)। অথচ বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদের বিতর্ক অন্যতম। তাহলে মানতে হবে, বাংলাদেশের একজন সচেতন-বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকও নিরপেক্ষ নন, বিশেষত রাজনৈতিক ইস্যু বিষয়ে। তাই বলি, বেগম খালেদা জিয়া এক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যথার্থই বলেছেন, পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়।

ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান লেখকও অন্তত রাজনৈতিক বিষয়াদিতে নিরপেক্ষ নন। এ লেখকের যে কোন রাজনৈতিক মত-অভিমত-বক্তব্য হয় আওয়ামী লীগের সাথে মিলবে, না হয় বিএনপির সাথে, না হয় জাতীয় পার্টি, জামায়াত, সিপিবি বা অন্য কোন দলের বক্তব্যের সাথে মিলবে। তাই কোন সচেতন ব্যক্তিই রাজনৈতিক বিষয়ে নিরপেক্ষ নন। সবশেষে বলি, একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন, এখন পর্যন্ত তা ইতিবাচক। আরও কাজ বাকী রয়েছে। আশা করা যাক, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেসব সম্পন্ন করবেন। আমরা একটি তুলনামূলক ভাল নির্বাচন কামনা করি।

লেখক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-৩

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই ২০০২

রাজনীতির নিরপেক্ষতা তত্ত্ব, রাষ্ট্রনায়ক এবং একজন বেগম খালেদা জিয়া

অধ্যাপক তারেক ফজল

নিরপেক্ষ এবং নিরপেক্ষতা শব্দ দু'টি আপাত শ্রুতিমধুর এবং এর অবস্থানও সুবিধাজনক। দু'টি পক্ষ অথবা পক্ষসমূহের ঠিক মাঝখানে অবস্থান পায় নিরপেক্ষ। প্রয়োজন মনে করলে নিরপেক্ষ {(ব্যক্তি) (গণ)} 'পক্ষ' গ্রহণ করতে পারে সহজে। প্রথম পক্ষ কি দ্বিতীয় পক্ষ। 'ঘাড় ফেরালেই' পক্ষ প্রস্তুত। 'পক্ষ গ্রহণকারীর' পক্ষে 'ভিন্ন পক্ষে' যাওয়া তুলনামূলকভাবে কঠিন। তার যাত্রাপথ দীর্ঘতর। কারণ দু'পক্ষের মাঝে 'নিরপেক্ষ' থাকে। তা ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে ভিন্ন পক্ষে। সুতরাং 'নিরপেক্ষ' 'শ্রুতি সুবিধা' যেমন পায়, তেমনি অবস্থানগত সুবিধাও পায়। তাই কি অনেকে 'নিরপেক্ষ' থাকতে চায়? অর্থনীতি, সমাজ কিংবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই 'বাহ্যিক' 'নিরপেক্ষতা গ্রহণ' যেখানে প্রায় অসম্ভব কাজ, সেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা 'আশা করা' কেবল অবান্তর বিষয় নয়, শতভাগ অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এরশাদ শাসনের অন্তিম সময়ে বিরোধী রাজনীতিকগণ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যৌথ ও জোরালো দাবী উত্থাপন করেন (যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি ১৯৮২-৮৩ সালেই আইনজীবী নেতা এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী ও জামায়াত নেতা মরহুম আব্বাস আলী খান প্রমুখের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে)। শাসকদের ঐতিহ্যগত সহায়ক শক্তি সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ এরশাদের পক্ষে বিরোধী রাজনীতিকদের প্রতি অন্যায্য দমন-পীড়ণ চালাতে অপারগতা প্রকাশের পেক্ষাপটে বিরোধী রাজনীতকদের দাবী অনুযায়ী অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরে এরশাদ সম্মত হন। বাংলাদেশের সংবিধানে যুক্ত দশম সংশোধনীর বিধানাবলীর আওতায় এরশাদের নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করলে বিরোধী রাজনীতিকদের মনোনীত ব্যক্তি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে এরশাদ সে পদে নিয়োগ প্রদান করেন এবং অতঃপর তিনি নিজে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায়। স্মরণ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের সংবিধানের দশম সংশোধনী এরশাদের উদ্যোগেই যুক্ত হয়। সময়ের সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে সেই সংশোধনীর বিধানাবলীর আওতাতেই তিনি তাৎক্ষণিক রক্তপাত এড়িয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের রাজনীতির সেই উত্তাল দিনগুলোতে শাসক এরশাদের সহযোগী শাহ মোয়াজ্জেম প্রমুখ প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সাংবিধানিক ব্যবস্থা না থাকার প্রসঙ্গ জোরালোভাবে উত্থাপন করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্টের পদত্যাগপত্র ঢাকার 'জিরো পয়েন্টে উড়িয়ে দেবেন কি-না'- এ মর্মে বিরোধী রাজনীতিকদের প্রতি প্রশ্ন রেখেছিলেন। ১৯ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে বিরোধী রাজনীতিকগণ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বটে; কিন্তু তা কোনো 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' নিকট নয়। তা ছিলো বিরোধী রাজনীতিকদের মনোনীত ব্যক্তিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তার নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সরকারের স্বীকৃত পরিচয় তাই অস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

www.pathagar.com

সেটি কোনো নিয়মিত সরকার ছিলো না এবং তৎকালীন বাংলাদেশের সংবিধানে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' কোনো বিধানও ছিলো না। যদিও বিরোধী রাজনীতিকদের প্রকাশ্য দাবী তা-ই ছিলো। বাংলাদেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী পুনরায় জোরালো হয় ১৯৯৪ সালে, অভিযুক্ত মাগুরা-২ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। শাসন ক্ষমতায় তখন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা প্রমুখ বিএনপি'র মুখপাত্র দাবী করলেন, সংবিধানে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান নেই এবং বিরোধী রাজনীতিকদের প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' একটি ভঙ্গুর ও ঝুঁকিপূর্ণ সরকার হবে। আর একই সাথে তা হবে রাজনীতিকদের ওপর অনাস্থার প্রতীক, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে। সে সময় (৫.৫.১৯৯৪) একটি দৈনিকে বর্তমান নিবন্ধকার লিখেছিলেন, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অধিকাংশ জনগণ-ভোটারের ইচ্ছাতেই নীতি-আইন প্রণীত হয় এবং সেই একই ইচ্ছাতে প্রণীত আইন বদলেও যায়। বাংলাদেশের তৎকালীন সকল বিরোধী দল যেহেতু দাবীটি সমর্থন করছে এবং সর্বশেষ নির্বাচনে (৫ম জাতীয় সংসদ) যেহেতু তারা মিলিতভাবে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন পেয়েছে, তাই দাবীটি শাসকদের স্বীকার করে নেয়া উচিত। প্রয়োজনে এ দাবীর বিষয়ে গণভোট বা রেফারেন্ডামের আয়োজন করা যায়। গণভোটে দাবীটি নাকচ হলে হোক। কিন্তু জনগণ দাবীটি মেনে নিলে শাসকদের এতে আপত্তি করা গণতন্ত্রসম্মত হবে না। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে এ বক্তব্য বর্তমান নিবন্ধকারই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন। এ সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুন্সিগঞ্জের এক জনসভায় দু'টি অন্যায্য কথার সাথে একটি অতিশয় ন্যায্য, সত্য ও প্রায়োগিক বাস্তব কথা উচ্চারণ করেন। বেগম জিয়ার অন্যায্য দু'টি কথা ছিলো 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমি (১) জানি না, (২) মানি না।' আর ন্যায্য ও বাস্তব কথাটি ছেলো 'শিশু ও পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়।'

বাংলাদেশের মুদ্রণ মাধ্যমে তখন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে তুমুল ঝড় ওঠে। ছোটো-বড়ো ডিগ্রীধারী বুদ্ধিজীবীরা লিখতে থাকেন, বেগম জিয়ার ডিগ্রী-সার্টিফিকেট নেই, তাই তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার জানেন না। আর তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাই তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরোধী দলীয় দাবী মানেন না। সমালোচক বুদ্ধিজীবীরা একই মাত্রায় অথবা আরো বেশী কঠোর ভাষায় বেগম খালেদা জিয়ার 'পাগল-শিশুর নিরপেক্ষতা তত্ত্ব'কে আক্রমণ করেন এবং অব্যাহত নিন্দাবাদ জানাতে থাকেন। বর্তমান নিবন্ধকার বেগম জিয়ার 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার জানি না-মানি না' বক্তব্যের সাথে একমত ছিলেন না এবং এখনও নন। বর্তমান নিবন্ধকার মনে করেন, ঝুঁকিপূর্ণ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বল্পায়ু সেই সংসদে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' সাংবিধানিক স্বীকৃতি (ত্রয়োদশ সংশোধনী) প্রদানের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া তাঁর 'জানি না-মানিনা' বক্তব্যের দায় পরিশোধ করেন, জরিমানা আদায় করেন। বর্তমান নিবন্ধকারের এ মূল্যায়নের সাথে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। তাতে কোনো সমস্যা নেই। বরং তা গণতান্ত্রিক মূলনীতির সহায়ক আচরণ।

এ পর্যায়ে বর্তমান নিবন্ধকার নিজের ঢাক আরো কিঞ্চিৎ পেটাতে চান। বেগম খালেদা জিয়ার 'পাগল-শিশুর নিরপেক্ষতা তত্ত্ব'টি সম্ভবতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে বর্তমান নিবন্ধকারই সর্ব প্রথম হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হন এবং প্রবল স্রোতের বিপরীতে বেগম জিয়ার এই তত্ত্বটির সমর্থনে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন জনপ্রিয় লেখায় বর্তমান নিবন্ধকার দেখাতে চান রাজনীতির অঙ্গনে কারো নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয় এবং রূঢ় বাস্তব সত্য তত্ত্বটি সবার আগে উপস্থাপন করে বেগম খালেদা

www.pathagar.com

জিয়া এক ঈর্ষণীয় প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ তত্ত্ব বেগম জিয়ার রাষ্ট্রনায়কোচিত ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের স্মারকও বটে। বর্তমান নিবন্ধকার ইতোমধ্যে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে একদা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, বিচারপতি হাবিবুর রহমান (শেলী) ও বিচারপতি লতিফুর রহমান নিরপেক্ষতার প্রাথমিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁরা রাজনীতির বিভিন্ন পক্ষের দ্বারা পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। নিরপেক্ষ হিসেবে এ সাবেক প্রধান বিচারপতিদের প্রাথমিক স্বীকৃতির মূল কারণ ছিলো, তাঁরা রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু যখনই তাঁরা রাজনীতির অঙ্গনের প্রত্যক্ষ অংশীদার হন, সহসাই তাঁরা 'রাজনীতির পক্ষে'ও যুক্ত হয়ে পড়েন। এ কথাগুলো এখন আর তত্ত্বের কথা নয়, কঠিন-কঠোর বাস্তবের অংশ। কিন্তু তারপরও রাজনীতিকগণসহ অনেক বুদ্ধিজীবী একটানে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' উচ্চারণ করেন। অথচ ১৯৯৬-র মার্চ মাসের উত্তাল ও বিধ্বংসী রাজনীতির চাপের মধ্যে থেকেও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রণয়নের সময় বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'বিশেষণ' হিসেবে 'নিরপেক্ষ' শব্দ যোগ করেননি, যোগ করেছেন 'নির্দলীয়'। এ 'নির্দলীয়' এবং 'নিরপেক্ষ' বিশেষণ দু'টির বাহ্যিক মর্ম বুঝতেও আমাদের মতো অনেক ছোটো-বড়ো ডিগ্রীধারী ও বুদ্ধিজীবীরা সক্ষম নই, একজন শীর্ষ নেত্রী তো নন-ই। এ শীর্ষ নেত্রী এখনো একটানে বলে যান 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার।' সংবিধানের ভাষা ও ভাষ্য সম্পর্কে সরকারের পরিচালকদের ন্যূনতম ধারণা থাকা অনিবার্যই বটে। প্রচলিত বা স্বীকৃত প্রক্রিয়ায় কেউ কোনো দলের সাথে যুক্ত না হলেই তাকে 'নির্দলীয়' বলা যেতে পারে। কিন্তু 'নিরপেক্ষ' হবার জন্য দেশের রাজনীতির সমুদয় ইস্যু-বিষয়াদিতে একজনকে 'সকল পক্ষের' উর্ধ্বে থাকতে হবে। এ কাজটি কখনোই এবং কোনোভাবেই একজন ন্যূনতম বোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পাগল ও শিশু ছাড়া সব মানুষই রাজনৈতিক ইস্যু। বিষয়াদিতে রাজনীতির বিদ্যমান কোনো-না-কোনো পক্ষে অবস্থান করতে বাধ্য। সহজবোধ্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি জাতীয়তাবাদ। এটি বাঙ্গালী না বাংলাদেশী- এ বিতর্কে দেশবাসী প্রধানতঃ দু'পক্ষে বিভক্ত। এখন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন-হাবিবুর-লতিফুর হোন আর যদু-মধু-রাম-শ্যাম হোন, একজন ব্যক্তি এ দু'পক্ষের একটিতে অবস্থান করবেন এবং ঠিক তক্ষুণি 'অন্য পক্ষের' নিকট নিরপেক্ষতা হারাবেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বিষয়টি আরো দেদীপ্যমান হতে পারে। আর ডিগ্রী-সার্টিফিকেটবিহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ তত্ত্বটিই যোগ্যতার সাথে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবার আগে উপস্থাপনে সক্ষম হন।

রাষ্ট্রনায়ক ও একজন বেগম খালেদা জিয়া

রাজনীতিক, সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? ইতিহাসের সব সরকার প্রধান-রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা পাননি। নেহায়েত সরকার-রাষ্ট্র প্রধানের উর্ধ্বে যারা রাষ্ট্রনায়ক হতে পেরেছেন, ইতিহাসে তাঁরা স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থেকেছেন। দলীয় প্রচার কৌশল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একটি দল সরকার গঠনের সুযোগ পেতে পারে এবং সে দলের এক শীর্ষ নেতা সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন। কিন্তু তাকে রাষ্ট্রনায়ক হবার জন্য বাড়তি কিছু যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। সমগ্র দেশবাসীকে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো এবং বাস্তব সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারা রাষ্ট্রনায়কের প্রথম গুণ। অনৈক্য ও বিভেদ নয়, সমগ্র দেশবাসীকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করা রাষ্ট্রনায়কের দ্বিতীয় যোগ্যতা। শব্দ, উচ্চারণ ও আচরণে সুজন-সুলভ সংযমী হওয়া রাষ্ট্রনায়কের অনিবার্য যোগ্যতা। এ ন্যূনতম মানদণ্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রনায়ক

www.pathagar.com

ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কের ভাবমূর্তি ক্রমশঃ তিনি হারিয়েছেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩-এর শেখ মুজিবের সাথে ১৯৭৪ সালের শেখ মুজিবের কোনো তুলনা হয় না। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ দেশে রাষ্ট্রনায়কের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। এ ভাবমূর্তি তাঁর ক্রমশঃ ওপরে উঠছিলো। তাঁর শাহাদৎ পরবর্তী জানাজায় স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাগম ও তাঁর জন্য শুভ কামনা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর অস্তিত্বের ঘোষক ছিলো। এরপর দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ রাষ্ট্রনায়কহীন অবস্থায় পরিচালিত হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনকালে একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর উত্থান লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানের দ্বিতীয় মেয়াদে বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পূর্ণতার দিকে ক্রমঅগ্রসরমান বলে বর্তমান নিবন্ধকার লক্ষ্য করছেন। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা সর্বগ্রাসী ও সর্বপ্লাবী অর্থনৈতিক দুর্নীতি। বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ সন্ত্রাস, অশান্তি ও অসততার কারণ অর্থ-বিত্তের অন্যায্য লোভ। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, নৈতিক ও যৌন অধঃপতন, হিংসা, ঈর্ষা, ভুল বোঝাবুঝির কারণে এ দেশে অবশিষ্ট ২০ ভাগ সন্ত্রাস, অশান্তি ও অসততা ঘটে থাকে।

বেগম খালেদা জিয়া এখন পর্যন্ত দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অসততার বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে অবিচল আপোষহীন ভূমিকা অব্যাহত রেখেচেন। বর্তমান নিবন্ধকার ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব বাংলাদেশের জন্য আল্লাহতায়ালার এক বিশেষ নেয়ামত। কিন্তু এ নেয়ামতের উপযুক্ত ও যথার্থ প্রয়োগের জন্য তাঁর ডানে-বামে-সর্বদিকে যে সহায়ক নেতৃত্বের অনিবার্য প্রয়োজন, বর্তমান বাস্তবতা তা সরবরাহে সক্ষম হচ্ছে না। এটি বর্তমান নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেগম খালেদা জিয়ার বিপরীত শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে তিনি সুস্পষ্ট গুণগত পার্থক্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বর্তমান শাসক বিএনপি'র অন্যসব নেতা-কর্মীর সাথে বিপরীত নেতা-কর্মীর পার্থক্য বাস্তবে মাত্রাগত, গুণগত নয়। সন্ত্রাস বলি, দুর্নীতি বলি- সর্বত্রই এ দু'পক্ষের পার্থক্য কেবল মাত্রাগত। তা-ও সম্ভবতঃ বেগম খালেদা জিয়ার মতো কঠোর ও নিখাদ আপোষহীন নেতৃত্ব রয়েছে বলেই। বাংলাদেশের বাস্তব সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য এখন দরকার একদল সহায়ক নেতৃত্ব, যারা বেগম খালেদা জিয়ার দুর্নীতিমুক্ত ও উপযোগী কর্মধারাকে এগিয়ে নিতে পারবেন।

[লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-৪

তত্ত্বাবধায়ক বিতর্ক এবং নিরপেক্ষতার সেই কাসুন্দি

ড. তারেক ফজল

তত্ত্বাবধায়ক বিতর্ক

২০০৭ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন তথা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েই মূলত বর্তমানে বাংলাদেশী রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে। নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসকগোষ্ঠী বাছাই করা হয়। ক্ষমতাসীন জোট সরকার আশা করছে, পরবর্তী মেয়াদেও তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে। বিরোধী পক্ষ এবং নির্দিষ্টভাবে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় নিজেদের ক্ষমতাসীন হবার বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখতে পাচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই তারা নির্বাচনের বর্তমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং এর সম্ভাব্য সংস্কার দাবি করেছে। যদিও এখনও আওয়ামী লীগ ও এর মিত্রদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদ্যমান ব্যবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধিনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন, পিএসসি, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলসহ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়স সীমা বৃদ্ধির বিষয়টিকে 'উদ্দেশ্যমূলক' হিসেবে চিহ্নিত করেছে আওয়ামী লীগ। দলটির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বৎসরে নির্ধারণ করায় পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতির অবস্থানে থাকবেন বিচারপতি কে এম হাসান। দলটির দাবি, বিচারপতি কে এম হাসানকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পাবার জন্যই বিএনপি নেতৃত্বের জোট সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী সম্পন্ন করেছে। দলটির মতে, বিচারপতি কে এম হাসান আগে বিএনপির দলীয় চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই তিনি প্রধান উপদেষ্টা হলে বিএনপি ও এর জোটের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন। তাতে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য বিজয় সম্ভব হবে না।

ইতোমধ্যে বিএনপি নেতৃত্বের জোট সরকারের পক্ষ থেকে চতুর্দশ সংশোধনী এবং নির্দিষ্টভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিসহ কয়েকটি সাংবিধানিক পদবিধারীর অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধির যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। তাদের মতে, এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, এটি একটি সাধারণ ব্যবস্থা। এর সুবিধা সংশ্লিষ্ট সকলেই ভোগ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই এটি উন্মুক্ত। তাই এটি কোনো উদ্দেশ্যমূলক সংশোধনী নয়।

বাস্তবে, কাকতালীয় হলেও, আওয়ামী লীগের অভিযোগের বাহ্যিক ভিত্তি রয়েছে। বিচারপতি কে এম হাসান আগে বিএনপি-র দলীয় কার্যক্রম ও চিন্তা-ভাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ দাবি মিথ্যে নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে। এক. পূর্ববর্তী দলীয় সংশ্লিষ্টতার কারণে জনাব কে এম হাসান বিচারপতির মোটামুটি দীর্ঘকালীন দায়িত্ব পালনকালে বিএনপি-র প্রতি প্রমাণযোগ্য অথবা ন্যূনতম মাত্রায় বিশ্বাসযোগ্য পক্ষপাতিত্ব করেছেন কি-না এবং তেমন কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে কি-না, তা দেখা। দুই. একজন ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলা সম্ভব কি-না, তা দেখা। বর্তমান নিবন্ধকারের জানা মতে, বিচারপতির দায়িত্ব পালনকালে জনাব কে এম হাসানের বিষয়ে দলীয় পক্ষপাতিত্বের কোনো অভিযোগই উত্থাপিত হয়নি। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে কার্যকর প্রভাব ফেলা প্রায় অসম্ভব বলেই বিশ্বাস করা হয়। নির্বাহী ক্ষমতার কারণে প্রধান উপদেষ্টা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলী করার মতো কিছু ক্ষমতা চর্চা করতে পারেন হয়তো। কিন্তু তাতে নির্বাচনে কার্যকর প্রভাব ফেলা দুরূহ কাজ বটে। প্রথম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান কথিত বিএনপিপন্থী ১৪ জন ডিসিকে বদলী করে কথিত আওয়ামী লীগপন্থী ডিসিদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আবার বিচারপতি লতিফুর রহমানও প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়ে ১৩ জন সচিবকে বদলী করেছিলেন। দু'টিই রাজনৈতিকভাবে সমালোচিত হয়েছিলো। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টার এ ক্ষমতা চর্চা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে তেমন প্রভাব বিস্তারের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ১৯৯৬-র নির্বাচনে বিএনপি বাহ্যত হেরেছিল। কিন্তু যে কেউ খুব সহজেই হিসেব করে দেখাতে পারেন, ১৯৯৬-র ১২ জুন নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট এবং আংশিক জাতীয় পার্টির (বর্তমানে নাজিউর রহমান মঞ্জুর-এর নেতৃত্বাধীন হিসেবে) প্রাপ্ত ভোট যোগ করা হলে বিএনপি-ই সেই নির্বাচনের বিজয়ী পক্ষ। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশলের কারণে বিএনপি এর সমমনা মিত্রদের থেকে পৃথক অবস্থানে ছিলো। কার্যত এটিই বিএনপি-র পরাজয় অথবা আওয়ামী লীগের জয়ের নিয়ামক। ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাহ্যত হেরেছে। কিন্তু যে কেউ সহজেই হিসেব করে দেখাতে পারেন, বিএনপি-র মিত্রদের ভোট ও আসন বাদ দিলে বিএনপি প্রায় হেরেছে এবং আওয়ামী লীগ নিশ্চিতভাবেই বিজয়ী হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত 'প্রায়' শব্দটিকে কেউ কেউ 'নিশ্চিত' অর্থেও ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য ১৯৯৬-২০০১ সালের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বেশ কিছু লাগামহীন অন্যায্য কার্যক্রম এবং আচরণও ২০০১ সালের নির্বাচনে দলটির পিছিয়ে পড়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ বটে।

তাই এটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে, একজন ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করা প্রায় অসম্ভব।

বর্তমান নিবন্ধকারের এ বক্তব্য যেমন আওয়ামী লীগের জন্য, তেমনি ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং জোট সরকারের জন্যও বটে। আওয়ামী লীগ সহজেই সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়ে উত্থাপিত আশঙ্কা থেকে ফিরে আসতে পারে। তাতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পেতে পারে। আবার বিএনপি এবং জোট সরকারেরও এ ক্ষেত্রে পুনরায় চিন্তা করার সুযোগ আছে। আওয়ামী লীগের আশঙ্কা ও ভীতি অনুযায়ী ক্ষমতাসীন জোট সরকারের যদি বিচারপতি কে এম হাসান-এর মাধ্যমে সামান্যতমও সুবিধা পাবার আশা, ইচ্ছা ও আগ্রহ থেকে থাকে, তবে তাদের তা থেকে মুক্ত হওয়া উচিৎ। আর সেই সাথে আওয়ামী লীগ ও এর মিত্রদের কার্যকর প্রক্রিয়ায় আশ্বস্ত করা উচিৎ যে, তারা বিচারপতি কে এম হাসান থেকে অন্যায্য কোনো সুবিধা আশা করেন না। এ জন্য জোট সরকারের উচিৎ নিজের দায়িত্বে আওয়ামী লীগ পক্ষকে জানানো যে, আওয়ামী লীগ চাইলে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিদ্যমান সাংবিধানিক নির্দেশনা অক্ষুন্ন রেখেই বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে পরোক্ষে অসম্মত করাসহ অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের অবসর গ্রহণকারী বিচারপতির যে কাউকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব

www.pathagar.com

প্রদানে একযোগে কাজ করতে বিএনপি ও জোট নেতৃত্ব প্রস্তুত রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন, বিদ্যমান সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত না হলে তার অব্যবহিত পূর্বে অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি এ দায়িত্ব নিতে পারেন। তিনিও সম্মত না হলে সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী আপীল বিভাগের বিচারপতি এবং তিনিও না হলে তার অব্যবহিত পূর্বে অবসর গ্রহণকারী আপীল বিভাগের বিচারপতি, তিনি সম্মত না হলে সিভিল সোসাইটির কোনো সদস্য এবং তাদেরও কাউকে না পাওয়া গেলে প্রেসিডেন্ট তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন।

এ অবস্থায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিময়তা অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ক্ষমতাসীন পক্ষকে আওয়ামী লীগের আশঙ্কা দূর করা বা তা অমূলক-ভিত্তিহীন হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব না দেয়ার পরোক্ষ (কারণ প্রত্যক্ষে তেমন আচরণ অসাংবিধানিক হিসেবে চিহ্নিত ও নিন্দিত হবে) ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হতে হবে। এর ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষে চলমান সাংবিধানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করা কঠিন হবে। এতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

আবারও নিরপেক্ষতার কাসুন্দি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবারো নিরপেক্ষতার কাসুন্দি নিয়ে ঘাঁটাঘাটি শুরু হয়েছে। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষ বিএনপি-র কাছে নির্দলীয় ও 'নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা দাবি করছিলো। বিএনপি নেত্রী ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৪ সালে মুন্সিগঞ্জের এক জনসভায় বলেছিলেন 'পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়'। বিরোধী রাজনীতিক এবং সিভিল সোসাইটির অনেকেই সে সময় বেগম জিয়ার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বর্তমান নিবন্ধকার সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি অথবা প্রথম সারির অন্যতম একজন, যিনি বেগম জিয়ার 'নিরপেক্ষতা তত্ত্ব'কে সাধুবাদসহ সমর্থন করেছিলেন এবং এর পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। বয়সী ও বোধ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির পক্ষে অন্তত রাজনৈতিক বিষয়াদিতে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। এটা আওয়ামী লীগ নেত্রীই কার্যত প্রমাণ করেছেন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন এবং আরো অনেকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করে।

রাজনীতিতে কারো নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ অসম্ভব এবং তা অবাঞ্ছিতও বটে। বেগম জিয়া ১৯৯৬-র মার্চে বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' ব্যবস্থা করে সচেতনভাবে বিরোধী পক্ষের 'নিরপেক্ষ' সরকারের দাবিকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং একই সাথে জাতিকে এক বিরাট বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। বিরোধী পক্ষের দাবি অনুযায়ী তিনি যদি 'নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করতেন, তাহলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়তো। কারণ কোনো 'নিরপেক্ষ ব্যক্তি' বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চালাবার জন্য পাওয়া যেতো না।

শেষ কথা, রাজনীতিকদের এবং শিক্ষিতজনদের কোনোভাবেই 'নিরপেক্ষতার' সন্ধান করা উচিৎ নয়, দরকার 'ন্যায্যতার' সন্ধান করা।

২৯.১১.২০০৪ ইং।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-৫

তত্ত্বাবধায়ক বিতর্ক
ক্ষমতাসীন পক্ষের নমনীয় অবস্থানই কাম্য

ড. তারেক ফজল

দীর্ঘ দিন থেকে, বলতে গেলে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি করে চলেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে ঢাকায় একটি গোল টেবিল বৈঠকে দলটি নির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করেছে। অবশ্য এ বৈঠকেও দলটি নির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সংস্কার প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করেনি। পত্রিকান্তরে জানানো হয়েছে, এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের জন্য গঠিতব্য জোটের সম্ভাব্য শরিকদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর একটি সংস্কার প্রস্তাব জনসমক্ষে প্রকাশ করবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, দীর্ঘ দিন থেকে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবি করলেও এ বিষয়ে দলটির পক্ষে সুনির্দিষ্ট অবস্থান ঘোষণা করাই সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ এটিকে আওয়ামী লীগের একটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে।

আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশ না করলেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার যে কোনো সংস্কার প্রস্তাবকে নাকচ করে বিভিন্ন পর্যায়ে বক্তব্য রেখেছেন। অবশ্য বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া নির্বাচন ব্যবস্থাকে উন্নত করার যে কোনো প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। পর্যবেক্ষক মহলের অনেকেই মনে করেন, আওয়ামী লীগ যেখানে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় সংস্কারের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবই উত্থাপন করেনি, সেখানে প্রধানমন্ত্রিসহ সরকারের সদস্যরা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ন্যায্য আচরণ করেননি, ক্ষমতাসীন সরকারের এটি ন্যায্য অবস্থান নয়। আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন পর্যন্ত সরকারের অপেক্ষা করাই সঙ্গত ছিলো।

তবে ইতোমধ্যে মিডিয়ায় আওয়ামী লীগের কিছু 'অনির্দিষ্ট প্রস্তাব' আলোচিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের দিক থেকে সম্ভবত সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের সম্ভাব্য ব্যক্তি সাবেক প্রধান বিচারপতি বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়ে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর আওতায় সব ক'টি সাংবিধানিক পদে অবসর গ্রহণের বয়স ২ থেকে ৫ বৎসর বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন এবং সিএজি-র পদে আসীন ব্যক্তিদের অবসরের বয়স সীমা বাড়ানো হয়েছে। এটাকে সুবিধা মনে করা হলে ব্যক্তি নির্বিশেষে এ সুবিধা সংশ্লিষ্ট সকলেই ভোগ করবেন। সাধারণ বিবেচনায় অবসরের বয়স সীমা বৃদ্ধির এ বিষয়টি আলোচিত বা বিতর্কিত হবার কথা নয়। প্রশ্নটি এসেছে, এ বয়স সীমা বৃদ্ধির কারণে বর্তমান প্রধান বিচারপতি পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকালে স্বপদেই থাকবেন। ফলে সর্বশেষ অবসরগ্রহণকারী প্রধান বিচারপতির অবস্থানে থাকবেন বিচারপতি কে এম হাসান। বিচাপতি কে এম হাসান একজন আইনজীবী থাকাকালে বিএনপি-র রাজনৈতিক কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অবসরের বয়স সীমা বৃদ্ধির কারণে বিচারপতি কে এম

www.pathagar.com

হাসান সাংবিধানিক পরিভাষার 'প্রধান বিচারপতি হিসেবে সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী অবস্থান লাভ করে বাংলাদেশের তৃতীয় সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবার সুযোগ পাবেন। এ প্রেক্ষাপটেই আওয়ামী লীগ জোরেশোরে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি তুলেছে আর পরবর্তী সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানের নিয়োগের পরোক্ষ বিরোধিতা করছে। দলটি মনে করে, বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ পেলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করার ব্যবস্থা করবেন। পত্রিকান্তরে জানানো হয়েছে, বিচারপতি কে এম হাসানের পূর্ববর্তী প্রধান বিচারপতি বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরীর প্রতি আওয়ামী লীগের আস্থা রয়েছে। আওয়ামী লীগের দাবির জবাবে সরকারের সদস্যরা বলতে চেয়েছেন, সাংবিধানিক পদবীধারীদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধির বিষয়টি একটি সাধারণ বিধান। এর সুবিধা সবাই পাবেন। এর মধ্যে বিএনপি-র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কোনো পরিকল্পনা বা চিন্তা-ভাবনা নেই। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, বিএনপি-র এ দাবির সত্যতা থাকার বাহ্যিক সুযোগ রয়েছে। কারণ 'সংশ্লিষ্ট সবাই' বর্ধিত সময়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন। একই সাথে আওয়ামী লীগের আশঙ্কারও বাহ্যিক ভিত্তি রয়েছে। বিচারপতি কে এম হাসান যথার্থই একদা বিএনপি-র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। দলীয় অবস্থান থেকে আওয়ামী লীগ বিচারপতি কে এম হাসানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতেই পারে। যদিও নীতিগতভাবে আশা করা হয়, একজন ব্যক্তি দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারক নিযুক্ত হবার পর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক চিন্তাধারার বদলে আইন, নীতি ও বিবেক দ্বারাই তার সমুদয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

আওয়ামী লীগের অনমনীয় দাবির প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষক মহলের একাংশ মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য যেহেতু ছয়টি সাংবিধানিক বিকল্প (সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি, তার অসম্মতিতে তার পূর্ববর্তী প্রধান বিচারপতি, তার অসম্মতিতে আপীল বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণকারী সর্বশেষ বিচারপতি, তার অসম্মতিতে তার পূর্ববর্তী অবসর গ্রহণকারী 'আপীল-বিচারপতি', তার অসম্মতিতে সর্বদল সমর্থিত অন্য পেশার একজন, তা-ও পাওয়া না গেলে প্রেসিডেন্টেরই নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করার কথা) রাখা হয়েছে, যেহেতু 'প্রথম বিকল্প' বিচারপতি কে এম হাসানের বিষয়ে 'রাজনৈতিক কারণে' আওয়ামী লীগের (এবং আরো কারো কারো) অনাস্থা রয়েছে এবং যেহেতু বিচারপতি কে এম হাসান থেকে বিএনপি অন্যায্য কোনো নির্বাচনী সুবিধা আশা করে না, তাই বিএনপি-র এবং সরকারের উচিৎ, বিচারপতি কে এম হাসান প্রশ্নে নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করা। সরকার ও বিএনপি নিজের এ নমনীয় অবস্থানের কথা স্পষ্ট করে আওয়ামী লীগ পক্ষকে জানিয়ে দিলে আশা করা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী তীব্র আন্দোলনের পরিকল্পনা থেকে ফিরে আসবে। তাতে সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদের অবশিষ্ট দিনগুলো শান্তি ও স্বস্তিসহ অতিবাহিত করতে পারবে, জনগণও নিজেদের অর্থনৈতিক ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পাবে। তা না করা হলে বিচারপতি কে এম হাসান প্রশ্নে অনমনীয় আওয়ামী লীগ এর স্বভাবসুলভ ত্রাস সৃষ্টিকারী আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে আশঙ্কার কারণ রয়েছে। বিচারপতি কে এম হাসানের অপারগতার প্রেক্ষাপটে বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী প্রধান উপদেষ্টার পদে এলে কোনো সাংবিধানিক জটিলতারও কারণ ঘটবে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে দেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টের হাতে রাখার বিধান করা হয়েছিলো সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিলো, ৩ মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি পূর্ণত একটি জবাবদিহিতামুক্ত অনির্বাচিত সরকার। এ সময়ে কেবল

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টই একমাত্র জনগণের নিকট পরোক্ষ জবাবদিহিতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ, যিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচন সরকারের পরিবর্তন ঘটায়। তাই এর সাময়িক কর্তৃত্ব অনির্বাচিত কর্তৃপক্ষের নিকট রাখা গেলেও প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের হাতে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের দায়িত্ব অর্পিত। তাই পরোক্ষে হলেও জনগণের নিকট দায়বদ্ধ প্রেসিডেন্টের হাতেই প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের দায়িত্ব অর্পণ যৌক্তিক ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়েছিলো। আওয়ামী লীগ ও আরো ক'টি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল দাবি তুলেছে, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতেই অর্পণ করতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ উন্মুক্ত বিতর্কে মিলিত হতে পারে এবং আরেক দফা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ বিষয়েও ক্ষমতাসীন ও বিরোধীপক্ষের অনমনীয়তার প্রয়োজন বা বাধ্যতা আছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া নির্বাচনের বিধানাবলী ও নির্বাচন কমিশন গঠন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ও আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করার সুযোগ আছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন পক্ষের মনে রাখা উচিৎ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং নির্দিষ্টভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীপক্ষ অনেক কঠিন দাবি তুলে থাকে। কোনো দাবি বিষয়ে যদি সব বিরোধী দল একমত পোষণ করে এবং সে দাবি মানতে সুস্পষ্ট বাধা না থাকে, তবে ক্ষমতাসীনদের উচিৎ সে দাবি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশী রাজনীতির বাস্তবতা হলো, আওয়ামী লীগ এখনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোনো দাবি বা প্রস্তাবই উত্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। আওয়ামী লীগের দাবি যদি বিচারপতি কে এম হাসানের বদলে বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরীর প্রসঙ্গ হয়, তবে ক্ষমতাসীনদের উচিৎ হবে সে দাবির প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা। এটা নিশ্চিত যে, বিচারপতি কে এম হাসান বা বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী বিএনপি বা আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম নন।

রাজশাহী, ১০ মার্চ ২০০৫

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-৬

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ ২০০৫

'তত্ত্বাবধায়ক সমস্যা' : সরকারের যৌক্তিক আচরণ জরুরি

ড. তারেক ফজল

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে বাংলাদেশের রাজনীতি উত্তপ্ত হওয়ার দিকে এগুচ্ছে। আওয়ামী লীগসহ আন্দোলনকারী বিরোধী দলসমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি করছে অনেক দিন থেকে। কিন্তু এ সংস্কার প্রস্তাব নির্দিষ্টভাবে এখনো তারা উপস্থাপন করেনি। এর বিপরীতে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের সদস্যরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধী দলের এ সংস্কার দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, পরবর্তী নির্বাচন সংবিধানের নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ীই হবে। তবে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে আলোচনায় সরকারের আগ্রহের কথা তারা প্রকাশ করেছেন। গত ১৫ মার্চ জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি একটি ' তত্ত্বাবধায়ক সমস্যায়' পরিণত হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকগণ বলছেন। তবে অনেকেই মনে করেন, শাসকদের যৌক্তিক আচরণ এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। অপরদিকে অযৌক্তিক আচরণ সমস্যাটিকে সংকটে পরিণত কতে পারে। এর পরিণাম দেশ-জাতি-রাজনীতি সবার জন্যই অকল্যাণকর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশের দায়িত্বশীল রাজনীতিকরা প্রায়শই দায়িত্বহীনের মতো আচরণ করে থাকেন। এ আচরণ এতই ব্যাপক যে, সে সবের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিষয়ে রাজনীতিকরা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। চলতি মার্চের প্রথমার্ধে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের নিয়মিত বিতর্কের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের এক শীর্ষ নেতা বললেন, '১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি এক প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদে তৎকালীন বিএনপি সরকার একদলীয় ভিত্তিতে তাড়াহুড়া করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। অথচ বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াই বলেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমি জানি না, মানি না এবং শিশু ও পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়।' এ বক্তব্যের বেশ কিছু প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ পাওয়া জরুরি। ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি প্রসঙ্গে প্রথমে বলা যাক। ১৯৯৪-এর প্রথমার্ধে মাগুরা-২ উপনির্বাচনে তৎকালীন শাসক দল ও সরকারের কিছু অন্যায্য আচরণ আর বিরোধী দলের ঢালাও দাবির প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগসহ প্রায় সকল বিরোধী দল 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা দাবি করে। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার সে দাবি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারই এক পর্যায়ে মুন্সিগঞ্জে এক জনসভায় বেগম জিয়া তার বহুল আলোচিত উক্তিটি করেছিলেন : 'আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার জানি না, মানি না। শিশু ও পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়।' তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে 'জানি না, মানি না' বলে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ১৯৯৬ সালে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা' প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি সেই বক্তব্যের 'প্রায়শ্চিত্ত' করেছেন এবং প্রসঙ্গটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমাপ্তিও ঘটেছে। তবে ব্যক্তির নিরপেক্ষতা বিষয়ে বেগম জিয়া যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাকে এক কথায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। অবশ্য সাধারণভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিকরা ব্যক্তির নিরপেক্ষতার বিষয়ে গুরুতর বিভ্রান্তিকর

www.pathagar.com

বক্তব্য দিয়ে থাকেন, সম্ভবত এ বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণার কারণে। রাজনীতির কোনো প্রসঙ্গ বা ইস্যুতেই যে কোনো বোধসম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা অসম্ভব। নির্বাচন, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ অথবা রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির মতো সাংবিধানিক কোনো ইস্যু বা বিষয়েই বোধসম্পন্ন কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। বিরোধী দলের দাবিমতো তিনি যদি ত্রয়োদশ সংশোধনীতে 'নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করতেন, তাতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গভীর শূন্যতা ও সংকটের সৃষ্টি হতে পারত। নির্দলীয় ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তি পাওয়া অসম্ভব। একদা যে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন নিরপেক্ষ বলে কথিত ছিলেন, সহসাই তিনি 'পক্ষভুক্ত' ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। শেখ হাসিনার পছন্দের সিইসি এম এ সাঈদ এবং 'আপত্তিকর' বিচারপতি লতিফুর রহমান দ্রুতই 'পক্ষপাতিত্বে'র বোঝা বহন করেছেন। রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিকরা এটি যত দ্রুত অনুধাবন করবেন, এ জাতির জন্য তা ততই মঙ্গল বয়ে আনবে।

এবার ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) নির্বাচন বিষয়ে কথা বলা দরকার। বিএনপির বিরোধী রাজনীতিকদের বক্তব্য শুনে মনে হতে পারে, বিএনপি সে সময় পরিকল্পিত প্রক্রিয়াতেই একটি প্রহসনমূলক নির্বাচন করেছিল। বাস্তবতা তা নয়। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতসহ বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদের ৯০ কার্য দিবসের বেশি বিনা অনুমতিতে সংসদের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকার প্রেক্ষাপটে সে সব আসন শূন্য ঘোষিত হয়। বিরোধীদলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতিতে বাহ্যত একদলীয় সংসদ অব্যাহত রাখতে না চাওয়া, সেই সংসদে দুই শতাধিক (দুই-তৃতীয়াংশ, মোট সদস্যের) সরকার দলীয় সদস্য না থাকা, সকল বিরোধী দলের দাবিকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিরোধী দলের অব্যাহত হরতাল ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম ঠেকানোর লক্ষ্যেই বেগম জিয়ার সরকার পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ সংবিধানের সংশোধন ছাড়া বিরোধী দলের দাবি পূরণ সম্ভব ছিল না। আবার সংবিধান সংশোধন করার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংসদ সদস্যও বিএনপির ছিল না। কিন্তু 'স্থায়ী নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি'র অধিকারী শেখ হাসিনা ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ তারিখকে 'গণকার্ফিউ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সাবধান করে দেন, এ দিন ভোট দিতে গিয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আওয়ামী লীগ দায়ী থাকবে না। এ হুমকি অগ্রাহ্য করে সে দিন ভোটকেন্দ্রে অল্প সংখ্যক ভোটারই কেবল উপস্থিত হয়ে ভোট দিয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই ভোটার উপস্থিতি শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগের মতো হয়েছিলো বলে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়। কিন্তু সরকারি অদৃশ্য চাপে সে সময়ের নির্বাচন কমিশন উপস্থিতির হার ৫০%-এর বেশি বলে প্রকাশ করে। ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে 'অনিবার্য বিজয়' অর্জন করে বিএনপি অতি দ্রুততার সাথে ২৫ মার্চ শেষ রাতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী সম্পন্ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় সে বছর ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে ২৩ জুন। পর্যবেক্ষক মহল প্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'দলীয় আচরণের' অনেক দৃষ্টান্ত সে সময় উপস্থাপন করেছিলেন। সুতরাং আজ যে কারও স্বীকার করা উচিত, ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি সেই 'অভিযুক্ত নির্বাচন'টি ছিলো সময়ের দাবি, নিছক প্রহসনমূলক নির্বাচন নয়। আওয়ামী লীগের হুমকি না থাকলে সে নির্বাচনেও একটি 'গড়পরতা' ভোটার উপস্থিতি ঘটতে পারতো।

www.pathagar.com

এবার চলতি তত্ত্বাবধায়ক সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। অনেকদিন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বললেও আওয়ামী লীগ এখন পর্যন্ত সম্ভাব্য সংস্কার প্রস্তাবটিও স্পষ্ট করে উপস্থাপন করতে পারেনি। এটি নিঃসন্দেহে দলটির এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যর্থতা। এ জন্য সচেতন নাগরিকদের অনেকে মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের দাবির ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। গত ১৪ মার্চ আওয়ামী লীগের গোলটেবিল বৈঠকে প্রফেসর শামসুল হুদা হারুনের মাধ্যমে যে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়, সেটিও দলটির চূড়ান্ত প্রস্তাব নয়। একটি সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রস্তাব দলটি এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৯৫) নাগাদ উপস্থাপন করবে বলে পত্রিকান্তরে রিপোর্ট করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের যে ধারণা জানানো হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে

ক. সাংবিধানিক বিভিন্ন পদবিধারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধির ফলে 'রাজনৈতিক অঙ্কের' হিসাবে বিচারপতি কে এম হাসানের পরিবর্তে অন্য কাউকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ,

খ. সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা করা.

গ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্বও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে হস্তান্তর,

ঘ. নিবার্চন কমিশনকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগত স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা প্রদান। সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের বিষয়ে বিরোধী দল যে সন্দেহ ও সংশয়ের অঙ্গুলি তুলেছে, এটি সাধারণভাবে অন্যায্য হলেও জোট সরকারের তা মনোযোগ ও নমনীয়তার সাথে বিবেচনা করা উচিত। সরকার সাংবিধানিক পদবিধারীদের অবসরের বয়স সীমা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বাড়ায়নি– এ কথা প্রমাণের জন্য এবং নিজেদের রাজনৈতিক সততা প্রতিষ্ঠার জন্য হলেও ক্ষমতাসীনদের এ বিষয়ে নমনীয় হওয়া দরকার। একজন বিচারপতি কে এম হাসান 'বিএনপি জোটকে' নির্বাচনে জিতিয়ে আনার জন্য প্রায় কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন না। তাই কেবলই সাংবিধানিক আইনের আক্ষরিক শুদ্ধতা রক্ষার নামে ক্ষমতার বাইরের সব দলকে আন্দোলনমুখী করার পথ থেকে সরকারের ফিরে আসা কর্তব্য বলে মনে করি। সাংবিধানিক 'সৎ আইনের শুদ্ধতা' রক্ষার তাগিদ থাকলেও জোট সরকারকে মনে রাখতে হবে, আইন মানুষের জন্য এবং দেশ ও জাতির স্বার্থ একজন ব্যক্তির সম্ভাব্য সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। বিচারপতি কে এম হাসানের ইস্যুতে জোট সরকার নমনীয় হলে আওয়ামী লীগের অন্য দাবির বিষয়গুলো সহজেই সুরাহা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-৭

তত্ত্বধায়ক বিতর্ক
'বিব্রতকরণের রাজনীতি' আর 'সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতার' তত্ত্ব অন্যায্য ও অবাস্তব

ড. তারেক ফজল

ড. আসিফ নজরুলের সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধের (প্রথম আলো, 'সময়চিত্র', ১৩ এপ্রিল ২০০৫) জন্য তাকে সাধুবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সরকার প্রধান বিষয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে ড. আসিফ যে নীতিনিষ্ঠ ও সাহসী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, দলান্ধ এবং মতান্ধ নন এমন সকল পাঠক-নাগরিক তাতে স্বস্তি বোধ করবেন। ড. আসিফের বিশ্লেষণকে নীতিনিষ্ঠ ও সাহসী বলছি, কারণ এ সময়ে বিভিন্ন দৈনিক-সাপ্তাহিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্তম্ভকার (কলামিস্ট) তাদের লেখায় ইনিয়ে-বিনিয়ে একটি নির্দিষ্ট মত ও দলের বক্তব্যকেই কেবল যৌক্তিক প্রমাণের চেষ্টা করেন, 'মুদ্রার অন্য পীঠ' দেখার চেষ্টা করেন না অথবা তেমন সাহস রাখেন না। কারণ মত ও দল বিরোধী যে কোনো বক্তব্য ও বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট স্তম্ভকারের নানাবিধ অনিষ্টের কারণ হতে পারে। এ বাস্তবতাটি বাংলাদেশের রাজনীতির ডান এবং বাম-আওয়ামী এবং বিএনপি উভয় ধারার ক্ষেত্রে সমভাবে দৃশ্যমান। ড. আসিফের বিশ্লেষণ সে দিক থেকে নির্দিষ্ট কোন দল ও মতকে অন্ধভাবে অনুসরণ থেকে মুক্ত থেকেছে। পাঠককে জানিয়ে রাখি, ড. আসিফকে এই আমি অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানালেও আমি তার সাথে এখনও পরিচিত হবার সুযোগ পাইনি। আমি রাজনীতির এক নগণ্য ছাত্র এবং মফস্বলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই আর ড. আসিফ আইনের পণ্ডিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষক।

সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়ক বিতর্ক পর্যায়ে ড. আসিফের মূল্যায়ন: 'কয়েক বছর প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। প্রধান বিচারপতি হিসেবে রাষ্ট্রের সংবিধানের সর্বোচ্চ রক্ষক ছিলেন। সর্বোচ্চ আদালতের বেঞ্চ গঠন করা হতো তার পরামর্শে। মৌলিক অধিকার বজায় রাখার বিচার কাঠামোর প্রধান ছিলেন তিনি। প্রধান বিচারপতি থাকাকালে বা এরও আগে বিচারক-জীবনে কখনো আপত্তি আসেনি তার বিরুদ্ধে, কখনো সমালোচনা হয়নি তার, কখনো আস্থা হারান নি কারো। আইন ও সংবিধানের রক্ষক হিসেবে তাকে মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের আংশিক দায়িত্ব তাকে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে।....তাকে নাকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে বিব্রত হওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হবে। কেউ কেউ আগবাড়িয়ে এমন বলছেন তিনি দায়িত্ববান, বিচক্ষণ ও সম্মানী মানুষ, বিব্রত বোধ করাই সমীচীন তার। কিন্তু তিনি বিব্রত হলেই কি সমস্যা শেষ হবে? হবে না।'

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ প্রস্তাবনা বিষয়ে ড. আসিফের বিশ্লেষণ: 'বিরোধী দল, বুদ্ধিজীবী, সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীদের কেউ কেউ দাবি তুলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করতে হবে 'সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কাউকে'। আমাদের সংবিধান অনুসারে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের কেউই রাজি না হলে কেবল 'সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কাউকে' প্রধান উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত করার অবকাশ আছে। ... 'গণতন্ত্র বিনির্মাণের' জন্য সংবিধানের ওপর অস্ত্রোপচার হয়তো হতে পারে আবার। কিন্তু সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কাউকে

www.pathagar.com

কি তারপরও পাওয়া যাবে ? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, সেই তিনিও কি নির্বাচনের পরে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকবেন? আগের জনরা কি থাকতে পেরেছিলেন?'

আমি সম্ভবত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম লিখেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে (জনকণ্ঠ, ৫ মে ১৯৯৪)। তখন বলেছিলাম, সবগুলো বিরোধীদল যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা দাবি করছে, বিএনপি সরকারের উচিৎ এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দেয়া। কারণ দেশ ও জনগণের কল্যাণ বিষয়ে চিন্তা করা ও কথা বলার অধিকার যেমন সরকারের আছে, তেমনি বিরোধী দলেরও আছে। আর যদি বিএনপি সরকারের এমন আস্থা থাকে যে জনগণই এ ব্যবস্থাটি চায় না, তবে সরকারের উচিৎ এ বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করা। তাতে জনগণ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভোট দিলে বিরোধী দল আর দাবি তোলার সুযোগ পাবে না। এতে করে দেশ ও জনগণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য এবং সীমাহীন অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। বিএনপি সরকারের সেই উপলব্ধি এসেছিলো বটে, তবে তা যথেষ্ট বিলম্বে।

বিরোধী দলের 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' সাথে আমি সুস্পষ্ট দ্বিমত পোষণ করেছি বিভিন্ন পর্যায়ের লেখার মাধ্যমে। বলেছি, একজন ব্যক্তির পক্ষে 'নির্দলীয়' অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব কিন্তু কখনোই 'নিরপেক্ষ' অবস্থানে থাকা সম্ভব নয়। তখন বিভিন্ন লেখায় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং নমুনা-উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি উপস্থাপন করেছি আমি। কিন্তু এটি বিশেষভাবেই ত্যক্ত-বিরক্ত হবার মতো বিষয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিকরা এই নিরপেক্ষতার মায়া কাটাতে পারছেন না, যদিও এই রাজনীতিকরাই আবার তাদের কথিত নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের পিঠে পক্ষপাতিত্বের সীল মেরে চলেছেন। রাজনীতিতে কারো পক্ষে যে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়, তা এ দেশের রাজনীতিকরা যতো দ্রুত বুঝবেন এবং জানবেন, দেশ ও জনগণের ততোই কল্যাণ হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিকরা আবার 'সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি' খুঁজতে শুরু করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পদের জন্য। এই রাজনীতিকদের দলে ডক্টর কামাল হোসেনের মতো শিক্ষিত রাজনীতিকরাও রয়েছেন। গত ১৪ মার্চ ২০০৫ তারিখে আওয়ামী লীগ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে প্রথম এ দাবি তোলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (সমাজবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক এবং আরো অনেক গুণে নন্দিত) প্রফেসর ডক্টর বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। এরপর আওয়ামী লীগের নেতা রহমত আলীসহ রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ দাবিটিকে নিজেদের দাবি হিসেবে সাগ্রহে সোচ্চার কণ্ঠে উপস্থাপন করছেন। ড. আসিফের প্রশ্নের জবাব থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় এবং নিশ্চিত করেই দাবি করা সম্ভব যে, বাংলাদেশের বাস্তবতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অথবা উপদেষ্টা হিসেবে কাউকেই 'সকলের' অথবা 'সকল দলের' কাছে 'গ্রহণযোগ্য' হিসেবে পাওয়া যাবে না। স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে পরিচিত এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি ছাড়া অন্য দলগুলোর এক ধরনের সমঝোতাতেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন শাসক হিসেবে বাছাই করা সম্ভব হয়েছিলো। বিচারপতি হাবিবুর রহমান বা বিচারপতি লতিফুর রহমান 'সকলের' বা 'সকল দলের' কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হননি, হয়েছেন সাংবিধানিক কাঠামোর নির্দেশনার আলোকে। আর এ দু'সরকারের উপদেষ্টারা নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পছন্দ বা মনোনয়নের ভিত্তিতে। এখন যদি দেশ-বিদেশের চাপের মুখে ক্ষমতাসীন জোট সরকার সংবিধান সংশোধন করে বিধান করে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ সকলের অথবা সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হবেন, তাহলে আমি সর্বোচ্চ নিশ্চয়তাসহ দাবি করতে পারি, বাংলাদেশে আর

www.pathagar.com

কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না কফি আনান-বুশ-ব্লেয়ারসহ বিশ্বের সব নেতাদের এনে জড়ো করলেও। বাংলাদেশের একজন বোধ সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিককেও পাওয়া যাবে না, যাকে 'সকলে' দূরে যাক, 'সকল দলের' (সকলে-র সংজ্ঞা কি আর সকল দল এর সংজ্ঞা কি আগে তা স্থির করতে হবে। 'সকলে' বলতে সকল বাংলাদেশী নাগরিক এবং সকল ভোটার হতে পারে আর 'সকল দল' বলতে বাংলাদেশের 'তালিকাভুক্ত সকল দল' হতে পারে। প্রফেসর বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বা এডভোকেট রহমত আলী কী বোঝাতে চেয়েছেন অথবা কোন্ অর্থে ডক্টর কামাল হোসেন ও অন্যরা এটি সমর্থন করছেন, তা-ই আগে নিশ্চিত করা দরকার) কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। 'নিরপেক্ষতা' প্রশ্নে এর আগে আমি বলেছি, খালেদা জিয়ার উচ্চারিত 'শিশু ও পাগল ছাড়া' বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধ সম্পন্ন কোনো নাগরিক রাজনীতির প্রশ্নে কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারেন না এবং বেগম খালেদা জিয়া ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বিরোধী রাজনীতিকদের দাবিকৃত 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' স্থলে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' ব্যবস্থা করে জাতিকে একটি নিশ্চিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন, এখন আবার 'সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির' দাবি তুলে বাংলাদেশের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীগণ এ রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকেই এক মহা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। সহজ কথায় মানা উচিৎ, 'আওয়ামী ঘরানার' কাছে যিনি এবং যারা 'গ্রহণযোগ্য', তিনি এবং তারা নিশ্চিতভাবেই 'বিএনপি ঘরানার' কাছে অগ্রহণযোগ্য হবেন। এর বাইরেও বাম এবং ডানপন্থী অসংখ্য ক্ষুদ্র দল-গোষ্ঠীতো আছেই। 'সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্যতার' সাংবিধানিক শর্ত তাই পূরণ করা কখনোই সম্ভব হবে না। তার চাইতে বরং বিদ্যমান সাংবিধানিক আয়োজনের মধ্যেই সেরা ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করা উচিৎ। সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়ে ড. আসিফের মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করেই বলছি, একদা বিচারপতি হাসানের বিএনপি-সম্পৃক্ততা এবং বর্তমানে বিএনপি নেতৃত্বের সরকার দ্বারা সাধিত সাংবিধানিক সংশোধনীর বলেই (যদিও এটি সুপ্রিম কোর্টসহ পিএসসি, নির্বাচন কমিশন এবং সিএজিকেও স্পর্শ করেছে) যেহেতু তিনি পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারে প্রধান উপদেষ্টার সুনির্দিষ্ট দাবিদার হতে পারছেন, তাই আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি বিরোধী দলের আপত্তির প্রেক্ষাপটে বিচারপতি কে এম হাসান প্রশ্নে ক্ষমতাসীন বিএনপির নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করা উচিৎ। তাতে বিএনপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রশ্নের সুযোগ কমে যাবে এবং দেশ-জাতি সম্ভাব্য রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী দায়িত্বসহ নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংলাপ বা আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

পুনশ্চ: ভোটের রাজনীতির মানদণ্ডে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় বা চতুর্থ শক্তি সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার প্রস্তাবের সথে একমত নয় বলে পত্রিকান্তরে (নয়া দিগন্ত, ১৬ এপ্রিল ২০০৫) এরশাদ জানিয়ে দিয়েছেন। তাই এটা নিশ্চিত, সবার কাছে তো নয়ই, এমন কি উল্লেখযোগ্য প্রধান দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য একটি 'তত্ত্বাবধায়ক সংস্কার প্রস্তাব'ও আওয়ামী লীগ ও এর সম্ভাব্য জোট উপস্থাপনে ব্যর্থ হতে পারে।

রাজশাহী, ২০ এপিল ২০০৫

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-৮

দৈনিক সমকাল, ১৯ জুলাই ২০০৫

তত্ত্বাবধায়ক বিতর্ক
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বাস্তবায়ন অযোগ্য

ড. তারেক ফজল

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় দফার 'তত্ত্বাবধায়ক বিতর্ক' চলছে। এরশাদ শাসনামলে প্রথম দফার তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কের মূল কথা ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে এরশাদকে বিদায় নিতে হবে। তৎকালীন সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো ধারণা না থাকায় ক্ষমতাসীনদের প্রশ্ন ছিল তত্ত্বাবধায়কের হাতে ক্ষমতা ছাড়ার সাংবিধানিক পন্থা কী? ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বরের যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলো কার্যত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা প্রকাশ করে, যার কাছে এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে পারেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সেই সরকারটি ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। বিরোধী দল তাতেই তুষ্ট হয় এবং ক্ষমতার মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ঘটে।

বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে ১৯৯৪-এর প্রথমার্ধে অভিযুক্ত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বিরোধী দলগুলো সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তোলে। এ দ্বিতীয় 'তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কে' তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষণ হিসেবে উচ্চারণ করেন 'নির্দলীয় ও নিরপেক্ষতা'র। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রথমে পুরো দাবিটিকেই অস্বীকার করেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে'র বিষয়ে প্রশ্ন তুলে দাবি করেন, 'পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়।' তৎকালীন বিরোধী দল ও পত্রিকার অনেক কলামিষ্ট বেগম জিয়ার এ উক্তির জন্য তাকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেছিলেন। অথচ তা ছিল যথার্থ। কারণ বিরোধী দলের দাবিমতো নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হলে দেশ ও জাতি একটি গুরুত্ব সাংবিধানিক সঙ্কট ও জটিলতার মধ্যে পড়তে পারত। রাজনীতির বিষয়াদিতে কোনো সুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তি নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। কেউ আজ যার কাছে নিরপেক্ষ, কাল তার কাছেই গুরুতরভাবে পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রতীয়মান হতে পারেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সেটি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন, সাবেক সিইসি এমএ সাঈদসহ অনেকের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। তাই বিরোধী দলের দাবিকৃত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থলে কেবল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করে বেগম জিয়া রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়ই দিয়েছিলেন এবং তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কের দ্বিতীয় দফার অবসান ঘটান।

তৃতীয় দফার তত্ত্বাবধায়ক বিতর্ক শুরু হয় বেগম জিয়ার নেতৃত্বে চারদলীয় জোট অষ্টম জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর থেকেই। তবে তা জোরদার হয় সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাস হওয়ার অব্যবহিত পর থেকে। অবশ্য এ সংশোধনীর বক্তব্য জানার পর থেকেই এ বিতর্ক জোরদার হতে থাকে। সংশোধনীটিতে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ও সাংবিধানিক পদধারীদের অবসরের বয়স সীমা বৃদ্ধির বিধান করা হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, সিএজি ও বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ সব প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনকারীদের অবসরের বয়স সীমা ২-৫ বছর করে বাড়ানো হয়েছে। চতুর্দশ সংশোধনীতে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়স সীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছরে উন্নীত করায় বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মুদাচ্ছির পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের

www.pathagar.com

সময়েও প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে বহাল থাকবেন এবং একই কারণে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অবস্থানে থাকবেন বিচারপতি কে এম হাসান। বিরোধী দল দাবি করেছে, বিচারপতি কে এম হাসান আগে বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বর্তমান জোট সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে বিচারকদের অবসরের বয়স সীমা বাড়িয়েছে। কারণ, সংবিধান অনুযায়ী (৫৮ গ) সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণের জন্য প্রথম আমন্ত্রণ জানাতে হবে। আওয়ামী লীগ ও এর সমমনা দলগুলো পরবর্তী প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমদ সর্বশেষ বক্তব্যে জানিয়েছেন, বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হলে সারা দেশে আগুন জ্বলবে। বাংলাদেশের বিরোধী দলের তৃতীয় দফার তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছেন একজন ব্যক্তি, বিচারপতি কে এম হাসান। অবশ্য এর আগে আওয়ামী লীগ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টার হাতে প্রদান, দলীয় প্রেসিডেন্টের পদত্যাগসহ কয়েকটি দাবি তুলেছিল। বিদ্যমান সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিপরীতে ১৪ দল দাবি করছে, সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বদলে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করতে হবে। বলা বাহুল্য, এমন সাংবিধানিক বিধানের জন্য সংবিধান সংশোধন করার বিকল্প নেই।

আওয়ামী লীগ এবং ড. কামাল হোসেনসহ অনেক বিরোধী দল ও ব্যক্তি সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা করার যে দাবি তুলেছে, এটি যে শাব্দিক অর্থে কোনো ক্রমেই বাস্তবায়নযোগ্য নয়, তা বর্তমান নিবন্ধকারসহ কয়েকজন বিশ্লেষক স্পষ্ট করেই বলেছেন। কারণ, রাজনীতিতে যেমন কেউ নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তেমনি কেউ সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্যও হতে পারেন না। বাংলাদেশের অন্যতম বড় দল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ ইতোমধ্যেই বলে দিয়েছেন তিনি বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন এবং তিনি বিদ্যমান সাংবিধানিক বিধানের আলোকেই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। বাংলাদেশের নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পর এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি তৃতীয় প্রধান দল। ক্ষমতায় রয়েছে প্রথম বা দ্বিতীয় প্রধান দল বিএনপি এবং চতুর্থ প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী। অন্যতম প্রধান দল আওয়ামী লীগ যাদের সঙ্গে মিলে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রধান উপদেষ্টার দাবি ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে, নির্বাচনী ফলাফলে তারা দেশ ও নিজেদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ যদি বাস্তবায়ন অযোগ্য সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রধান উপদেষ্টার দাবিতে অটল থাকে, তবে বাংলাদেশ বছর দেড়েকের মধ্যে যথার্থই রাজনৈতিক সংকট ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়বে। তাদের এ বিষয়ে ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের নেতৃবৃন্দকেও ব্যক্তিভিত্তিক ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ব্যক্তি বিচারপতি কে এম হাসানই যদি আওয়ামী লীগের ভিন্ন মতের প্রধান বিষয় হন, তবে তার বিকল্প সংবিধানেই সহজ ভাষায় বলে দেওয়া আছে। ব্যক্তি বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত করার মতো অতি ক্ষুদ্র কিন্তু কৌশলী ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমেই (যাতে বিচারপতি হাসানের পূর্ববর্তী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের বিচারপতি দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ পাবেন) সমগ্র বাংলাদেশকে বড় ধরনের সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব রক্ষা করতে পারেন। ব্যক্তি বিচারপতি হাসানের চাইতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবেন বলে পর্যবেক্ষক মহল আশা করেন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-৯

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ নভেম্বর ২০০৬

প্রসঙ্গ : অবরোধ এবং বিজয়

ড. তারেক ফজল

২৩ নভেম্বর নাগাদ দেশবাসী জেনেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বিচারপতি এম এ আজিজ কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে তিন মাসের ছুটিতে গেছেন। প্রেসিডেন্ট ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (চীফ এডভাইজর-সিএ) প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ ২২ নভেম্বর মধ্যরাতে সিইসি-র শর্তসাপেক্ষে স্বেচ্ছায় ছুটিতে যাবার তথ্য জাতির উদ্যেশে দেয়া এক ভাষণের মাধ্যমে জানান। প্রেসিডেন্টের সাথে এ রাতেই সাক্ষাৎশেষে দলীয় সভানেত্রীর সাথে কথা বলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ২২ নভেম্বর মধ্যরাতে প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন, 'সাবেক জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দাবি করেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচাপতি কে এম হাসানের অধীনেই নির্বাচনে যেতে হবে। অবরোধের ফলে তিনি বিদায় নিয়েছেন। খালেদা জিয়া বলেছিলেন, সিইসি বিচারপতি এম এ আজিজের নেতৃত্বেই নির্বাচন হবে। আন্দোলনের মুখে তিনিও বিদায় নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণ অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। তাই আগামীকালও (২৩ নভেম্বর) অবরোধ চলবে। দেশবাসী আগামীকাল বিজয় মিছিল করবে।'

২৩ নভেম্বর দুপুর পর্যন্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট নেতাদের বৈঠক চলছিলো। এর আগে ২২ নভেম্বর শেখ হাসিনা বলেন, 'একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি আদায়ের জন্য অবরোধের কারণে সৃষ্ট সাময়িক দুর্ভোগ জনগণকে স্বীকার করতে হচ্ছে। সিইসি বিচারপতি এম এ আজিজ ও সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি কে এম হাসানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। বিচারপতি কে এম হাসান একদা (বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হবার আগে) বি এন পি দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়স সীমা উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিবর্তন করে চার দলীয় জোট সরকার বিচারপতি কে এম হাসানের পক্ষে প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা গ্রহণের পথ সুগম করেছে'-এ অভিযোগে ১৪ দল দুই বৎসরের বেশী সময় যাবৎ আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে এবং অবশেষে ২৭-২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠা হাতে রক্তাক্ত অবরোধের মুখে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশে বিচারপতি কে এম হাসানকে বাধ্য করেছে। বিচারপতি কে এম হাসানের দায়িত্ব গ্রহণে এ অস্বীকৃতি বাহ্যত ১৪ দলীয় আন্দোলনের একটি সাফল্য।

২০০৫ সালে সিইসির দায়িত্ব লাভের পর থেকেই আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল বিচাপতি এম এ আজিজকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তার অপসারণ দাবি করে আসছে। ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা প্রনয়ণ বিষয়ক কার্যক্রমে বিচারপতি আজিজের বিভিন্ন আচরণ, কার্যক্রম ও মন্তব্য তার 'চির বিরোধী' ১৪ দলীয় রাজনীতিকদের ছাড়াও সমাজ-রাষ্ট্রের আরো অনেককেই বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন করেছিলো। ১৪ দলসহ আরো কিছু দল ও জোট সিইসি বিচারপতি আজিজের অপসারণ চেয়েছিলো। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা এ দাবি পূরণের আইনগত ও সাংবিধানিক বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে অনুধাবন করেছিলেন, সাংবিধানিক বিধিমালা অক্ষুণ্ন রেখে সিইসিকে

www.pathagar.com

অপসারণ করা সম্ভব নয় এবং এমনকি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোরও সুযোগ নেই। অন্যদিকে ১৪ দলীয় জোটসহ আরো কয়েকটি দল ও জোট কোনোভাবেই বিচারপতি আজিজের নেতৃত্বে নির্বাচনে যেতে প্রস্তুত ছিলো না। আর সিইসি বিচারপতি আজিজও দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলেন না। কোনো কোনো উপদেষ্টার অনানুষ্ঠানিক অনুরোধও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ পর্যায়ে উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্য প্রেসিডেন্টের সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি করে বলেন, কেবল প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপেই বিদ্যমান সঙ্কটের সমাধান আসতে পারে। প্রেসিডেন্ট তার প্রতিনিধি হিসেবে ৩ জন উপদেষ্টাকে বিচারপতি আজিজের নিকট পাঠানো ও তাদের 'অপ্রকাশিত সমঝোতার' প্রেক্ষাপটেই ২২ নভেম্বর মধ্যরাতে বাহ্যত 'সিইসি বিচারপতি আজিজ' সঙ্কটের একটি সমাধান হয়। এ সমাধানকে ১৪ দলের সমন্বয়কারী আব্দুল জলিল তাদের বিজয় বলে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতির বিশ্লেষকদের একটি অংশ মনে করেন, বিচারপতি কে এম হাসান ও বিচারপতি এম এ আজিজের ঘটনায় ১৪ দলীয় জোট নিজেদেরকে প্রকৃত অর্থে বিজয়ী ভাবার অবস্থানে নেই। বিচারপতি কে এম হাসান ছিলেন 'আসন্ন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা' তার অর্থ, তখনও তিনি সাংবিধানিকভাবে 'কর্তৃত্বপ্রাপ্ত' কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। এ অবস্থায় বাহ্যত ভীতিকর-ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে ১৪ দল বাধ্য করেছে। সাংবিধানিক কর্তৃত্বহীন একজন ব্যক্তি একটি সাংবিধানিক কর্তৃত্ব গ্রহণে বিরত থেকেছেন মাত্র, এখানে এর চাইতে বেশী কিছু ঘটেনি। সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সাংবিধানিকভাবে আরো নির্দিষ্ট ৫টি বিকল্প ছিলো। সেসব বিকল্পের শেষটি ছিলো প্রেসিডেন্ট অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেবেন। বাস্তবে কেবল তা-ই ঘটেছে। নেহায়েত দলীয় বিবেচনা থেকে বলতে গেলে বলা যায়, ১৪ দলীয় ভয়ঙ্কর আন্দোলনের কারণে বি এন পির একজন 'সাবেক দলীয় নেতা', যিনি বাহ্যত দেড় যুগেরও বেশী সময় দলটির সাথে যুক্ত নন, বিচারপতি কে এম হাসান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে সক্ষম না হলেও বি এন পি-র স্বীকৃত ও প্রকাশ্যভাবে মনোনীত একজন ব্যক্তিই, প্রেসিডেন্ট, সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে আওয়ামীলীগ বা ১৪ দলের বিজয়ের কী আছে? বিএনপি এবং চারদল যদিও বলেনি (চারদল সাংবিধানিক বিধিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষার দাবি করেছে), কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিজয়তো হয়েছে বিএনপি এবং চারদলের। তাদের সমর্থিত এবং স্বীকৃত একজন ব্যক্তিইতো প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে 'কাজ' করছেন। রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট 'দক্ষ' হিসেবে স্বীকৃত হলেও আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল প্রকৃতপক্ষে অযথাই বিজয়ের দাবি করছে।

বিচারপতি আজিজের ঘটনায় আওয়ামীলীগ ও ১৪ দলের বিজয়ের প্রশ্নটাও অবান্তর। তারা প্রায় দু'বৎসর থেকে বিচারপতি আজিজের অপসারণ বা পদত্যাগ দাবি করেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো বিচারপতি আজিজ 'স্বেচ্ছায়' কিন্তু 'শর্তসাপেক্ষে' ৩ মাসের ছুটিতে গেছেন। এরপর বিএনপি বা চার দলীয় জোট সরকারের মনোনীত একজন (জ্যৈষ্ঠ) কমিশনারই সিইসির 'ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব' পাবেন। এখানেওতো 'একজন বিচারপতি আজিজের' বিরুদ্ধে অন্তত 'আট দিনের' (দু'দফায়) অবরোধের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতির (অন্যান্য ক্ষতি ও দুর্ভোগ বাদ দিলেও) পর ফল হলো: বিচারপতি আজিজের ৩ মাসের ছুটি গ্রহণ এবং তা-ও তার ইচ্ছাকৃত ও আরোপিত শর্ত অনুযায়ী। এ সবইতো ১৪ দলের দাবির বিফলতা ঘোষণা করছে।

www.pathagar.com

দেশের নির্দলীয় (অবশ্যই 'নিরপেক্ষ' নন। সুস্থ ও শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে পারেন না, পারেন বড়জোর নির্দলীয় হতে। মত বা পক্ষ থাকায় কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা ঘোষিত ও স্বীকৃত আইন ও বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন না করাতে। বাস্তবে নিরপেক্ষতা একটি অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর ও সঙ্কট সৃষ্টিকারী বাজে কথা) বিশ্লেষকদের জন্য বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি বিশ্লেষণ একটি বিব্রতকর ও বিরক্তিকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দেশের রাজনীতির প্রতিটি পক্ষই এবং বিশেষত দু'টি প্রধান পক্ষই প্রতিটি বিশ্লেষণকে সংকীর্ণ বিবেচনা থেকে বুঝতে চায় এবং একজন বিশ্লেষককে নির্দিষ্টভাবে কোনো পক্ষভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। তারা কেউই একটি আইনানুগ বিধিমাফিক-ন্যায্য অবস্থানকে বিবেচনায় নিতে প্রস্তুত নন। আমি মনে করি, রাজনীতিকরা প্রকাশ্যে যেহেতু জাতীয় স্বার্থের কথা বলেন, তাই তাদেরকে গোষ্ঠী বা দলীয়-জোটগত স্বর্থের ওপরে জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় নিয়েই এগুতে হবে। দলীয়-জোটগত বিজয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের সাংবিধানিক বিধিমালা সমুন্নত রেখে সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে কার্যকর রাখার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ, সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিচারপতি কে এম হাসানের 'অপারগতা প্রকাশ' ও বিচারপতি এম এ আজিজের 'স্বেচ্ছায় ও শর্তসাপেক্ষে তিন মাসের ছুটিতে' যাওয়াকে কোনো দল ও জোটেরই বিজয় হিসেবে চিহ্নিত না করে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য 'আপাতত সহায়ক বাস্তবতা' হিসেবে চিহ্নিত করাই উচিৎ। এতে রাজনীতির সকল পক্ষই 'জিতে যাওয়া' বা 'ঠকে যাওয়ার' চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং একটি 'সহজ ও নির্বাচন-উপযোগী' পরিবেশের সৃষ্টি হবে। রাজনীতির সকল পক্ষেরই দায়িত্বশীল উচ্চারণ করা উচিৎ। এতে জাতির স্বার্থই রক্ষিত হবে।

[লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষনা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১০

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ নভেম্বর ২০০৬

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার স্বার্থে

ড. তারেক ফজল

টার্গেট সংসদ নির্বাচন ও ক্ষমতা

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আবর্তিত হচ্ছে। এ নির্বাচনের সূত্রে রাজনীতিকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করতে চান। পশ্চিমা রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের আসল টার্গেটও তাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টন এ কথাই বলেছেন 'অথরিটি' পরিভাষা প্রয়োগ করে। তিনি বলেছেন, মূল্য বরাদ্দের কর্তৃত্ব বা অথরিটি অর্জনের জন্যই আধুনিক বা পশ্চিমা রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলসমূহ সক্রিয় থাকে। রাষ্ট্রক্ষমতা মানে নানামাত্রিক মূল্য (যেমন অর্থ, বিত্ত, সম্পদ, পদ, মর্যাদা, সম্মান প্রভৃতি) বরাদ্দ করতে পারার বৈধ ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় ও বৈধ ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্যই রাজনীতিকদের প্রাণান্ত চেষ্টা।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য 'প্রাণান্ত চেষ্টা' ভালো কাজ। তাই বলে এ লক্ষ্যে অন্যদের 'প্রাণ হরণ' করা কোনোভাবেই ভালো কাজ নয়। এটি নিতান্তই জঘন্য কাজ এবং তা 'প্রাণ হরণকারীদের' জন্যও ভয়ঙ্কর ও করুণাযোগ্য পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব দেশের বিদ্যমান আইন ও বিধানাবলীর আলোকে তাদের আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা। যদি কোনো ক্ষেত্রে বা প্রশ্নে স্বীকৃত আচরণ ও কার্যবিধি না থাকে, তবে সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশের মতামতের আলোকে তা সমাধা করা উচিত। কারণ গণতন্ত্র মানেই অধিকাংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।

রাজনীতির এই নিরপেক্ষতার তত্ত্ব আমি এবং আমার মত আরো অনেক কলাম লেখক ১৯৯৪ সাল থেকে উপস্থাপন করে আসছি এবং আমি আস্থাবান, বাংলাদেশের শিক্ষিতজনদের কারো সচেতনভাবে এ তত্ত্বে ভিন্নমত পোষণ করার কথা নয়। এদিকে বাংলাদেশের রাজনীতির সক্রিয়-আধা সক্রিয় শিক্ষিতজনের সংখ্যা কম নয়। বর্তমানের ৩ মাস মেয়াদের মতো ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিদের নিকট থেকে দেশবাসী যা চায় তাহল ন্যায্য আচরণ এবং সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু কার্যক্রম।

নির্বাচন কিভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়?

নির্বাচন ব্যবস্থায় এবং নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নগর থেকে গ্রাম পর্যায়ে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। নির্বাচনী কর্মকর্তারা হলেন: রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার। নির্বাচন সরাসরি তদারক ও পরিচালনা করেন প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারগণ। একটি নির্বাচন বা ভোট কেন্দ্রে একাধিক ভোটদান কক্ষ থাকতে পারে। প্রতিটি ভোটদান কক্ষে, যাকে বলা হয় পোলিং বুথ, অন্তত একজন পোলিং অফিসার থাকেন। একাধিক ভোটদান কক্ষ থাকলেও একটি ভোটকেন্দ্রে একজনই প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনমতো এক বা একাধিক সহকারী প্রজাইডিং অফিসার থাকেন। ভোটদান কক্ষে আগত

www.pathagar.com

ভোটারের নাম, ক্রমিক নম্বর ও পরিচয় জেনে পোলিং অফিসার ভোটারকে ব্যালট পেপার ও সীল সরবরাহের আগে ভোটদান কক্ষে উপস্থিত সংশ্লষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টদের মাধ্যমে সংশ্লষ্ট ভোটারের তথ্যাদির সত্যতা নিশ্চিত হয়ে থাকেন। এর অর্থ, ভোটদান কক্ষসমূহে (পোলিং বুথস্) কেবল নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত নির্বাচন কর্মকর্তারাই থাকেন না, নিশ্চিতভাবেই থাকেন প্রায় সকল প্রার্থীর নির্বাচন প্রতিনিধি। এই নির্বাচন প্রতিনিধিদেরকে সাধারণত সংশ্লষ্ট ভোটকেন্দ্র এলাকা থেকেই বাছাই ও মনোনীত করা হয়ে থাকে। এর ফলে এই নির্বাচন প্রতিনিধিগণ ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করা সংশ্লষ্ট ব্যক্তি যথার্থই উপযুক্ত এবং ভোটার কিনা, তা সহজেই সনাক্ত বা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। প্রতিজন ভোটারকে এভাবে সনাক্তকরণের মাধ্যমেই একটি ভোটদান কক্ষ তথা একটি ভোটকেন্দ্র তথা একটি নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়।

এরপর একটি ভোটকেন্দ্রের সব ভোটের বাক্স সীল ভেঙ্গে উপস্থিত সব নির্বাচন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে খোলা হয়। সংশ্লষ্ট নির্বাচন প্রতিনিধিদের দেখিয়েই প্রতিটি ব্যালট পেপারে প্রদত্ত ভোট প্রার্থী বা মার্কা ভিত্তিক গণনা করা হয়। সকল বৈধ ভোট (একাধিক সীল মারা বা একাধিক প্রতীকের মাঝে সীল মারার কারণে প্রদত্ত ভোট বাতিল হয়ে থাকে) গণনা করার পর প্রত্যেক প্রার্থীর পৰে উক্ত ভোটকেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটের একটি তালিকা তৈরী করে তাতে প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত সংশ্লষ্ট সকল প্রার্থী/নির্বাচনী প্রতিনিধির/ ইলেকশন এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট এবং স্বাৰর-সীল গ্রহণ করেন। সংশ্লষ্ট ভোটকেন্দ্রের এই নির্বাচনী ফলাফলপত্রের সত্যায়িত কপিও প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রার্থী/ নির্বাচনী প্রতিনিধির অনুরোধ বা চাহিদায় দিয়ে থাকেন। এরপর সীলগালাকৃত নির্বাচনী ফলাফলপত্র প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন। একটি নির্বাচনী এলাকার সব ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রেরিত ফলাফলের যোগফলের ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লষ্ট নির্বাচনী এলাকার ফলাফল উপস্থিত লোকজনের (পাবলিক) সামনে ঘোষণা করেন। উলেৰখ্য, রিটার্নিং অফিসার একটি নির্বাচনী এলাকার সর্বোচ্চ নির্বাচনী কর্মকর্তা। নির্বাচনী এলাকাসমূহের রিটার্নিং অফিসারদের প্রেরিত নির্বাচনী ফলাফল নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা বা গেজেটে প্রকাশ করে।

একটি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনী ফলাফল, তাই এ পুরো নির্বাচনী কার্যক্রমে অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা ও ভোট কারচুপি এবং নির্বাচনী-প্রকৌশলী বিদ্যার (ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং) বাহ্যত কোনো সুযোগ থাকারও কথা নয়। কারণ প্রার্থী (বা তার প্রতিনিধি) একজন ব্যক্তি ভোটারের সত্যাসত্য যাচাই করার বা তাকে চ্যালেঞ্জ করার যেমন সুযোগ পান বা অধিকার রাখেন, তেমনি ফলাফল প্রস্তুত ও বিতরণ (ভোট কেন্দ্র পর্যায়ে) থেকে শুরু করে পুরো নির্বাচনী এলাকার ফলাফল প্রস্তুত ও ঘোষণা এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তা গেজেটে প্রকাশ করার প্রতিটি পর্যায়েই প্রার্থী (বা তার প্রতিনিধি) ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করার আইনগত অধিকার রাখেন। এ যাবতীয় আইনী নির্দেশনা ১৯৯৩ পর্যন্ত সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার ১৯৭২) স্পষ্টভাবে দেয়া আছে।

এখানে একটি আইনগত পর্যবেৰণ দেয়া যায় এবং তা হলো: ভোটকেন্দ্র পর্যায়ে সত্যায়িত নির্বাচনী ফলাফলপত্র প্রার্থীকে (বা প্রতিনিধি) সরবরাহ করার {উল্লিখিত আইনের ৩৬(১১) অনুচ্ছেদ} পাশাপাশি উক্ত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ্যে ঘোষণার বিধানও যোগ করা যেতে পারে। এখন বাংলাদেশের চলমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য

www.pathagar.com

উল্লিখিত আইনী কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আর কি কি প্রায়োগিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার, তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

এইচ.এম. এরশাদের সামরিক বেসামরিক শাসনামলের দু'টি জাতীয় নির্বাচন এবং ১৯৯১, ১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারী ও জুন) ও ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন পর্যবেৰণ করে বর্তমান নিবন্ধকার যে ধারণা অর্জন করেছেন, তার ভিত্তিতে এখানে প্রধান কয়েকটি সুপারিশ উপস্থাপিত হচ্ছে।

ক. প্রশিক্ষিত ও সচেতন নির্বাচন প্রতিনিধি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত ও সচেতন নির্বাচন প্রতিনিধি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই নির্বাচন প্রতিনিধি (সাধারণত একটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন ইলেকশন এজেন্ট এবং নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোট কৰের জন্য একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করা হয়) বিদ্যমান নির্বাচনী আইনসমূহ সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানবেন এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করা ও অভিযোগ দায়েরের সুযোগ আছে তাও নির্দিষ্টভাবে অবগত হবেন। এটি নির্বাচন প্রতিনিধিদের জ্ঞানগত দিক। আর প্রায়োগিক দিকটি হলো ভোট কেন্দ্রের জন্য তালিকাভুক্ত প্রতিজন ভোটারকে তিনি কিছু আনুষঙ্গিক তথ্যসহ চেহারায় চিনে রাখবেন। প্রতিজন ব্যক্তিভোটার যদি দলীয় বা প্রার্থীর নির্বাচন প্রতিনিধির পরিচিত হন, তাহলে কারো পৰে জাল ভোট দেয়া সম্ভব নয় এবং এমন মন্দ কাজ কেউ করলে তিনি নিশ্চিতভাবেই ধরা পড়বেন ও শাস্তি পাবেন। সুষ্ঠু নির্বাচন তথা জাল ভোটবিহীন নির্বাচনের জন্য দক্ষ, প্রশিৰিত ও সচেতন নির্বাচন প্রতিনিধি সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এবং দল দুটোর নেতৃত্বাধীন দুই জোট চাইলে খুব সহজেই আসন্ন নির্বাচনের জন্য কিছু উদ্বৃত্তসহ পর্যাপ্তসংখ্যক নির্বাচন প্রতিনিধি (নির্বাচনী এলাকা, ভোটকেন্দ্র ও ভোট কক্ষের জন্য) নিয়োগ করতে সৰম। আসন্ন নির্বাচনের যথেষ্ট আগেই দুই দল ও জোট এ নিয়োগের কাজটি সম্পন্ন করতে পারে এবং নিযুক্ত প্রতিনিধিদের জ্ঞানগত ও প্রায়োগিক দিক থেকে সৰম ও সুসজ্জিত করে গড়ে তুলতে পারে।

খ. ভোটার তালিকা পরীক্ষা এবং সংযোজন-বিয়োজন

বাংলাদেশের প্রধান দুই দল ও জোট ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকার ভিত্তিতে প্রতিটি ভোট কেন্দ্র ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করে সকল ভোটারের তথ্যাদি পরীক্ষা করতে পারে। ভোটার তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দুই দল ও জোট খুব সহজেই বাদপড়া ভোটারদের তালিকা তৈরী করতে পারে এবং ভোটার থাকার অযোগ্য (মৃত, দ্বৈত ও ভুয়া প্রভৃতি) ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে পারে। প্রধান দুই দল ও জোটের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ভোটারের সংযোজন ও বিয়োজন তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ সুগম হবে। এ কাজে নির্বাচন কমিশনের ভিন্ন মতের সুযোগও নেই।

গ. ভোটদিবসের সমস্যা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

ভোটের দিনে ভোট প্রদান, ভোটার শনাক্তকরণ, ভোট গণনা ও ফলাফলপত্র প্রস্তুত পর্যায়ে কোনো সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হলে তাৎৰণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান দলগুলোর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বিস্তারিত সমঝোতাপত্র তৈরী করতে হবে। সাধারণভাবে কয়েকটি প্রস্তাব এজন্য বিবেচনা করা যায়। ১. যে কোনো পক্ষ থেকে বৈধ ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা সৃষ্টি করা হলে পুলিশ ও

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেসির লোকেরা তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। ২. প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের যে কারো পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। ৩. উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দিলে ভোট গ্রহণ স্থগিত করতে হবে। ৪. ভোটার শনাক্তকরণে নির্বাচন প্রতিনিধিদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের ভোট পৃথক একটি নির্দিষ্ট বাক্সে রেখে ভোট গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।

ঘ. ভোটপূর্ব সমস্যা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

ভোট দিবসের পূর্বে ভোটারদের কাউকে বা কোনো অংশকে ভোট কেন্দ্রে যাবার ৰেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে বা ভোট কেন্দ্র দখলের অভিযোগ পাওয়া গেলে সে কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে। একটি নির্বাচনী এলাকায় স্থগিত করা ভোট কেন্দ্রসমূহের মোট ভোট দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর পৰে হিসাব করেও যদি প্রথম সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর চেয়ে কম হয় তবে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা যেতে পারে। অন্যথায় স্থগিত ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় পরবর্তী শুক্রবার বা সাত দিনের মধ্যে কোনো দিনে অনুষ্ঠানের বিধান অনুযায়ী সেসব কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ. নির্বাচন কর্মকর্তাদের আচরণ বিধি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার থেকে পোলিং অফিসার পর্যন্ত সকল নির্বাচন কর্মকর্তার জন্য একটি বিস্তারিত আচরণবিধি (যা বিদ্যমান আছে, তার সাথে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে) প্রণয়ন করতে হবে। আচরণবিধির প্রমাণযোগ্য লঙ্ঘনের ৰেত্রে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ তিরস্কার ও শাস্তি দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

শেষ কথা

বাংলাদেশের নির্বাচন এবং ভোটগ্রহণ-ফলাফল প্রকাশের যে পদ্ধতির কথা এ নিবন্ধে বলা হলো তাতে দেখা যায়, একজন ভোটার ব্যালট পেপার ও সীল হাতে ভোট দেয়ার জন্য গোপনকক্ষে প্রবেশের পর তার ওপর আর কারো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সংশ্লিষ্ট ভোটার তখন তার পছন্দমাফিক প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকেন এবং ভোট দিতে পারেন। বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় তাই সর্বাপেৰা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারা। প্রকৃত ভোটার চিহ্নিত ও নিশ্চিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থাও রয়েছে বর্তমান বিধানাবলীতে। ভোটার যদি ভোট কৰে ব্যালট পেপার-সীল হাতে ঢুকতে পারেন, তবে এ নির্বাচনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন ভোটার এবং শুধুই ভোটার। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা-প্রধান উপদেষ্টা-প্রধান নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে ভোটকৰের পোলিং অফিসার তারা কেউই কোনো প্রার্থী বা দলকে জিতিয়ে দেয়ার বা হারিয়ে দেয়ার ৰমতা রাখেন না। ২০০১ সালের নির্বাচন সাক্ষ্য দিচ্ছে, পছন্দের রাষ্ট্রপতি, গ্রহণযোগ্য উপদেষ্টা পরিষদ, 'জেলাতো ভাই' প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং তাদের নিয়োজিত অন্য নির্বাচন কর্মকর্তারা সে সময়ের সদ্যবিদায়ী সরকারী দলকে বিজয়ী করতে কোনোই ভূমিকা রাখতে পারেনি। আর পারেননি বলে সেই দলটি তাদের সবাইকে গুরুতর ভাষায় অভিযুক্তও করেছে। আজ আবার আরেকটি নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের রাজনীতিকরা নানা পর্যায়ের প্রেসিডেন্ট, সিএ, সিইসি এবং অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তা তথা কর্তৃপৰের নিরপেৰতার প্রশ্ন নিয়ে সীমাহীন সময় ও সামর্থ্যের অপচয় করে চলেছেন। রাজনীতি বিজ্ঞানে-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরপেৰতার প্রসঙ্গটি একটি বাজে কথা (ননসেন্স টক)। রাজনীতিকদের উচিত নিরপেক্ষতা নয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের

www.pathagar.com

নিকট থেকে আইন ও বিধিমাফিক আচরণ ও কার্যক্রমের নিশ্চয়তা চাওয়া ও নিশ্চয়তা বিধান করা। নিরপেক্ষ ব্যক্তির দাবিতে কাউকে পদচ্যুত করা অথবা বিপরীতে কাউকে কোনো পদে আসীন রাখার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে চাওয়ার মধ্যে যথার্থ কোনো কল্যাণ বা স্বার্থ নিহিত নেই, আছে জনগণের সীমাহীন দুর্ভোগ। আসীন ব্যক্তির স্থলে অন্য কাউকে বসিয়ে যেমন নির্বাচনে কোনো গোষ্ঠী লাভবান হবেন না, তেমনি কাউকে কোনো পদে আসীন রেখেও রাজনীতির কোনো গোষ্ঠী আসন্ন নির্বাচনে কোনোই সুবিধা পেতে পারেন না। রাজনীতিকরা এ সত্য অনুধাবনে সক্ষম হলে তারা সম্মানিত হবেন এবং লাভবান হবেন আর দেশ-জনগণও স্বস্তিতে সমৃদ্ধির পথে এগুতে পারবে।

[লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ, বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক]

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১১

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন : প্রধান দু'দলই যথেষ্ট

ড. তারেক ফজল

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সদস্য বিচারপতি এম.এ. আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে নিয়োগদানকে আইনজীবীদের কেউ কেউ বেআইনী বলে দাবি করেছিলেন। এরপর ভোটার তালিকা প্রণয়নবিষয়ক কার্যক্রমে বিচারপতি আজিজের বিভিন্ন আচরণ, কার্যক্রম ও বক্তব্য রাজনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দু'একটি বিষয়ে রাজনীতির সব মহলই বিচারপতি আজিজের প্রতি বিরক্ত ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রাজনীতির একটি পক্ষ তাদের দলীয়-জোটগত-আধারাজনৈতিক ও পেশাভিত্তিক ফোরামসহ বিচারপতি আজিজের প্রতি চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশ করেছে এবং অবিলম্বে তার পদত্যাগ দাবি করেছে। এবং বলেছে, বিচারপতি আজিজের (এবং নির্বাচন কমিশনের অন্য কমিশনারগণ ও কমিশন সচিব) নেতৃত্বে তারা বাংলাদেশে কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না ও কোনো নির্বাচন হতে দেবে না। বিপরীতে বিচারপতি আজিজ রাজনীতির এ পক্ষটির দাবি অগ্রাহ্য করেছেন এবং বলেছেন, তার নেতৃত্বেই নির্বাচন হবে। রাজনীতির এ পক্ষটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে সিইসিকে সরিয়ে দেয়া, পুরো নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করাসহ ১১ দফা দাবি করেছিলো এবং এ দাবি পূরণের জন্য প্রথমে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ও পরে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছিলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাহ্যত সিইসিকে সরিয়ে দেয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে, তারা সিইসিকে এমন একটি প্রস্তাবও দিয়েছেন, সিইসি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন এবং এ পর্যায়ে সিইসিকে সরাবার বিকল্পও তারা বিবেচনা করছেন। বাংলাদেশের আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে রাজনীতির একটি পক্ষ সিইসি ও বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির অন্য প্রধান পক্ষ বর্তমান নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। তাই তারা নির্বাচন কমিশনকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে অন্তরায় মনে করে না।

বর্তমান নির্বাচন কমিশন সদ্য সাবেক চারদলীয় জোট সরকার নিয়োগ করেছে। তাই তাদের ওপর আস্থা রাখা যায় না-এ সাধারণ অভিযোগ ছাড়াও রাজনীতির অন্য পক্ষ তথা বিগত শাসনামলের

www.pathagar.com

বিরোধী দল ও জোট দাবি করেছে, ভোটার তালিকা প্রণয়নবিষয়ক আচরণ-কার্যক্রম ও বক্তব্যের মাধ্যমে বিচারপতি আজিজ নিজেকে নির্ভর অযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত করেছেন।

এ প্রশ্নে 'দল-নিরপেক্ষ' (বা নির্দলীয়, মত-নিরপেক্ষ নন। কারণ কোনো সুস্থ-সচেতন মানুষের পক্ষে মত-নিরপেক্ষ তথা নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতিতে-রাজনৈতিক বিষয়াদিতে 'নিরপেক্ষ' একটি অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর, সঙ্কট সৃষ্টিকারী ও বাজে কথা-নন্‌সেন্স টক্। তবুও দু'একজন ছাড়া আমরা সবাই নিরপেক্ষতার কথা বলি ক্যান্? আমরা কি নির্বোধ, কপট না জ্ঞানপাপী? রাজনৈতিক বিষয় বলে নিরপেক্ষ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' যেমন হয় না, তেমনি সম্ভব নয় 'নিরপেক্ষ নির্বাচন'।) পর্যবেক্ষকগণ বলেন, বিগত চারদলীয় জোট সরকার বর্তমান নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। এতে অস্পষ্টতার কিছু নেই এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন (ইসি) এবং বিশেষ করে সিইসি বিচারপতি আজিজ ভোটার তালিকা প্রণয়ন-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিতর্কযোগ্য আচরণ-কার্যক্রম ও বক্তব্য প্রদান করেছেন- এ অভিযোগও সত্য। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই একটি নির্বাচিত দলীয় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ আরো অনেক সাংবিধানিক পদের (যেমন সুপ্রীম কোর্ট, সিএজি, পিএসসি) মতো নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। এ কাজ ১৯৯১, ১৯৯৬ (জুন) ও ২০০১ সালের প্রতিটি নির্বাচিত দলীয় বা রাজনৈতিক সরকারই করেছে। এতে অন্যায় কিছু নেই। নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্তৃপক্ষ (যাকে সাধারণত সরকার বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সরকার-এর তিনটি বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে নির্বাহী বিভাগ একটি মাত্র) তাদের বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিয়োগ দিয়ে থাকে, যাদের বিষয়ে রাজনীতির অন্য পক্ষের অনাস্থা ও আপত্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে বিচারপতি আজিজ ভোটার তালিকা প্রণয়ন-সংশ্লিষ্ট যে বিতর্কযোগ্য ও অন্যায্য আচরণ ইত্যাদি করেছেন, তার জন্য বিচারপতি আজিজসহ পুরো কমিশনকে বদলে না ফেললে (পুনর্গঠন অর্থে) একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়-এ অনুমান, আশঙ্কা অথবা দাবি যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সার্বক্ষণিক দর্শক-পরিদর্শক হিসেবে বিদ্যমান মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে দৃঢ়ভাবেই এ দাবি করা যায়, একজন সিইসি বিচারপতি এম এ আজিজ, ইসির অন্য তিন কমিশনার ও কমিশন সচিব-তাদের পক্ষে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে গুণগত ভিন্নতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। একটি নির্বাচনের ফলাফল গুণগতভাবে বদলে দেয়ার কাজটি সম্ভব হয় নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকা, ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ পর্যায়ে। সবাই জানেন, ভোটকক্ষে থাকেন ইসি অনুমোদিত এবং রির্টানিং (বা সহকারী রিটার্নিং) অফিসারের নিযুক্ত পোলিং অফিসার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট। এ পোলিং এজেন্টগণ সাধারণত সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের জন্য তালিকাভুক্ত ভোটারদের এলাকার বাসিন্দাই হয়ে থাকেন। তারা সংশ্লিষ্ট ভোটারদের পরিচিতি নিশ্চিত করতে পারেন, তা-ই আশা করা হয়। পোলিং এজেন্টগণ ভোটকক্ষ বা পোলিং বুথে আগত ভোটারের পরিচিতি নিশ্চিত করার পর পোলিং অফিসার তাকে ব্যালট পেপার ও সীল সরবরাহ করেন। এ পর্যায়ে ভোটার তার পছন্দের প্রার্থীর অনুকূলে সীল মারেন তথা ভোট দেন, যেখানে দুনিয়ার কারো খবরদারির সুযোগ নেই। কারণ সব ব্যালট পেপারেই পোলিং অফিসার স্বাক্ষর দিয়ে থাকেন এবং আর কোনো চিহ্ন থাকে না। তাই ভোটারের প্রদত্ত ভোট যথার্থই গোপন থাকে। এরপর প্রদত্ত সব ভোট (ভোটকেন্দ্রের সব ক'টি পোলিং বুথের) সংশ্লিষ্ট পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতেই সীল-গালা করা বাক্স থেকে বের করে গোণা হয় বেং গণনাকৃত ভোট প্রার্থীদের অনুকূলে তালিকাভুক্ত করে তাতে সংশ্লিষ্ট পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেয়া হয়। চাইলে এ ভোট

www.pathagar.com

তালিকার কপিও পোলিং এজেন্টদের দেয়া হয়। এরপর ভোটকেন্দ্রের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা প্রিজাইডিং অফিসার (ও তার অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার) ভোট তালিকা সীল-গালা করা অবস্থায় নির্বাচনী এলাকার প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা রিটার্নিং অফিসার ও কখনো ক্ষেত্রমতো সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট পাঠান। সাধারণত ডিসিরা রিটার্নিং অফিসার ও ইউএনওরা সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে জজকোর্টের পেশাদার বিচারকদের এ দু'টি পদে নিয়োগের দাবি যৌক্তিক মনে করেন কেউ কেউ। রিটার্নিং বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সব ক'টি ভোটকেন্দ্রের (কখনো তা শতাধিক হয়) ভোট তালিকা পাবার পর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের ইলেকশন এজেন্টদের (পুরো নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন ইলেকশন এজেন্ট এবং প্রতিটি পোলিং বুথের জন্য একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করা হয়) উপস্থিতিতে সেগুলো খুলে থাকেন এবং সবগুলো ভোট তালিকার উপযুক্ত যোগফলের ভিত্তিতে পুরো নির্বাচনী এলাকার ভোট ফলাফল চূড়ান্ত করেন। এ পর্যায়ে রিটার্নিং (বা সহকারী রিটার্নিং) অফিসার নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ্যে ঘোষণা করে থাকেন এবং এ ঘোষিত ফলাফলই ইসিতে পাঠানো হয় যা ইসি সরকারী প্রকাশনা 'গেজেটে' প্রকাশ করে থাকে মাত্র। অর্থাৎ কার্যত ও প্রকৃত অর্থে পুরো নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে নির্বাচনী এলাকা, ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ বা পোলিং বুথ পর্যায়ে। ইসি কেবল নির্বাচন বিষয়ক সর্বোচ্চ সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ।

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা, ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ পর্যায়ের নির্বাচন কার্যক্রম তথা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আগমন, ভোটকক্ষে প্রবেশ, ভোট প্রদান, প্রদত্ত ভোট সঠিকভাবে গণনা, সঠিক ভোট তালিকা তৈরী, এ সব ভোট তালিকার সঠিক সমন্বয় ও সমন্বিত সঠিক তালিকার ভিত্তিতে ফলাফল ঘোষণার পর্যায়গুলো বাধাহীন অবস্থায় ও সঠিক পন্থায় সম্পন্ন করা গেলেই একটি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে। আর এ সব কার্যক্রমে সিইসি ও ইসিদের কোনো অংশগ্রহণের বা নিয়ন্ত্রণের বাহ্যত কোনো সুযোগ নেই। তারপরও এ সব কাজে তারা নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করলে অসংখ্য দেশী দর্শক-পর্যবেক্ষক তা অবশ্যই দেখতে পাবেন। তার ওপর বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও তখন সক্রিয় থাকার কথা।

তাই নির্দলীয় পর্যবেক্ষকগণ পুরো আস্থার সাথেই বাংলাদেশের সকল পক্ষীয় রাজনীতিকদের বলতে চান, বিচারপতি আজিজ ও ইসি পুনর্গঠন বিষয়ে আপনারা যে মনোযোগ ও মূল্য দিয়েছেন, তা পর্যাপ্ত হয়েছে বরং সীমাও ছাড়িয়েছে। এর ফলে পুরো জাতিই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন আপনারা নির্বাচনী প্রচার কৌশল, তাতে অবৈধ বা কালো টাকা ও অবৈধ মারণাস্ত্রের ব্যবহার, ভোটারদের ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ পর্যন্ত বাধাহীনভাবে যেতে পারা ও ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত পরবর্তী নির্বাচনী কার্যক্রমকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য এ পর্যন্তকার যাবতীয় অভিজ্ঞতা, অনুমান ও আশঙ্কার আলোকে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যভিত্তিক বিস্তারিত কর্মপন্থা প্রণয়নে মনোযোগ দিন। আশা করা যায় এবং তা কাঙ্ক্ষিতও, ইসি পুনর্গঠনের মতো সংবিধান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাদ দিয়ে অন্যবিধ প্রয়োগিক বিষয়াদিসংশ্লিষ্ট দাবিনামা ও কর্মপন্থার প্রস্তাব করা হলে বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা সহজে, দ্রুত ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করবে। এ পর্যায়ে রাজনীতির পক্ষগুলো রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগে সম্ভাব্য নির্দলীয় উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য ইতিবাচক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভোটার সাধারণের পছন্দের যথার্থ অনুবাদ করা

www.pathagar.com

সম্ভব হবে। আমি মনে করি, বর্তমান বাস্তবতাতেও, নির্দলীয় পর্যবেক্ষকদের অভিমতের আলোকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব। এ জন্য মূলত দরকার দেশের প্রধান দু'টি দলের কার্যকর উদ্যোগ, সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ। প্রধান দু'দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-র বাইরে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী যদি এ সব উদ্যোগ-সহযোগিতায় যোগ দেয়, তবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির কথিত সবচেয়ে বড় বাধা ও সমস্যা বর্তমান ইসি-সিইসি সামান্যতম বাধা হিসেবেও দাঁড়াতে পারবে না বলে আমি স্থির নিশ্চিত। এ দলগুলো উদ্যোগী হলে কথিত ত্রুটিপূর্ণ-অসম্পূর্ণ-দূষিত ভোটার তালিকাটি শুদ্ধ করতে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ৭দিন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপযোগী প্রশাসন সাজাতে লাগবে বড়জোড় ২দিন আর কার্যকর ও উপযুক্ত নীতিমালা-বিধিমালা-কর্মপন্থা নিশ্চিত করতে আরো ৭দিন সময় লাগতে পারে।

তাই আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করি, সাংবিধানিক জটিলতাযুক্ত ইসি পুর্নগঠনসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে পাশ কাটিয়ে আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ করার জন্য এ নিবন্ধে উপস্থাপিত ধারণাটি বাস্তবায়নে মনোযোগী হউন। সিইসি বিচারপতি এম এ আজিজ সম্পর্কে একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে নিবন্ধটি শেষ করি: সাংবিধানিক রক্ষাকবচের সূত্রে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট দেশবাসীকে বাহ্যত জিম্মি করে নিজের 'কল্পিত দেশোদ্ধারের পণ'-এর মধ্যে কৃতিত্বের ও মহত্বের কিছু নেই। আপনি বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও সীমা লঙ্ঘনমূলক আচরণ-কার্যক্রম-বক্তব্যের মাধ্যমে আপনার জন্য ন্যায্য সম্মান ও মর্যাদাকে মলিন ও প্রশ্নযোগ্য করেছেন। আপনার বিবেচনায় বিরোধী পক্ষ আপনার প্রতি যে অন্যায্য আচরণ-কার্যক্রম-বক্তব্য উপস্থাপন করেছে, তার সবই প্রকৃতপক্ষে অবাঞ্ছিত নয়। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও আপনি নিজের সৃষ্ট কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাবেন বলে মনে হয় না।

রাজশাহী, ১৫ নভেম্বর ২০০৬

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১২

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬

চলমান রাজনীতির বিবিধ প্রসঙ্গ

ড. তারেক ফজল

অবশেষে বাংলাদেশী রাজনীতির সঙ্কটাপন্ন অবস্থার একটি আপাত সমাধান হলো সম্ভবত মহাজোট নামে পরিচিতি পাওয়া শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'বিভিন্ন দল ও জোট' আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। এবারের নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ও ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে, তার কয়েকটি প্রসঙ্গে এ নিবন্ধে কথা বলা হবে।

ভঙ্গুর তত্ত্বাবধায়ক, অগ্রহণযোগ্য বিচারক

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় নির্বাচনকালীন মেয়াদের জন্য যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান করা হয়, দায়িত্বের তৃতীয় মেয়াদেই তা একটি ভঙ্গুর ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নির্দলীয় এ সরকার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করাকেই কেবল নির্দেশ করা হয়। নানা পক্ষের রাজনীতিকদের নানামুখী ও নানামাত্রিক দাবি পূরণের বস্তুগত ও আইনগত অধিকার সংবিধানের ক্রয়োদশ সংশোধনী মারফত প্রতিষ্ঠা করা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দেয়া হয়নি। কিন্তু রাজনীতিকরা নির্বাচনে অংশ নেয়ার শর্ত হিসেবে তেমনসব দাবিই উপস্থাপন করে থাকেন এবং এবারও করেছেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কথিত গণপদোন্নতি ও পদায়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তেমন একটি সিদ্ধান্ত সর্বোস্ত আদালত স্থগিত করেছে এবং কারণ দর্শানোর রুল জারি করেছে। সাংবিধানিক পদ হিসেবে ঘোষিত বিভিন্ন পদের ব্যক্তিকে সরানোর দাবি পূরণের আইনগত অধিকার এমনকি 'নিয়মিত সরকারের'ও নেই। তেমন দাবি সাময়িক ও অন্তবর্তীকালীন এ সরকারের কাছে উপস্থাপন করায় পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিই ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছিলো। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রীতি মতেই বাংলাদেশের নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারগুলো সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনের কমিশনার-প্রধান কমিশনার প্রভৃতি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দিয়ে থাকে। সরকারগুলো 'দলীয় ও রাজনৈতিক' হবার কারণে এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনা কম-বেশী নিশ্চিতভাবেই লক্ষ্য করা যায়। এ কাজ ১৯৯১, ১৯৯৬ (জুন) ও ২০০১ সালের নির্বাচিত প্রতিটি সরকারই করেছে। সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব পালন করেছে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনকালে। এ দু'টি নির্বাচনের সময় এবং নির্দিষ্টভাবে ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক পদসমূহে আওয়ামী লীগের নিয়োগ করা ব্যক্তিগণই দায়িত্ব পালন করছিলেন। বিরোধী অবস্থানে থাকা বিএনপি এবং এর মিত্রদের দাবি-আপত্তি সত্ত্বেও এসব সাংবিধানিক পদাধিকারীদের সরানো হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও কোনো বিবেচনা (দয়া করে, স্বেচ্ছায় অথবা চক্ষুলজ্জায়) থেকে পদত্যাগ করেননি বা দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকেননি। সাংগঠনিক শক্তিতে দুর্বল অথবা কম প্রান্তিক বিবেচনার দল হিসেবে বিএনপি সেসব আপত্তিকৃত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সরানোর জন্য এবারের 'আওয়ামী লীগ ধরনের' সঙ্কটও তৈরী করেনি। তারা নির্বাচনে গেছে এবং অনুমানের চাইতে ভালো ফল অর্জন করে ক্ষমতায় গেছে। এবার আওয়ামী লীগ সে একই কারণ উপস্থাপন

www.pathagar.com

করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একটি ভঙ্গুর ও নির্ভরঅযোগ্য সরকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অশুভ হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ মনে করেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কান্ডারী হিসেবে গণ্য প্রধান উপদেষ্টার পদ নিয়ে এবার যে জটিলতা ও সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারসমূহে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতিদের কেউ (অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের বিচারপতি) আর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন কি-না, তা সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামো প্রণয়নের সময় এর প্রণেতারা হয়তো ভেবেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিগণই রাজনীতিকদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হবেন। সদ্যসাবেক দু'জন প্রধান বিচারপতি ও দু'জন আপীল বিচারপতির বিকল্প দিয়ে এজন্যই সংবিধানে পঞ্চম বিকল্প হিসেবে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য উপযুক্ত নাগরিক এবং শেষ বিকল্প হিসেবে প্রেসিডেন্টকেই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়ার বিধান করা হয়েছিলো। এবার প্রথম বিকল্প হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানকে আওয়ামী লীগ ও এর মিত্ররা মানেনি। দ্বিতীয় বিকল্প মৃত্যুর কারণে অস্তিত্ববান ছিলেন না। তৃতীয় বিকল্প বিচারপতি এম এ আজিজকে আওয়ামী লীগ ও এর মিত্ররা এবং চতুর্থ বিকল্প বিচারপতি হামিদুল হককে বিএনপি ও এর মিত্ররা মানেনি। ফলে 'বিচারপতির নেতৃত্বে' নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের যে অগ্রাধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে দেয়া হয়েছিলো, পরবর্তী আর কোনো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে দেয়া প্রথম চার বিকল্পের আওতায় কোনো বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত হবে কি-না এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ আছে। অবশ্য পঞ্চম বিকল্পের আওতায় এমনটি হতেও পারে, যা এবার একটি ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবে দেখা গেছে।

ক্ষমতার রাজনীতি ও এরশাদের মূল্য

বাংলাদেশের স্বৈরশাসক হিসেবে পরিচিত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (এরশাদ) এবারের নির্বাচনেও প্রধান দুই দল ও জোটের কাছে সীমাহীন কদর পেয়েছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রবক্তা (ধারক অর্থে নয়) হিসেবে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সহবস্থানকে তাত্ত্বিকভাবে সহজ ও স্বাভাবিক মনে করা হয়।

এ তত্ত্বের কথা এরশাদ চমৎকার উচ্চারণে অনেকবার বলেছেন। এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধারক ও প্রবক্তা আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির স্বাভাবিক ভিন্নতা ও দূরত্বের কথাও এরশাদ অনেক চৌকষ বাক্যে দেশবাসী ও তার দলীয় নেতা-কর্মীদের শুনিয়েছেন। সুযোগ পেলেই অথবা কারণ ঘটলেই শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এরশাদকে চোর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং খালেদা জিয়ার সাথে তার দেবর-ভাবী সম্পর্কের সরস বর্ণনা দিয়েছেন। বিপরীতে বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি নেতৃত্ব এরশাদের বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্দার্থক বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন এবং বিএনপি-র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান (তারেক) এরশাদকে বিএনপি নেতৃত্বের জোটে অংশীদার করার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানামাত্রিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান ছাড়া বিএনপি জোটে জাতীয় পার্টির অংশীদার হবার অনানুষ্ঠানিক যাবতীয় বক্তব্যই এরশাদ জানিয়েছিলেন। অবশেষে গত ১৮ ডিসেম্বর পল্টনের মহাসমাবেশে জাতীয় পার্টিকে এরশাদ আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের জোটের অংশীদার হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। এর পর বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আদর্শ

www.pathagar.com

বিবর্জিত ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে আরেক দফা পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগের জোটে এরশাদের অংশীদারীত্ব কেবলই ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির একটি বৃহৎ প্রকাশ, এতে সন্দেহ নেই। পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ দাবি করেন, আদর্শভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশে এখনও গুরুতরভাবে দুর্বল। এটা এতোটাই দুর্বল যে, সাধারণ নাগরিকদের কারো কারো অনুমান, জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের জোট-মহাজোটে যেতে চাইলে দলটি জামায়াতকে এরশাদের চাইতেও বেশী উষ্ণতায় গ্রহণ করবে এবং তা করবে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য। রাজনীতির আদর্শ বাংলাদেশের বড়ো দলগুলোর প্রায় কোনোটিই সমুন্নত রাখতে তেমন আগ্রহী ও মনোযোগী নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জবাবদিহিতামুক্ত বিত্ত অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ায় বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ প্রায় সব দলই আদর্শবর্জিত ক্ষমতার রাজনীতি ও ক্ষমতা নিশ্চিতকারী নির্বাচনী কার্যক্রমের অংশীদারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রবক্তা না হলেও বিএনপি জোট কৃষক-শ্রমিক জনতা পার্টির এডভোকেট ফজলুর রহমানকে স্বাগত জানিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী হলেও আওয়ামী লীগ এরশাদের জাতীয় পার্টিকে সাদরে বরণ করেছে।

মৌলবাদী ও জঙ্গিকার্যক্রমের সাথে যুক্ত বলে অনেকবার দাবি করেও আওয়ামী লীগ শায়খুল হাদীস ও মুফতি শহীদুল ইসলামের খেলাফত মজলিসকে অংশীদার করেছে। বিপরীতে বিএনপি আওয়ামী লীগের আজীবনের নিবেদিতপ্রাণ এক বিদ্রোহী নেতা (নড়াইল)কে বরণ করেছে, যিনি যে কোনো মুহূর্তে রাজশাহীর ডা. আলাউদ্দীনসহ আরো অনেকের মতোই সুবিধামতো সময়ে বিএনপি ছাড়তে পারেন। এসবই ক্ষমতা ও বিত্তকেন্দ্রিক রাজনীতির বিক্ষিপ্ত অথবা ধারাবাহিক প্রকাশ। এ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি মুক্ত হতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ 'রাজনীতিভিত্তিক দুর্নীতি' থেকে কোনো দিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না।

[লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১৩

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জানুয়ারী ২০০৭

কালো মেঘে ঢাকা বাংলাদেশের দায়িত্বহীন রাজনীতি

ড. তারেক ফজল

বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশ আবার কালো মেঘে ঢেকে গেছে। প্রায় অনিবার্য এক সংঘাতের মুখে দেশ ও দেশবাসী। ২৫ ডিসেম্বরের ঢাকার দৈনিকগুলোর প্রধান শিরোনাম ছিলো: 'সব দল ও জোট আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে'। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দল, জাতীয় পার্টি (এ) ও এলডিপি নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত ২৪ ডিসেম্বর ঘোষণা করে। ২৫ ডিসেম্বরের ঢাকার দৈনিকগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সরকারের বক্তব্য ছাপা হয়। বলা হয়, ১৪ দলীয় জোটসহ অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত, এটা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য শুভ সংবাদ। এরপর বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল ও জোটের এবং আগ্রহী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৬ ডিসেম্বর তারিখের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেন। সারাদেশে রেকর্ডসংখ্যক ৪,১৪৬টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। আসন্ন নির্বাচন ও ভোটকেন্দ্রিক একটি উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয় বলে মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। এক সপ্তাহের ব্যবধানে, ৩ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৪দল, জাপা (এ), এলডিপি, খেলাফত মজলিস (শায়খুল হাদীস)সহ বিভিন্ন দল-জোটের সমন্বয়ে গঠিত মহাঐক্যজোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানায়, নিজেদের মনোনয়নপত্রসমূহ প্রত্যাহার করে এবং ২২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন প্রতিরোধের ঘোষণা দেয় এবং বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশ ছেয়ে যায় ঘণ কালো মেঘে।

নির্বাচন বর্জন কেনো

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন ছিলো ৩ জানুয়ারী। এদিন ঢাকার হোটেল শেরাটনে এক সংবাদ সম্মেলনে মহাঐক্যজোটের পক্ষে শেখ হাসিনা ২ পৃষ্ঠার এক লিখিত বক্তব্যে বলেন: ক. সংবিধানের ৫৮(ঘ) অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলা আছে, খ. সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ ও প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে আগামী ৭ ও ৮ জানুয়ারী সারাদেশে অবরোধ কর্মসূচী পালিত হবে।

এরপরও যদি দাবি মানা না হয় তবে লাগাতার বঙ্গভবন অবরোধ করা হবে, গ. প্রশাসনকে দলীয়করণমুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, ঘ. জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদসহ বে-আইনিভাবে যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, ঙ. নিরপেক্ষ নির্বাচনের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থে বর্তমান তফসিল বাতিল করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার পর নতুন তফসিল ঘোষণা করতে হবে, চ. যখনই আমরা প্যাকেজ প্রস্তাব মেনে নিলাম তখনই হাওয়া থেকে পাওয়া নির্দেশে তিনি উপদেষ্টাদের সর্বসম্মত প্যাকেজ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তারপরেও আমরা গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি। মহাঐক্যজোটের পক্ষ থেকে আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর আমরা লক্ষ করলাম, প্রধান উপদেষ্টা বিএনপি-জামায়াতের ডিকটেশন অনুযায়ী ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বাস্তবায়ণের কাজ শুরু করেছেন। (নয়া দিগন্ত, ৪ জানুয়ারী ২০০৭)।

www.pathagar.com

নির্বাচন বর্জনের ন্যায্যতা

মহাঐক্যজোটের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত নির্বাচন বর্জনের বিভিন্ন কারণের শেষ (চ.) বক্তব্যটি দিয়ে এর ন্যায্যতা বিষয়ে ধারণা পাবার চেষ্ট করা যাক। মূল কথা এমন: অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা থাকার পরও গণতন্ত্রের স্বার্থে মহাঐক্যজোট নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ও মনোনয়নপত্র জমা দেয়। কিন্তু এরপরই প্রধান উপদেষ্টা বহুলআলোচিত ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু করেন। তাই মহাঐক্যজোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। মহাঐক্যজোটের এ বক্তব্য খতিয়ে দেখার দাবি রাখে। ২৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দানের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন কী কী ঘটেছে এবং প্রধান উপদেষ্টা এ সময়ে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপযোগী কী কী করেছেন, তা জানা এ পর্যায়ে জরুরী। বর্তমান নিবন্ধকারের জানা মতে, বাংলাদেশে এ সময়ে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারী একটি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে এবং তা হলো, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদের জমা দেয়া পাঁচটি মনোনয়নপত্রের সবক'টিই বাতিল ঘোষিত হয়েছে রিটার্নিং অফিসার পর্যায়ে এবং নির্বাচন কমিশন পর্যায়ে। এ বিষয়টি মহাঐক্যজোট রাজনীতিতে ব্যপকভাবে আলোচিত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গভীর প্রভাব রেখেছে।

কার্যতঃ এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে আর উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি আলোচিত এ সময়কালে। এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার কোনো প্রভাব কাজ করেছে কী না, তা অবশ্য ভেবে দেখার সুযোগ আছে। প্রধান উপদেষ্টা এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিলে প্রভাব বিস্তার করেছেন-এমন দাবি এরশাদ, জাতীয় পার্টি বা মহাঐক্যজোটের পক্ষ থেকে করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার কথিত ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রচেষ্টায় 'এরশাদইস্যু' নেই, এমনটি মেনে নেয়া যায়।

প্রধান উপদেষ্টা অন্য কোনো উপায়ে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চেষ্টা করেছেন কি-না, তার নির্দিষ্ট কোনো উদাহরণ মহাঐক্যজোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। এর ফলে পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে বা তার কার্যক্রমকে মহাঐক্যজোটের নির্বাচন বর্জনের গ্রাহ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

এর বাইরে তথা প্রধান উপদেষ্টার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রচেষ্টার কথিত অভিযোগের বাইরে এরশাদের 'মনোনয়নইস্যু' ছাড়া আলোচিত সময়ের মধ্যে অন্য কোনো নতুন রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষকগণ এখনও খুঁজে পাননি। ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান নির্বাচন ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই এখনও বিদ্যমান। মহাঐক্যজোটের পক্ষ থেকে ৩ জানুয়ারী কার্যত এরশাদের মনোনয়নইস্যু ছাড়া আর কোনো ইস্যুর নির্দিষ্ট উল্লেখ না করায় পর্যবেক্ষকদের প্রায় সকলেই এরশাদের মনোনয়ন বাতিলের ঘটনাকেই মহাঐক্যজোটের নির্বাচন বর্জনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কিভাবে কাটবে কালোমেঘ?

ঢাকার একটি দৈনিকের আয়োজনে গত ৪ জানুয়ারী 'নির্বাচন গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের বক্তারা নতুন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের মতো সুপারিশের পাশাপশি উচ্চারণ করেছেন: শক্তি দেখিয়ে সমাধান হবে না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাঐক্যজোট গত ২৪ ডিসেম্বর গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

স্বার্থে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। এরপর এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া ছাড়া যেহেতু আর উল্লেখযোগ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো পরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘটিত হয়নি, পর্যবেক্ষকদের একটি বড়ো অংশ তাই মনে করেন এবং সুপারিশ করেন, গণতন্ত্রের স্বার্থেই মহাঐক্যজোটের নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত পুনরায় গ্রহণ করা উচিৎ।

এ জন্য প্রত্যাহৃত মনোনয়নপত্র পুনরায় জমাদানের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, রাষ্ট্রপতি রাজনীতির প্রধান দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের সমঝোতারভিত্তিতে প্রত্যাহৃত মনোনয়নপত্রগুলো পুনরায় জমা দেয়ার সুযোগ দিতে পারে। এজন্য আইনগত সংরক্ষণের স্বার্থে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় অর্ডিন্যান্স জারী করবেন এবং নতুন সংসদে রাজনীতির পক্ষগুলো এ অর্ডিন্যান্সকে অনুমোদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তুলনামূলকভাবে সহজ। এর বাইরে সমাধানের অন্যসব বিকল্পই অনেক বেশী জটিল এবং কঠিন। আর নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার অনিবার্য পরিণতি অজানা ও সীমাহীন সংঘাত, রক্তপাত এবং জাতীয় জীবনের অভাবণীয় দুর্গতি। জাতীয় জীবনের এ দুর্গতি বাংলাদেশের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নস্যাত করাসহ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকেও বিপন্ন করতে পারে।

দায়িত্বহীন রাজনীতি

বাংলাদেশে দায়িত্বহীন রাজনীতি এখন সাধারণ বিষয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোতে যারা দায়িত্বশীল পদে আসীন হয়ে থাকেন, তারাও গুরুতরভাবে দায়িত্বহীন আচরণ ও কার্যক্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় (ছুটিতে যাওয়া) সদস্যরা ভোটার তালিকা প্রণয়ন বিষয়ে তেমন দায়িত্বহীনতার পরিচয়ই দিয়েছেন। ভোটার তালিকা বাংলাদেশের বর্তমান সঙ্কটের অন্যতম প্রধান ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর নেতৃত্বেও তেমনিভাবে সীমাহীন দায়িত্বহীন আচরণ ও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। মহাঐক্যজোট নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বাহ্যত তেমন দায়িত্বহীন ভূমিকাই নিয়েছে। একজন ব্যক্তি এরশাদই এখানে মূখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

নানা মাত্রায় নন্দিত-নিন্দিত একজন এরশাদের জন্য বাংলাদেশের গণতন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ুক, এটা কারো কাম্য হতে পারে না। ব্যক্তি এরশাদ নির্বাচনে অংশ নিতে না পারলেও মহাঐক্যজোট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হলে নানাভাবে তাকে পুরস্কৃত করার সুযোগ নিতে পারে। তাই মহাঐক্যজোটের অবিলম্বে নির্বাচনে অংশ নেয়া অনিবার্য কর্তব্য বলে মনে করি। নির্বাচনের অবশিষ্ট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজনৈতিক পক্ষগুলো একটি বিস্তারিত কর্মপন্থা ও সমঝোতা স্থির করতে পারে।

[লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১৪

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

একগুঁয়ে রাজনীতির সংকট

ড.তারেক ফজল

১১ জানুয়ারী ২০০৭-এর সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। জরুরী অবস্থার আওতায় সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতাপূর্ণ লেখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকে। প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রেসিডেন্টের পদে বিদ্যমান থেকে প্রধান উপদেষ্টা তথা সরকার প্রধানের পদ ত্যাগ করেছেন ও ড. ফখরুদ্দিন আহমদকে সরকার প্রধান নিয়োগ করেছেন-দেশের এ বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেই বর্তমান নিবন্ধটি উপস্থাপিত হয়েছে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি যে মাত্রা ও পরিমাণে সঙ্কট ও জটিলতায় আটকে গেছে, তার যাবতীয় দায় এদেশের একগুঁয়ে স্বভাবের দায়িত্বহীন রাজনীতিকদের। প্রতিটি বিষয়, প্রসঙ্গ এবং পদক্ষেপেই বিশেষত রাজনীতির প্রধান দু'পক্ষের রাজনীতিকরা সংকীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠী স্বার্থের বিবেচনায় এক পক্ষ অন্য পক্ষের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছে। বৃহত্তর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চিন্তামুক্ত এ কুটিল বিরোধিতা ও দ্বন্দ্বেরই মিলিত ফল বাংলাদেশের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতা। ১০ জানুয়ারী রাতে ঢাকার একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল 'বাংলাদেশ এই সময়' শীর্ষক একটি বহুপাক্ষিক আলোচনা বা টক শো'র আয়োজন করেছিলো। সিভিল সোসাইটি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং বর্তমান রাজনীতির প্রধান দু'পক্ষের প্রতিনিধি এ টকশো'তে অংশ নেন। ভিন্ন পাঁচটি স্থান থেকে আধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সহায়তায় এ টক শো'তে অংশ নেয়া আলোচকদের মধ্যে দুই রাজনীতিক যথারীতি একে অন্যকে অসম্পূর্ণ, আংশিক সত্য ও বিকৃত তথ্যের আলোকে আক্রমণ করে কথা বলেছেন, অন্য পক্ষকে বিদ্যমান সঙ্কটের জন্য সর্বতোভাবে অভিযুক্ত করেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনকেন্দ্রিক সঙ্কট কোত্থেকে শুরু হলো? অবসরের বয়স বাড়ানোর সূত্রে উপযুক্ত ঘোষিত বিচারপতি কে এম হাসানের বিরোধিতা থেকে না প্রধান নির্বাচন কমিশনার (চীফ ইলেকশন কমিশনার-সিইসি) হিসেবে বিচারপতি এম এ আজিজের নিয়োগ ও তার একগুঁয়ে চেষ্টায় নতুন ভোটার তালিকা তৈরীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা থেকে? বাংলাদেশের রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্য উভয় কারণই দায়ী এবং এ দায় রাজনীতির প্রধান দু'পক্ষের ওপরেই বর্তায়।

সংবিধানের চতুর্দশ বা চৌদ্দ নম্বর সংশোধনীর মাধ্যমে সিএজি(কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল), পিএসসি-র চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গহণের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭তে উন্নীত করা হয়। বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিচারপতিদের বয়স বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানান। প্রধান বিচারপতির এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে কয়েক বছর লেগে যায়। প্রস্তাবের সাথে সাথেই তা আইনে পরিণত করা হলে চলতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের প্রথম দাবিদার বিচারপতি কেএম হাসান না হয়ে অন্য কেউ হতে পারতেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ ও এর সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব দাবি করেন, বিচারপতিদের বয়সসীমা বৃদ্ধি আইনের বিলম্বিত বাস্তবায়ন তৎকালীন বিএনপি-জোট সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রণোদিত একটি বিষয়। বিচারপতি কেএম হাসান দেড় যুগ আগে বিএনপি-রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় বিরোধিপক্ষ আরো জোরালোভাবে বিএনপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গটিকে প্রচারণায় আনে। এবং অবশেষে লগি-বৈঠার রক্তাক্ত ও ভয়ঙ্কর প্রদর্শনীর মুখে বিচারপতি কেএম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশে বাধ্য করে। আওয়ামী লীগ ও এর মিত্রদের এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক একগুঁয়ে বিরোধিতার বিষয়টি অল্পদিনের ব্যবধানে তাদের ও তাদের সুহৃদদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে এবং তা এক গভীর আপসোসের বিষয়েও পরিণত হয়েছে। বলা হয়েছে: ড. ইয়াজউদ্দিনের চাইতে বিচারপতি হাসান ভালো বিকল্প ছিলেন। একজন ব্যক্তি সরকার প্রধান রাজনীতির কোনো পক্ষের নির্বাচনী বিজয় বর্তমান সামগ্রিক বাস্তবতায় কোনোভাবেই নিশ্চিত করতে পারেন না। এটি আওয়ামী লীগ পক্ষের জন্য যেমন সত্য ছিলো, তেমনি বিএনপি পক্ষের জন্যও সত্য ছিলো। আওয়ামী লীগ পক্ষ বিচারপতি হাসানের বিরুদ্ধে লগী-বৈঠার রক্তাক্ত আন্দোলন করে একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়েছে। মৃত বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী বিচারপতি এমএ অজিজের আপাত অনুপযুক্ততার প্রেক্ষাপটে বিএনপিপক্ষ ও বিচারপতি হামিদুল হককে নি:শব্দ প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে একই ধরনের রাজনৈতিক একগুঁয়েমির ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ মনে করেন, বিচারপতি হামিদুল হককে প্রত্যাখ্যান করে ও সম্ভাব্য সর্বজনগ্রাহ্য প্রধান উপদেষ্টা খুঁজে পাবার বিষয়টিতে পর্যাপ্ত ও দৃষ্টিগ্রাহ্য মনোযোগ না দিয়ে বিএনপি প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ (বর্তমান নিবন্ধকার গভীরভাবে দুঃখবোধ করেন এ তথ্য জানাতে যে, আরবী শব্দ আহমাদ বা আহমদ বাংলা ব্যবহারে বিকৃত হয়ে আহাম্মদ, আহম্মেদ, আহম্মেদ, আহাম্মেদ প্রভৃতি রূপ ধারণ করেছে। এটি বাংলাদেশী অভিভাবকদের একটি অসচেতনতার ফল বটে) কে এ অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পথ খুলে দিয়েছে।

বিএনপি-র বিরোধীপক্ষ তাই আপাত গ্রহণযোগ্য যুক্তিসহকারে বলতে পারছে, বিএনপি-র পরিকল্পনা অনুযায়ীই নির্বাহী ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে। ড. ইয়াজউদ্দিনের নির্বাহী সরকারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিএনপি-র ঘাড়ে চেপেছে। বিএনপিপক্ষ বিচারপতি হামিদুল হকের বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ সমর্থন না দিলেও নিঃশব্দ মৌনতা অবলম্বন করলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কটে গুণগত ভিন্নতা থাকতে পারতো। বিচারপতি হামিদুল হক বিষয়ে বিএনপিপক্ষের একটি ন্যায্য ইতিবাচক অবস্থান সমগ্র বাংলাদেশের জন্য কাঙ্ক্ষিত কল্যাণকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারতো।

সিইসি হিসেবে বিচারপতি এম এ আজিজের নিয়োগ বিষয়ে আওয়ামী লীগ পক্ষের বিরোধিতা একটি অন্যায্য অবস্থান ছিলো। অনুশীলিত নীতি ও রীতির আওতায় থেকে বিএনপি-জোট সরকার বিচারপতি এম এ আজিজকে নিয়োগ দিয়েছিলো। বিচারপতি আজিজের নিয়োগের বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগপক্ষ নীতিগতভাবেই বিচারপতি আজিজের যাবতীয় কার্যক্রমের বিরোধিতা শুরু করে। ভোটারতালিকা প্রস্তুতের প্রসঙ্গটি ছিলো আওয়ামী লীগপক্ষের অবিরাম বিরোধিতার প্রধান ইস্যু। বিচারপতি আজিজ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ ও মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ পক্ষ অনানুষ্ঠানিকভাবে ২০০০ সালে প্রস্তুত করা ভোটার তালিকার ভিত্তিতে হালনাগাদ করার দাবি জানায়। বিএনপিপক্ষ নতুন ভোটার তালিকা বা হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা বিষয়ে কোনো কঠোর অবস্থানে যায়নি। এ পর্যায়ে

www.pathagar.com

সিইসি নতুন ভোটার তালিকা প্রস্তুতের একক সিদ্ধান্ত নেন, যা তৎকালীন অন্য দুই ইসি মোহাম্মদ আলী ও মুন্সেফ আলী সমর্থন করেননি। বাহ্যত দুই ইসি (ইলেকশন কমিশনার) ও আওয়ামী লীগ পক্ষের এ বিষয়ক অভিমত এক বিন্দুতে মিলে যায়। হালনাগাদ করা ভোটার তালিকা বিষয়ে বিএনপি পক্ষের কঠোর বিরোধিতা বা নতুন ভোটার তালিকা বিষয়ে তাদের জোরালো সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও সিইসি নতুন ভোটার তালিকার পক্ষ একগুঁয়ে ও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। সিইসির এ একগুঁয়ে অবস্থান অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের সম্পৃক্ততায় এক গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতের বিষয়টি সিদ্ধান্ত বদল ও দীর্ঘসূত্রতার জন্য অনিশ্চয়তা ও সমস্যার মখে পড়ে। আওয়ামী লীগপক্ষ কঠোর ভাষায় দাবি করে, এমন একজন একগুঁয়ে ও পক্ষপাতদুষ্ট সিইসির অধীনে তারা নির্বাচনেই অংশ নেবে না। যে নির্বাচনে তারা অংশ নেবে না, সেই নির্বাচন তারা হতেও দেবে না। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের শুরু হয়।

এ পর্যায়ে বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেন, আনকোরা নতুন ভোটার তালিকা ও হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকার মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই, থাকার সুযোগও নেই। ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, ব্যয় নির্বাহ ও সময়-এর মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুন ও হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকার মধ্যে কম-বেশী পার্থক্যের বিষয় বয়েছে। নতুন ভোটার তালিকায় দেশের সকল উপযুক্ত নাগরিক ভোটার হিসেবে তালিকভুক্ত হবার কথা। আর হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় কর্তন ও অন্তর্ভুক্তির দু'টি বিশেষ প্রসঙ্গ আসে, যার মিলিত ফল পুরোপুরি একটি নতুন ভোটার তালিকাই বটে। হালনাগাদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে বা স্থান ত্যাগ করলে তার নাম কেটে দেয়া হয় এবং পূর্ববর্তী তালিকা তৈরীর পর যারা ভোটার হবার উপযুক্ততা অর্জন করেছেন, তাদেরকে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তাই একটি নতুন ভোটার তালিকা ও একটি হালনাগাদকৃত তালিকার মধ্যে গুণগত কোনোই পার্থক্যের সুযোগ নেই।

এমন একটি সরল বিষয়ও কুটিল রাজনীতির বিষয়ে পরিণত হয়ে একটি গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পক্ষের সশব্দ ও তীব্র বিরোধিতা একটি গুরুতর অন্যায্য অবস্থান ছিলো। সিইসি বিচারপতি আজিজ এর বিপরীতে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে একই মাত্রার অন্যায্য কাজ করেছেন। অন্যদিকে সম্ভাব্য এমন একটি সঙ্কটের বিষয়ে যথাসময়ে সমঝোতামূলক একটি অবস্থান গ্রহণে বিএনপিপক্ষও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বিএনপিপক্ষ সহজেই আওয়ামী লীগ পক্ষকে এ প্রশ্নে সমর্থন জানিয়ে একটি স্মরণীয় বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারতো।

লেখক: গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টর ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ, বাংলাদেশ-সিপিএসবি-র নির্বাহী পরিচালক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১৫

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০০৭

হাসিনা-খালেদার নির্বাসন কাঙ্ক্ষিত নয়

ড. তারেক ফজল

চিন্তা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলই। তার ওপর সময় বিবেচনায় লিখতে উদ্যম পেলাম। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ২০০৭ সালের এই তৃতীয়-চতুর্থ সপ্তাহে কী ঘটছে এবং ঘটতে যাচ্ছে, এ বিষয়গুলো সচেতন নাগরিকদের আন্দোলিত করছে। তবে এ বিষয়গুলো প্রকাশ্যে উচ্চারণ করার বিষয়ে দ্বিধা সৃষ্টি হচ্ছে, দ্বিধা থেকেই যাচ্ছে। বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক নেত্রীকে বিদেশে নির্বাসনের অঘোষিত সরকারি ইচ্ছা ব্যাপকভাবে মানুষকে আন্দোলিত করছে। প্রথমেই বলি, বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষিত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে উৎসাহী একজন নাগরিক হিসেবে কামনা করি, এ সরকারের ঘোষিত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশী জাতির স্বার্থেই সফলভাবে বাস্তবায়িত হোক। একজন শুভার্থী হিসেবেই আমার বর্তমান মূল্যায়ন এ সরকারের নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি। কোনোভাবেই চাই না, বর্তমান সরকারের প্রতি জনগণের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং সরকার ব্যর্থ হোক। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও ন্যায্য জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ১৮ মাস সময় চেয়ে যে কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন, বাহ্যত বাংলাদেশের রাজনীতির সব পক্ষ তা গ্রহণ করে নিয়েছে। এ ১৮ মাস সময়ের মধ্যে একটি সৎ ও পরিশুদ্ধ রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বাংলাদেশে সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও কাঠামোগত প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব বলে মনে করি। একটি ন্যায্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার আওতায় থেকে দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে কমবেশি সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণবিধির যে আইনগত কাঠামো উপস্থাপন করেছে, কয়েকটি আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য এবং অপর্যাপ্ত প্রসঙ্গ ছাড়া তা একটি ভালো নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে বলেও আশা করা যায়। বাংলাদেশের বিদ্যমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চর্চার ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য বিকৃতি ও দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো সংশোধন ও সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ এই ১৮ মাস সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভব। নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় (মন্ত্রণালয়-অধিদফতর-করপোরেশন অর্থে) দুর্নীতি ও অসততার যেসব কালো গর্ত রয়েছে, সেগুলো কার্যকরভাবে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা এ সময়ের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমেই এ সরকার নিতে পারে। আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদ পর্যায়ে বাংলাদেশে যেসব প্রহসন ও অর্থহীন ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, সেগুলোকে কার্যকর ও অর্থময় করে তোলার উপযোগী আইনগত কাঠামো এ সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভব। এ পর্যায়ে বলা যায়, নির্বাহী বিভাগকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় কার্যকরভাবে রাখার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন ও সেগুলোর কার্যকারিতার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা দরকার। সংসদে আসন

www.pathagar.com

সংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন দলকে সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানশিপ দেয়া, পাবলিক একাউন্টসের মতো কমিটিগুলোয় বিরোধীদলীয় সদস্যকে চেয়ারম্যান করা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উপস্থিতি ও জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক করার বিধি প্রণয়ন করাসহ একটি অর্থবহ ও কার্যকর আইনসভা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি এ সময় প্রস্তাবাকারে উপস্থাপনের সুযোগ ছিল বা আছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ন্যায্য অবস্থানে রাখার উপযুক্ত মেকানিজম গড়ে তুলতে এ সরকার এখনো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু কিছুটা নিষ্ঠাপূর্ণ মনোযোগ গণমানুষের প্রতিদিনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এ বিষয়টির সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারে বলে জনগণের আস্থা আছে। অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও অসততার বিষয়টিই বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান সমস্যা। চূড়ান্তভাবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নৈতিকতাসমৃদ্ধ প্রশাসন ও অবশেষে একটি জাতি গঠন করার কোনো বিকল্প নেই। তার আগে উপযুক্ত আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা খুব সহজেই সম্ভব বলে মনে করি। কিন্তু এ সরকারও বাস্তবে এ লক্ষ্যে কার্যকর ও টেকসই কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। নির্দলীয় এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের সাথে নিয়ে উল্লিখিত সংস্কারমূলক কার্যক্রম সফলতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করবে, সচেতন জনগণ এটাই আশা করে। এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে একটি শুদ্ধ ও শুভ রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে, যার শুভফল এ দেশের মানুষ অনেক দিন ভোগ করতে পারবে। কার্যত এটাই এ সরকারের ন্যায্য দায়িত্ব এবং এর মাধ্যমেই জাতি একটি কাঙ্ক্ষিত নির্বাচিত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ পেতে সক্ষম হবে। কিন্তু সচেতন নাগরিকরা কিছু বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে কষ্ট পাচ্ছেন ও শঙ্কায় সময় কাটাচ্ছেন। বাংলাদেশের সদ্য বিগত ও তার পূর্ববর্তী সরকারের লোকরা অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ও অপরাধ করেছে, যেকোনো বিবেচনার ঊর্ধ্বে থেকে সেসব রাজনীতিকের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব উদ্যোগের প্রতি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সমর্থন ব্যক্ত করেছে। কারণ চুরি-ডাকাতি-বাটপাড়ি করে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় এবং নাগরিকদের সম্পদ শাসকরা ও তাদের চেলা-চামুণ্ডারা আত্মসাৎ করবে এটা কারো কাম্য নয়, সমর্থনযোগ্যও নয়। তাই অর্থনৈতিক দুর্নীতির (এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির) দায়ে যে-ই প্রমাণ সাপেক্ষে অভিযুক্ত হবে, তার শাস্তিই দেশবাসী কামনা করে। এ ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের রাজনৈতিক পরিচিতি ও প্রাবল্য কোনোভাবেই বিবেচ্য হতে পারে না। দুর্নীতির দায়ে শাস্তি পাওয়ার পর সেসব ব্যক্তি খুব সহজে দেশের রাজনীতিতে আবার প্রতাপশালী হবে, তা খুব সহজ ও স্বাভাবিক নয়। তাই বর্তমান সরকারের দায়িত্ব, অঘোষিত কোনো আবেগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং স্বীকৃত আইন কাঠামোর আওতায় থেকেই প্রমাণিত অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের বিচার করুন ও শাস্তি দিন। তাতে আপনারা যেকোনো রকম অপবাদের ঊর্ধ্বে থাকার সুযোগ পাবেন। নইলে অপবাদ অনিবার্য। আর আপনাদের ঘাড়ে অপবাদ চাপলে যে উদ্যোগগুলো আপনারা নিয়েছেন, সেগুলো সফল হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বেন, ব্যর্থও হতে পারেন। এ ব্যর্থতা পুরো জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এবার নির্দিষ্ট করে বলা যায়, পূর্ববর্তী ব্যর্থ শাসক-রাজনীতিকদের বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বিদায় জানাতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকেই নিজেদের দায়িত্বে সেসব ব্যর্থ ও

www.pathagar.com

অপরাধী শাসক-রাজনীতিকদের বিদায় দেয়ার বা বাদ দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে কোনো কোনো উপদেষ্টার এমন বক্তব্য মিডিয়ায় স্পষ্ট করেই এসেছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাসনে পাঠানোর কথাও আলোচিত হচ্ছে। দেশের প্রচলিত আইনে অভিযুক্ত করা ও শাস্তি দেয়ার সুযোগ না থাকলে কাউকে শাস্তি দিতে না পারার বিকল্প হিসেবে নির্বাসন দণ্ড দেয়ার চেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ সাংবিধানিক বিধিমালা বা জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার আওতায় এ সরকার উপযুক্ত কাউকে দণ্ডিত করলে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু তার বাইরে কাউকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হলে তা হবে অগণতান্ত্রিক ও অবৈধ আচরণ। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক শাসকদের নির্দিষ্টভাবেই স্মরণে রাখার অনুরোধ করব আইনবহির্ভূত কিছু করে জাতির কল্যাণ করার দায়িত্ব আপনাদের কাউকে দেয়া হয়েছে ভাবা উচিত হবে না এবং স্বীকৃত আইন কাঠামোর বাইরে গিয়ে কিছু করা মোটেও সঙ্গত হবে না। বলা হচ্ছে, দুই নেত্রী দেশে থাকলে একটি শক্তিশালী দল গঠনে সমস্যা হবে। তাই তাদের নির্বাসন দেয়ার চেষ্টা চলছে। তাহলে বলতে হবে, এ দুই নেত্রীর যে মোহনীয় যোগ্যতা আছে, তার চেয়ে বেশি মোহনীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করেই অন্য দল বানানোর চেষ্টা করুন। গণতন্ত্রে জনগণই শেষ কথা। জনগণ যদি দুই নেত্রীকে আবার গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, তবে সরকার বা কেউই তাতে বাধা দেয়ার আইনগত ও নৈতিক অধিকার রাখে না। অনুরোধ করি, যে শুভ সংস্কার কর্মসূচি সরকার হাতে নিয়েছে, বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেদের নিষ্ঠা, মেধা ও শ্রম নিবেদনে তারা মনোযোগী থাকবেন। তাতেই দেশ ও জাতি উপকৃত হবে, কৃতজ্ঞ থাকবে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, বিদেশ থেকে পাচারকৃত ২৪০ কোটি টাকা ফেরত এনে একজন আনিস আহমদ গোর্কি ছাড়া পেয়েছেন। এটি সত্য হলে বলতে হবে, সরকার অসততার সাথে আপস করছে। পাচারকৃত অর্থ কেবল ফেরত আনাই নয়, 'সব গোর্কির' দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় জনগণ। বলা হয়েছে, মামুন গং হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করেছে। এটা সত্য হলে সে টাকা তো ফেরত চাই-ই বটে, এ পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও চাই। তবেই না আর কেউ এভাবে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে এমন বেঈমানি করতে ভয় পাবে।

লেখকঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে লেখকের জনপ্রিয় নিবন্ধ-১৬

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১ আগস্ট ২০০৭

জরুরি অবস্থায় জরুরি কিছু প্রসঙ্গ

ড. তা রে ক ফ জ ল

বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় এ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার বিধান রয়েছে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার অধিকার কাউকে দেয়া ছিল না। ১৯৭৩ সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের হাতে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার (অনুচ্ছেদ-১৪১ক) ক্ষমতা দেয়া হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় কার্যত প্রধানমন্ত্রী এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন প্রেসিডেন্টের নামে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নির্বাহী সরকার বিদ্যমান না থাকায় প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন এ ক্ষমতা বাহ্যত এককভাবে প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য ইতোমধ্যে নানান সূত্রে এটি প্রকাশ করা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাঁচটি রাষ্ট্র ও জাতিসঙ্ঘের চাপে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর নেপথ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে বর্তমান জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। জরুরি অবস্থায় দেশের রাষ্ট্রীয়, দলীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ের কার্যক্রম বিশেষত রাজনৈতিক কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে সে নির্দেশনাও সংবিধানে বলা হয়েছে। সাংবিধানিক সে নির্দেশনার বিস্তারিত রূপ হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ প্রকাশ ও ঘোষণা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে কাজ করছে। তাই বাহ্যত বাংলাদেশ এখনো সাংবিধানিক শাসনের আওতায়ই রয়েছে। জরুরি অবস্থায় বাংলাদেশ এখন জরুরি বিধিমালায় পরিচালিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশকে অবস্থায়' থাকা একটি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই, দরকারও নেই।

জরুরি অবস্থার সরকার

বাংলাদেশে এখন যে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ রয়েছে, তার নাম বা পরিচিতি কী হওয়া উচিত? এ বিষয়ে একটি অস্পষ্টতা ও বিতর্ক রয়েছে। দু'টি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তার লক্ষ্যে মোটামুটি তিন মাস সময়ের জন্য বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক বিধান রয়েছে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের রক্তাক্ত অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সঙ্ঘাত ও সঙ্কটময় পর্যায়ে পৌঁছার প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি নির্বাহী সরকার গঠিত হয়। সে সময় এ সরকারের পরিচয় বলা হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যে বিষয়ে সংবিধানের ৫৮ (ক-ঙ) অনুচ্ছেদে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য ব্যাপকমাত্রার সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আরোপিত রয়েছে। এ সরকার জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা ও সরকার বা নির্বাহী

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের রুটিন দায়িত্বগুলো পালন করার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশের সামগ্রিক যে বাস্তবতায় দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, সে অবস্থায় নির্বাহী কর্তৃত্ব পাওয়া একটি সরকারের পক্ষে হয়তো শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করা ও রুটিন দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব ছিল না, হয়তো ন্যায্যও ছিল না এবং বাস্তবে সরকারটি সংবিধান-নির্দেশিত রুটিন কার্যক্রমের সীমার মধ্যে নেই। কারণ, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবাঞ্ছিত বাস্তবতা। বর্তমান সরকার কিছু রাষ্ট্রীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাস্তবায়ন করছে। এর একটি হলো বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রার সংস্কার কার্যক্রম। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত ও কাঠামোগত সংস্কারের কথাও বলা হচ্ছে। একটি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের কথাও বলা হচ্ছে। এগুলো নির্দিষ্টভাবেই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণমূলক কাজ। বিদ্যমান সাংবিধানিক নির্দেশনায় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্তৃত্ব এ সব বিষয়ে নির্দিষ্টভাবেই অনুপস্থিত। দু'টি নির্বাচিত সরকারের মধ্যকার সময়গত ব্যবধান বিষয়ে তিন মাস সময়ের যে নির্দেশনা রয়েছে, তাও ইতোমধ্যেই পার হয়ে গেছে। এ সব কারণে বর্তমানের কথিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে নানা পর্যায়ে প্রশ্ন এসেছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় পরিচালিত দুর্নীতিবিরোধী অভিযান একটি কাঙ্ক্ষিত ও অনিবার্য উদ্যোগ। এ উদ্যোগের সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে আগামী বা পরবর্তী সময়ের রাজনীতি ও সরকারের তুলনামূলক দুর্নীতিমুক্ত বাস্তবতা। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা নানামাত্রিক দুর্নীতি। এর মধ্যে আর্থিক দুর্নীতি সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি। এ দাবি পূরণের জন্য বর্তমান সরকারকে একটি ন্যূনতম দীর্ঘ সময় দায়িত্বে থাকতে হবে। এই ন্যূনতম দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এ সরকারকে আরো কিছু অনিবার্য সংস্কারমূলক কাজও করতে হবে। এই ন্যূনতম দীর্ঘ সময় এবং দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ নীতিগত কিছু কার্যক্রম পরিচালনা এ উভয় বিবেচনাতেই বর্তমান সরকারের পরিচয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হওয়া ও রাখা ন্যায্য নয় এবং অনিবার্যও নয়। রাজনীতি বিজ্ঞানের একজন ক্ষুদ্র সদস্য হিসেবে এ বিষয়ে আমার নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ এমনঃ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ এর (ক) ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা চার মাসের হোক অথবা বর্তমানের মতো 'বেশি সময়ের' হোক, এ জরুরি অবস্থা চলাকালীন যাবতীয় কার্যক্রম পরবর্তী জাতীয় সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হতেই হবে। এই যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে কথিত 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রুটিন মাফিক কার্যক্রম যেমন অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা, বর্তমানে চলা এ সরকারের নীতি নির্ধারণমূলক কার্যক্রম ও সংবিধানে বর্ণিত চার মাসের অতিরিক্ত সময়ের বিষয়াদিও অনিবার্য সেই সংসদীয় অনুমোদন (রেটিফিকেশন অ্যাপ্রোভাল) বিলের অংশ বানানোর সুযোগ আছে এবং তা করা ছাড়া সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার কোনো বিকল্পও নেই। এখন যৌক্তিক প্রশ্ন আসবেঃ তাহলে এ সরকারের নাম 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' (অনুচ্ছেদ ৫৮গ) রাখার মাধ্যমে এ সরকারকে সময় ও কার্যক্রম বিষয়ক সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মাঝে রাখার দরকার আছে কি? আমি মনে করি, বর্তমান সরকারের নাম 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' রাখার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও বাধ্যতা নেই। তাহলে বিকল্প নাম কী? আমি মনে করি বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদের মর্ম অনুযায়ী এবং এ অনুচ্ছেদের আওতায় বর্তমান সরকারের নাম হতে পারে এবং হওয়া দরকার 'জরুরি

www.pathagar.com

সরকার' বা ইমার্জেন্সি গভর্নমেন্ট। বর্তমানে সংবিধানের ৫৮(গ) অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত সরকার বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে প্রয়োজনে একই ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সংবিধানের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদের আওতায় একটি জরুরি সরকার গঠিত হলে সে সরকারের কর্মসীমা ও সময়সীমা বিষয়ে আর সাংবিধানিক প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না। এই জরুরি সরকার ১৪১(খ) অনুচ্ছেদের আওতায় জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছাড়া প্রায় সব নাগরিক স্বাধীনতা ও সুবিধা স্থগিত (অনুচ্ছেদ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২) রেখে ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় মেয়াদ পর্যন্ত নির্বাহী ক্ষমতা সাংবিধানিক নির্দেশনার আওতায় অব্যাহত রাখার সুযোগ পেতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায়

বাংলাদেশে একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে বিদ্যমান। এটিকে 'সংসদীয় সরকার' বলা হলেও, সম্ভবত রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে আমিই প্রথম একটি জনপ্রিয় লেখায় বলেছিলাম, বাংলাদেশে 'প্রাইম মিনিস্টারিয়াল ডেমোক্র্যাসি' বা 'প্রধানমন্ত্রিক' (প্রধানমন্ত্রী শাসিত অর্থে) গণতন্ত্র কাজ করছে। আমেরিকান মডেলের গণতন্ত্রকে প্রেসিডেন্সিয়াল বা রাষ্ট্রপতি গণতন্ত্র বলা হলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একই বিবেচনা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে এ দেশে চলছে প্রাইম মিনিস্টিয়ারিয়াল বা প্রধানমন্ত্রিক গণতন্ত্র। এ বিষয়ে আমি সংশ্লিষ্ট লেখাটিতে ব্যাখ্যা দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো ব্যাপক ও একক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর এই একচ্ছত্র ক্ষমতায় বর্তমানের নামমাত্র প্রেসিডেন্টকে অংশীদার বানানোর একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। নীতিগতভাবে এটি বিবেচনার অযোগ্য বিষয় নয়। তবে ক্ষমতার এই ভারসাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কী কী সম্ভাব্য বাধা ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, সে বিষয়ে একটি নিষ্ঠাপূর্ণ ও মনোযোগী অধ্যয়ন ও বিতর্ক প্রয়োজন। এখানে 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, সম্ভাব্য বাধা ও সমস্যা' এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ও মনোযোগী অধ্যয়ন ও বিতর্ক'কে আমি তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচনায় নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনুরোধ করতে চাই। এর পরই কেবল বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য বিষয়ে সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলো

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রচর্চার ব্যাপক ও গুরুতর ঘাটতি রয়েছে। গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে দলগুলোর মাঝে সৃষ্ট দুর্বলতার কারণে দলগুলোর নেতৃত্ব-কাঠামো সৃষ্টি ও কার্যক্রম পরিচালনায় স্বৈরতান্ত্রিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া অসৎ ব্যবসায়ী ও স্বার্থন্বেষী সাবেক সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের দলগুলোতে ব্যাপকভাবে ক্ষমতাশালী করায় দলগুলোতে শাব্দিক অর্থেই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের একটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে। বর্তমান শাসকদের পক্ষ থেকে দলগুলোতে গণতন্ত্র অনুকূল সংস্কারের আহ্বান জানানোর পর এখন পর্যন্ত বাস্তবতা হলোঃ প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ বড় দলগুলো দলীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের পক্ষেই অবস্থান ঘোষণা করেছে। বড় দলগুলোর 'দলীয় কাউন্সিল' করার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সময়ের দরকার হওয়ায় দল দু'টির বর্তমান প্রধান নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকার ঘরোয়া রাজনীতির

www.pathagar.com

সুযোগ দিলে এরা উপযুক্ত দলীয় ফোরাম বা কর্তৃপক্ষ তথা দলীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে দলীয় গঠনতন্ত্রের কাঙ্ক্ষিত সংস্কার করার উদ্যোগ নিতে চান। সংস্কারের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা, উপযুক্ত নেতাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং দলীয় তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এ সময়ে প্রধান দু'টি দলেই সংস্কারপন্থী বলে নেতাকর্মীদের একটি গ্রুপ চিহ্নিত হয়েছে। তারা ইতোমধ্যে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের জন্য সংস্কার নীতিমালা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং দলীয় কাউন্সিল আয়োজনের জন্য বাহ্যত ব্যাপক প্রকাশ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে চলেছে। অবশ্য আওয়ামী লীগের কথিত সংস্কারপন্থী নেতারা তাদের দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা গ্রেফতার হওয়ার প্রেক্ষাপটে তার মুক্তি পাওয়ার আগে দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের চিন্তা করছেন না বলে ঘোষণা করেছেন। নাগরিক সমাজের সদস্যরা মনে করেন, বেগম খালেদা জিয়াকে দল ও নেতৃত্ব থেকে বাদ দেয়া ও বিএনপি ভাঙার নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত উদ্দেশ্য না থাকলে বর্তমানে মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে কথিত সংস্কারপন্থীদের উচিত হবে দলীয় চেয়ারপারসনের ঘোষিত বাস্তবতা তথা ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ দেয়া হলে দলীয় চেয়ারপারসনের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে সুবিধামতো সময়ে প্রশ্নাতীত স্বচ্ছতা ও অবাধ প্রক্রিয়ায় দলটির কাউন্সিল অধিবেশনের আয়োজন করা। এতে তাদের প্রতি অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অভিযোগ আরোপিত হবে না এবং তাদের 'আস্থা ও ঘোষণামাফিক' সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় কাউন্সিলরের সমর্থনে তাদের উত্থাপিত সংস্কার পরিকল্পনা উপযুক্ত দলীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই অনুমোদন করিয়ে নেয়ার সুযোগ তারা পেতে পারেন। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে আরেকটি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছেঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় খালেদা জিয়া শুধু বিএনপি'র দলীয় চেয়ারপারসন নন, তিনি আওয়ামী লীগ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী-বাঙালি জাতীয়তাবাদী-সমাজতন্ত্রপন্থী রাজনৈতিক ধারার বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে দাবিদার রাজনৈতিক ধারার অনিবার্য প্রতীকও বটে। তাই খালেদা জিয়ার প্রতি অন্যায্য অসম্মান প্রদর্শন করে জবরদস্তিমূলক কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদর্শনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াবিহীন একটি বিএনপি প্রতিষ্ঠা করা হলে সেটি আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের বিপরীতে কোনো ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না বলেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়। আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ধীর-স্থির মাথায় মোটামুটি যোগ্যতার সাথে দলটির মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে দাবি করা যায়। কিন্তু তার তুলনায় কে এম ওবায়দুর রহমানের রাজনৈতিক অতীত যেমন সমৃদ্ধতর ছিল, নেতৃত্বের যোগ্যতাও কম ছিল না। কিন্তু একটি আলাদা দল করে তিনিও বেশি দিন টিকতে পারেননি। বাস্তবতার অন্য আরেকটি মাত্রা প্রদর্শিত হয়েছে, প্রফেসর বি. চৌধুরী ও অবঃ কর্নেল অলির ঐক্যবদ্ধ যাত্রার সামান্য পরেই নেতৃত্বের ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে তাদের যাত্রাটি মুখথুবড়ে পড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তবতার এ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে সক্ষম হলে মান্নান ভূঁইয়া গং যেমন লাভবান হবেন, বিএনপিও অনিবার্য ভাঙন থেকে রক্ষা পেয়ে আরো শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারায় পরিণত

www.pathagar.com

হতে পারবে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের কথিত সংস্কারপন্থীরা শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে চায় না বলে মনে হচ্ছে।

রাজনীতিমুক্ত আর সব জাতীয় দায়

বর্তমান সরকার বাহ্যত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে যেহেতু আরো দেড় বছর দায়িত্বে থাকার পরিকল্পনা নিয়েছে, তাই এ সরকারকে কয়েকটি অনিবার্য কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনামুক্ত জাতীয় দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। 'প্রজ্ঞা' পরিভাষাটির সাথে অন্তর্দৃষ্টি (ইনসাইট) ও দূরদৃষ্টি (ফরসাইট) পরিভাষা দু'টির গভীর সংযোগ রয়েছে এবং বাস্তবে এ দু'টি পরিভাষার অনুবাদ করা সম্ভব হলেই সেটিকে প্রজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনিবার্য সেই জাতীয় দায়িত্বের মধ্যে রয়েছেঃ ক. সম্ভাব্য বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থানে সরকারি পর্যায়ের উদ্যোগ নেয়া ও বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং সহযোগিতা করা। খ. সম্ভাব্য বেশি সংখ্যায় দক্ষ, আধাদক্ষ ও অদক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিককে উপযুক্ত বিদেশী কর্মক্ষেত্রে পাঠানোর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা এবং ইতোমধ্যেই যারা বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে, সেসব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাস কর্মীদের মাধ্যমে তাদেরকে কার্যকর উপায়ে সম্ভাব্য উচ্চমাত্রার গুণগত সাহায্য করা। গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। কার্যত জনসংখ্যার বিপুল ও দুর্বহ চাপের কারণে গ্রামীণ ও শহুরে নিম্নবিত্তের (এবং দারিদ্র্যসীমার নিচের) মানুষ নানামাত্রিক অসততা ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্যক্রমে জড়িত হয়ে থাকে। 'নতুন জন্মের এ স্রোত' ঠেকানোর জন্য ধর্মীয় চিন্তা ও সামাজিক প্রথার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হলেই শুধু জনসংখ্যা বাড়ানোর এ হার নিম্নমুখী করা সম্ভব। আমি এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও কার্যকর উপায় অবলম্বনে কোনো সরকারের পক্ষ থেকেই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রমাণ পাইনি। অথচ তা সম্ভব।

লেখকঃ সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাহী পরিচালক, সিপিএস,বি

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫: লেখকের 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিষয়ক সেমিনারের মিডিয়া রিপোর্ট-১

সংবিধান সংশোধন করে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা হয়েছে: কবীর হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার: সাংসদ এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন বলেছেন, আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় শক্তি হল আমলাতন্ত্র। সরকার যে দলেরই হোক না কেন এই আমলাতন্ত্র তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে আরো বেশি শক্তিশালী করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ সেমিনার কক্ষে আইবিএস আয়োজিত 'সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়াক সরকার' শীর্ষক সেমিনারে মুক্ত আলোচনাকালে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। জনাব কবীর আরো বলেন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে যে জাতির জন্ম সেই জাতি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে না, এটা জাতির জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে প্রশাসন দলীয়করণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। কাজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

রাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আবুল ফজল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারটি উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর এম ইউসুফ আলী। উপাচার্য বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের সরকার। আমরা ব্যক্তি হিসেবে যে যেখানে থাকি না কেন রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক থেকেই গেছে। তিনি আরো বলেন, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতির কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তারেক এম.টি রহমান। তিনি তার প্রবন্ধে ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনও আইনগত বৈধতা পায়নি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সংবিধানের সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার যুগোপযোগী। কিন্তু তার আইনগত প্রতিষ্ঠার জন্য গণভোটের প্রয়োজন ছিল। অথচ তা করা হয়নি। ফলে ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ থেকে গেছে।

মুক্ত আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এম শামসুর রহমান, আইন বিভাগের প্রফেসর রবিউল হোসেন, প্রফেসর আমিনুল হক বেগ, প্রফেসর তাহের আহমেদ প্রমুখ।

সেমিনারটি পরিচালনা ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইবিএস পরিচালক ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী।

দৈনিক বার্তা, রাজশাহী, ৮ অক্টোবর ১৯৯৬।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫: লেখকের 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিষয়ক সেমিনারের মিডিয়া রিপোর্ট-২

Caretaker provision will be in coming days-Emajuddin

Staff Reporter

Former Vice-Chancellor of Dhaka University Prof Emajuddin Ahmed predicted that the politicians would raise the demand for removal of the provision of nonparty caretaker government from the constitution within a decade. Addressing a seminar on "Bangladesh: thirteenth amendment of the Constitution and caretaker government", Prof Emajuddin Ahmed clearly termed the caretaker concept as "no confidence" motion against politicians themselves.

"The concept of Bangladesh Styled caretaker government was found nowhere in the political dictionary", Professor Ahmed, who is also Chairman of the Bangladesh Political Science Association, said and added "it is very that where an elected government will be able to carry all state activities the 4 years and 9 months but the same government would not be trusted for holding a free and fair election.

Presided over by Professor Emajuddin Ahmed the seminar was also addressed, among others, by Dr M Ershadul Bari and Dr Hasanuzzaman.

Professor Emajuddin Ahmed stressed that present constitutional dispensation of the caretaker government is defective. So law makers should think over this issue seriously, he remarked.

Dr. M Ershadul Bari and Dr Hasanuzzaman also termed the formation of caretaker government as a total "disregard and mistrust" shown to the politicians by themselves.

Tarek M T Rahman, of Political Science Department, of Rajshahi University, mentioned in his 24 page keynote paper that according to the Constitution, a referendum was must on the thirteenth amendment of the Constitution. Ironically, political leaders as well as constitutional experts are yet to give their specific comments on this legal point, he said.

The New Nation, Dhaka, November 09, 1996

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫: লেখকের 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিষয়ক সেমিনারের মিডিয়া রিপোর্ট-৩

'বাংলাদেশ: সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-র উদ্যোগে গত ৮ নভেম্বর ১৯৯৬ বিকেলে ঢাকার একটি স্থানীয় হোটেলে (মেট্রোপলিটন, পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা) 'বাংলাদেশ: সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. এম এরশাদুল বারী বিশেষ অতিথি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. হাসান উজ্জামান নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম ও উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচ ডি রত গবেষক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক তারেক এম টি রহমান।

সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, আমলা, আইনজীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ীসহ সমাজের নানা শ্রেণীর দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে (বৃটেনের) উইনষ্টন চার্চিল, ১৯৭৯ সালে ভারতের চৌধুরী চরণ সিং ও ১৯৯৩ (১৯৮৮ ও ১৯৯০ সহ) সালে পাকিস্তানের ড. মঈন কোরেশীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারাবাহিকতার উল্লেখ করে প্রবন্ধকার দাবী করেন, ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামো ও ধারণা এ যাবৎ বিশ্বের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার যাবতীয় উন্নয়নের (নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রশ্নে) মিলিত রূপ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি। বাংলাদেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোয় সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী গণভোট ছাড়া সাংবিধানিক বৈধতা পায়নি এবং সে জন্য বিচারপতি হাবিবুর রহমান সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রম বৈধতার প্রশ্নের সম্মুখীন-প্রবন্ধকারের এই অভিমতের সাথে সেমিনারে উপস্থিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ একমত পোষণ করেন। তারেক এম টি রহমান তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে এই সংবিধানের প্রস্তাবনা, ৮, ৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদের যে কোনো বিধান সংশোধন করতে হলে সংসদ সদস্যদের দু'-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করা বিলের পক্ষে গণভোটের আয়োজন করা বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য, সংবিধানের অন্য কোনো অনুচ্ছেদ অথবা বিধানের সংশোধনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সাংসদদের দু'-তৃতীয়াংশের সমর্থনই যথেষ্ট।

সেমিনারের সভাপতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ সেমিনারটিকে একটি গঠনমূলক শুভ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলটি পাশের আগে এ বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশের বাস্তবতা ও পরিবেশ ছিলো না। বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত ও পরিবেশিত ত্রয়োদশ সংশোধনীর 'বাংলা পাঠে' প্রবন্ধকার যে সব ভুল, বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতি নির্দেশ করেছেন, প্রফেসর এমাজউদ্দিন তাতে সম্মতি প্রদান করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিকরা নিজেদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়েছে এবং আমলাতন্ত্রকে শক্তিমান করেছে-এই অভিমত ব্যক্ত করে তিনি দাবী করেন, আমার হয়তো দেখার সুযোগ হবে না-আগামী ২০-২৫ বছরের ব্যবধানে রাজনীতিকরাই এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা বাতিল করবে। প্রফেসর এমাজউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক মন ও অন্তঃকরণ তৈরী হয়নি। জনগণের মাঝে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি রচিত না হলে এ দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থেকে যাবে বলে তিনি দাবী করেন। তিনি বলেন, বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ বাস্তবতায় জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে কিছু নেই, তার দরকারও নেই, দরকার বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্য। তিনি প্রশ্ন করেন, যদি বিসমিল্লাহ বলতে কষ্ট হয় তাহলে এর অনুবাদ করা কেনো? প্রফেসর এমাজউদ্দিন বলেন, শেখ মুজিব ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করতে যাওয়া যেমন মূর্খতা, এ দেশের ইতিহাসে মুজিব ছাড়া আর কিছু নেই বলাও তেমনি মূর্খতা। এগুলো এদেশের একেকটি অধ্যায়। বাঙালী অথবা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিভেদ নয়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা চলুক, জনগণের জীবন মানের উন্নয়নের চেষ্টা চলুক-প্রফেসর এমাজউদ্দিনের আহবান।

বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ড. এম এরশাদুল বারী বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের সরকারকে একটি নিয়মিত সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে নির্বাচন পরিচালনা করেছে তা নিয়ে প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল অভিযোগ তুলেছে-উল্লেখ করে ড. বারী প্রশ্ন করেন, লক্ষীপুর, মীরসরাই, হবিগঞ্জ, রংপুর প্রভৃতি উপনির্বাচনের দায়িত্ব নেবে কে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণায় এ সব প্রশ্নের জবাব নেই।

ড. হাসানউজ্জামান বলেন, রাজনীতিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্ম হয়েছে।

অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মূল সমস্যা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। রাজনীতিকদের মধ্যে অঙ্গীকার পূরণের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সাপ্তাহিক বিক্রম, ঢাকা, ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬

আতিকুর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাংবিধানিক আয়োজনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এক যুগ (১৯৯৬-২০০৮) পার করেছে। অবশ্য এক দশকেরও কম ব্যবধানেই (২০০৪) এ ব্যবস্থাটির আমূল সংস্কারের দাবি তুলেছিলো তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং আরো কিছু দল-সংগঠন-ব্যক্তি। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও ১০ উপদেষ্টার নিয়োগ প্রক্রিয়া বিষয়ে নতুন বিধান ('সব দলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা', প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য সংবিধানে বিদ্যমান ৬টি বিকল্পের পঞ্চমটি হলো 'সবার নিকট গ্রহণযোগ্য একজন' এবং এটি বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেবেন খোদ রাষ্ট্রপতি) দাবি করায় এ সরকার ব্যবস্থাটি অস্তিত্বের সংশয়ে পড়েছে। আগেও অনেক রাজনীতিবিদ এবং নাগরিক সমাজের সদস্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। সর্বশেষ গত ৫ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার জন্য আওয়ামী লীগ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী (শপথ গ্রহণ ৬ জানুয়ারী ২০০৯) শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কবে নাগাদ এ নির্বাচনকালীন বিশেষ সরকার ব্যবস্থাটি বাংলাদেশে বিলুপ্ত হবে, তা এক্ষুণি নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে এটি যে আত্মমর্যাদাবান রাজনীতিকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে অপমানজনক একটি আয়োজন, তা কম-বেশী সবাই অনুধাবন করছেন। সে বিবেচনায় বর্তমান গ্রন্থটি এ বিষয়ে মহাকালের স্বাক্ষী হবার জন্য আগাম প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য হতে পারে। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার 'সূচনা প্রক্রিয়া' থেকে শুরু করে এর সর্বশেষ অগ্রগতি (নভেম্বর ১৯৯০-জানুয়ারী ২০০৯) এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ গ্রন্থের পর্যালোচনা মূল্যায়ন লেখার অনুরোধ রক্ষা করায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১-এর প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়রমোস্ট প্রফেসর ড. এম আতাউর রহমানের কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করছি। তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থকার ড. তারেকের সংযমী, নির্মোহ ও সম্ভাব্য ন্যায্য উপস্থাপনা ইতোমধ্যেই মনোযোগী পাঠক ও পণ্ডিত মহলে সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ের গবেষক-পাঠক এবং নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রাতিষ্ঠানিক (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (অন্য সব শ্রেণী-পেশার মানুষ) পাঠকদের জন্য এ গ্রন্থটি একটি অনিবার্য সংগ্রহযোগ্য প্রকাশনার মর্যাদা পাবে বলে আশা করা যায়।

কানিজ মাহমুদা
প্রকাশক

KT3 কেটিথ্রি পাবলিশার্স